আমার বিপ্লব-জিজ্ঞাসা

(১ম পর্ব : ১৯২৭-১৯৪৫)

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

বাংলা একাডেমী : ঢাকা
১৯৭১

যারা শোষণহীন ভারতের জন্য সংগ্রাম করছে
তাদের উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মধ্যবিত্ত তরুণদের গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের যথার্থ স্থান নির্ণয়ের কোন ইতিহাস-বিজ্ঞানসম্মত প্রচেষ্টা আজও হয় নি। এ যাবৎ যে সব বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির বেশির ভাগই হয় ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা নতুবা খণ্ডচিত্র। উপরন্তু এইসব বইতে একটিমাত্র দিককে, বিপ্লবীদের দেশপ্রেম, বীরত্ব, দুর্জয় সাহস এবং আত্মত্যাগ অর্থাৎ আত্মমুখীদিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসের মালমসলা হিসাবে তাদের মূল্য নিশ্চয়ই আছে। তবু তারা অসম্পূর্ণ, ভগ্নাংশ, একপেশে। আবার এমন কিছু সংখ্যক বই আছে যেখানে ইতিহাসের উপাদানের বদলে রোমাঞ্চ সৃষ্টির উপরই জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। উপরিউক্ত দুই ধরনের থেকে ভিন্ন ধরনের কয়েকটি বইও আছে, তার মধ্যে বিপ্লব আন্দোলনের সূচনা ও পরিণতির একটা রূপরেখা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন বিপ্লবী নায়কদেরই কেউ কেউ। সেগুলিকে বলা চলে বিরল ব্যতিক্রম।

আন্দোলনের গোপন চরিত্রের দরুন অতীতে তার সম্বন্ধে বহু তথ্য, বিশেষত দলিল ও প্রামাণ্য তথ্যাদি লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গিয়েছিল। সাম্প্রতিককালে অবশ্য সেইসব তথ্য পাওয়া সহজ হয়েছে। তার সাহায্যে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু এইসব গবেষকরাও বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন অপেক্ষা বিশদ তথ্য পরিবেশনের উপরই প্রধানত মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। তারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে ঠিকই। তবে সেটা হল প্রাথমিক কাজ। গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের অবদান কতখানি, কোথায় ছিল তার ত্রুটি ও দুর্বলতা, কোন ঐতিহাসিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিতে তার উদ্ভব হয়েছে, কিভাবে সেই আন্দোলনের উপরে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি এবং যুগমানসের প্রভাব পড়েছে ও দ্বন্দ্ব তথা চিন্তাসংঘাতের জন্ম দিয়েছে ইত্যাদিকে মিলিয়ে একটা সামগ্রিক বিচার ইতিহাসের নিরিখে জরুরী হয়ে পড়েছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে যে রোম্যান্টিক চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতিকে ভুল বলে বুঝে আমরা

পিছনে ফেলে এসেছি আজ সেইগুলিকে নতুনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেখে এই কথাটা বিশেষভাবে অনুভব করছি। অতীতকে বুঝতে হলে এবং তার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হলে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকগুলি সম্বন্ধেই ধারণা স্পষ্ট হওয়া চাই।

এহেন দায়িত্ব পূরণ করা একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। আমিও সে প্রয়াস পাই নি। আমি শুধু ঐ কর্তব্যের প্রতি নজর রেখে চিন্তা-বিকাশের কাহিনীকে রূপায়িত করেছি। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি একটি যুগকে তার ঐতিহাসিক পশ্চাৎপটে ফুটিয়ে তুলতে। স্বভাবতই অনেকের কথা এসে গিয়েছে এই প্রসঙ্গে—তাঁরা কোন না কোনভাবে আমার অভিজ্ঞতা তথা চিন্তা-বিকাশের প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সবার নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তাই সহকর্মীদের কারুর কারুর নাম বাদ পড়েছে। যাঁদের কথা বলেছি তাঁদের কেউ কেউ এখন আর ইহজগতে নেই। যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের কারুর কারুর বেলায়, বিশেষ কারণে, আসল নামের বদলে তদানীন্তন সাঙ্কেতিক নাম এবং দুই একটি ক্ষেত্রে অন্য নাম ব্যবহার করেছি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। ভগৎ সিংহের পার্টির নাম প্রথমে শুনেছিলাম "হিন্দুস্থান সোশালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশান"। এখানে সেইভাবেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু পরে জেনেছি যে, ঐ পার্টি 'হিন্দুস্থান সোশালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি' নামে পরিচিত ছিল। আবার আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় সরকারপক্ষ কর্তৃক যে সব দলিল সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থিত করা হয় তার একটিতে 'হিন্দুস্থান সোশালিস্ট রেভোলিউশানারী আর্মি' নামটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা'র প্রথম পর্বটি লেখা শেষ করেছিলাম ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে। কবে যে তা ছাপার অক্ষরে পাঠকদের সামনে উপস্থিত হবে এবং কোন প্রকাশক সে ভার নিতে সম্মত হবেন, তার কোন নিশ্চয়তা তখন ছিল না। লেখক মাত্রেই এই সমস্যার সঙ্গে পরিচিত। বইটি যে এত শীঘ্র আত্মপ্রকাশ করছে সেজন্য ধন্যবাদ জানাতে হয় মনীষা গ্রন্থালয়ের পরিচালক বন্ধুবর শ্রীদিলীপ বসুকে। এটা সম্ভব হয়েছে তাঁরই একান্ত আগ্রহে। প্রুফ সংশোধন ও সম্পাদনার শ্রমসাধ্য কাজটি নিজে নিয়ে তিনি আমাকে রেহাই দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় পর্ব লেখা শুরু করার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন।

বিপ্লব-জিজ্ঞাসার ত শেষ নেই। জেল থেকে ছাড়া পাই ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আত্মনিয়োগ করি শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনে। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ভরে উঠেছে বিচিত্র সম্পদে। তার অঙ্গ হিসাবে অজস্র প্রশ্ন জমেছে মনে। অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়েছি বাস্তবের অগ্নিপরীক্ষায়। আবার বহু প্রশ্নের উত্তর আজও খুঁজে চলেছি। সেই সব-কিছুই পাঠকসমাজের সামনে নিবেদন করার অভিপ্রায় আছে দ্বিতীয় পর্বে।

কলিকাতা-৬ সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

; ১৯৭১

কয়েকটি কথা

আমার বিপ্লব-জিজ্ঞাসার প্রথম পর্বটি হল জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের কাহিনী। একলা আমারই নয়, আমার মতন আরো অনেকের। কাহিনীর শেষের অধ্যায়টি রচিত হয় আন্দামানের সেলুলার জেলে, ১৯৩৬-৩৭ সালে। কিন্তু উত্তরণের মানসিক ভিত্তি রচনা শুরু হয়েছিল ১৯২৭-৩২-এর যুগে। মধ্যবিত্ত তরুণদের গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অনেক দিন থেকে মনে বহু প্রশ্ন জমতে শুরু করেছিল। আরম্ভ হয়েছিল জাতীয় মুক্তির সঠিক পথের সন্ধান।

এই প্রক্রিয়া সকলের পক্ষে ঠিক একই রকমভাবে অগ্রসর হয় নি। সেদিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তা খুব সহজ ছিল না। না ছিল অনেক কিছু জানার সুযোগ, না ছিল মনের মধ্যে অঙ্কুরিত প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনার যথেষ্ট ব্যবস্থা বা অবকাশ। সঠিক উত্তর পাওয়ার জন্য পথ হাতড়ে হাতড়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। তবু ঐ যুগেও বা তার কিছু আগে থেকে কিছু সংখ্যক বিপ্লবী তরুণ আত্মজিজ্ঞাসার পথ-পরিক্রমা করে সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকতে আরম্ভ করেছিল।

আমি চেষ্টা করেছি সেই আত্ম-জিজ্ঞাসার পথ-পরিক্রমার ইতিহাসকে ফুটিয়ে তুলতে। ঘটনা পরম্পরার খুঁটিনাটি বা ধারাবাহিক বিবরণের বদলে ঘটনার পটভূমিতে মনের বিকাশের কাহিনীকেই রূপ দিতে চেয়েছি। বিপ্লব-চিন্তার যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে সাম্যবাদে পৌঁছেছি, তারই চিত্রটিকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। কোন্ পটভূমিতে, কি রকম পরিবেশে, বিপ্লব-চিন্তার উন্মেষ হয়েছিল—একেবারে সেই গোড়াকার দিনগুলি থেকেই শুরু করেছি।

এটা তখনকার দিনের গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। একে বলা যেতে পারে ইতিহাসের ভগ্নাংশ। কিন্তু এখানে নিছক আমার একলার কথাই লিখিনি। এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের দেশের

জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বেশ কয়েকটি অধ্যায়ের বহু বড় ও ছোট ঘটনা। আংশিকভাবে হলেও প্রতিবিম্বিত হয়েছে একটি যুগসন্ধিক্ষণের চিন্তার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের বিবরণ। এর সঙ্গে ওতপ্রোতরূপে জড়িয়ে আছে স্বাধীনতা-সংগ্রামের অনেক খ্যাতনামা এবং অখ্যাতনামা সৈনিকের কথা। জড়িয়ে আছে কতজনের কত স্মৃতি!

'আমার জিজ্ঞাসা' নাম দিয়েছি এই কারণে যে লিখেছি আমার জবানিতে এবং আমি যখন যতটুকু দেখেছি, জেনেছি ও বুঝেছি, প্রধানত তাকেই অবলম্বন করে।

স্মৃতি-চারণের কাজে হাত দিয়েছিলাম ১৯৩৩-৪৫ সালের একটানা বন্দী-জীবনের শেষের বছরগুলিতে। তখন বহু বৎসর আগে পিছনে ফেলে আসা দিনগুলি মনের রূপোলী পরদায় জীবন্ত হয়ে উঠতে চেয়েছে। স্মৃতির ভাণ্ডার তোলপাড় করে ছোটবড় কত ঘটনা, কত ছবি সামনে এসে দাঁড়াবার তাগিদে ভিড় করেছে। তাদের সঙ্গে হিসেব মেলাতে বসে গিয়েছি? কি চেয়েছি জীবনের উষাকাল থেকে? আর কি পেয়েছি যা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে উত্তরণে সাহায্য করেছে?

লিখতে শুরু করেছিলাম, সম্পূর্ণ করতে পারিনি। বাইরে আসার পর অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি উপেক্ষিত হয়ে পড়ে রয়েছে। দ্বিতীয়বার এই কাজে হাত দিয়েছিলাম ১৯৪৯-৫২ সালের বন্দীজীবনে। সেবারও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর লেখা অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছে। পাণ্ডুলিপির বিবর্ণপ্রায় পৃষ্ঠাগুলির উপর থেকে ধুলো ঝেড়ে নতুন করে লেখায় হাত দিয়েছি ১৯৭১ সালে।

তবে আগেকার দুবারের চেষ্টা একেবারে বিফলে যায় নি। যখনকার কথা লিখেছি তা ছিল আজকার তুলনায় নিকট অতীতের ব্যাপার। তাছাড়া দুবারই কয়েকজন পুরাতন সহকর্মীকে সহবন্দীরূপে পেয়েছিলাম। তাঁদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছি।

ইতিহাসের ভগ্নাংশ হলেও তাকে লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব কম নয়। বিশেষত বিষয়টা যখন প্রায় অর্ধ শতাব্দীর আগেকার। তাই শুধু নিজস্ব স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করি নি। যাদের সঙ্গে বা যাদের নেতৃত্বে কাজ করেছি তাদের লেখা আত্মজীবনীর উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়েছি। কিছু কিছু প্রামাণ্য বই এবং দলিল যা পেয়েছি সেগুলির সাহায্যে স্মৃতিকে ঝালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি।

এই বইতে কথোপকথনের যে অংশগুলি আছে সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এতদিন পরে অতীতের চিন্তা ও কথাবার্তাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়ে প্রকাশভঙ্গী ও শব্দচয়নে এখনকার মনের রং লাগাটা স্বাভাবিক। আর যে সব আলোচনা হয়েছে হয়ত অনেকদিন ধরে, টুকরো-টুকরোভাবে, সেগুলোকে কোন কোন ক্ষেত্রে একত্র সাজিয়ে দিয়েছি। তা করেছি একঘেয়ে পুনরুক্তি এড়াবার জন্যে। কিন্তু আলোচনার মর্মবস্তুর উপরে কল্পনার প্রলেপ লাগাই নি।

১০ই অক্টোবর
১৯৭১

যখন সূর্য উঠে

জন্ম হয়েছিল তদানীন্তন করদ-রাজ্য কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা শহরে। ১৯১০ সালের অক্টোবর মাসে। দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত সেখানেই কেটেছে। ১৯২০ সালে বাবার মৃত্যুর পর চলে আসি দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি শহরে। বড় ভাই কয়েক বছর আগে থেকে সেখানে এসে বসবাস করছিলেন আইনজীবী হিসাবে।

মাথাভাঙ্গার দিনগুলির সব কথা ভাল মনে পড়ে না। নামে মহকুমা শহর হলেও সেটি ছিল বর্ধিষ্ণু পল্লীগ্রামের মত। জীবনযাত্রা চলত প্রথাগত নিস্তরঙ্গ ছন্দে। বার মাসে তের পার্বণ। ছায়া-সুনিবিড় পল্লীর নীড়। তার নীচে হয়ত পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল অনেক দুঃখবেদনা, গ্লানি আর দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু সে সবের অস্তিত্ব টের পাওয়ার মত বয়স তখনও হয় নি।

মনের মুকুল কবে কিভাবে প্রথম বিকশিত হতে আরম্ভ করেছিল সে হদিস রাখা ত কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। স্মৃতির পরদায় সেই বিকাশের প্রক্রিয়ার সুস্পষ্ট চিহ্ন অঙ্কিত হতে থাকে যখন তা কিছুদূর এগিয়ে এসেছে। আজ এতগুলি বছর পরে যখন পিছনের দিকে ফিরে তাকাই তখন ত পরিণত চিন্তার চশমা দিয়েই অতীতকে দেখতে বসি। শৈশব-স্মৃতিতে যেসব ছবির ভাঙাচোরা-ছেঁড়াখোঁড়া টুকরো আপনা থেকে ভেসে উঠতে চায় সেগুলিকে মনে করি কত তুচ্ছ, অর্থহীন। অথচ মনের পাপড়িগুলি যে সময় একটির পর একটি করে খুলতে আরম্ভ করেছে সেই উষায় ঐগুলি ছিল কত মূল্যবান, কত না তাৎপর্যে ভরা। সেগুলিকে অনাদরে-অবহেলায় ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিতেও ইচ্ছে হয় না। কিন্তু একটি অর্থবহ পরম্পরা-সূত্রে গেঁথে ফুটিয়ে তোলার কোন হদিস পাই না। বাল্য-স্মৃতি সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। তাই কিশোর বয়সের পুঁজি নিয়েই লেখা শুরু করি।

কৈশোরের স্বপ্নময় দিনগুলি। তখন প্রথম দেখা সবকিছুতে দারুণ কৌতূহল।

রূপকথা শোনার কালটা পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু রয়ে গিয়েছে তার রেশটুকু, যা নবীনের সন্ধানে উতলা করে। মাথা তোলে জিজ্ঞাসার অঙ্কুর। কারুর কারুর বেলায় তা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মন চায় ছেলেবেলায় রূপকাহিনীতে শোনা সেই তেপান্তরের মাঠের দিকে ছুটে চলতে। আমার সেই বয়সটা কেটেছে তরাইয়ের অরণ্য-ঘেরা রহস্যলোকের পরিবেশে। উত্তরে হিমালয়ের দিগন্তজোড়া উদাত্ত পটভূমি, পূব থেকে পশ্চিম দিকচক্রবাল পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বত-শ্রেণী। দেখে হঠাৎ মনে হয় যেন এক নীল সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ার আগে জমাট বেঁধে পাথরে পরিণত হয়ে গিয়েছে। পর্বতমালার বাহুগুলি এগিয়ে এসেছে উত্তরের থেকে দক্ষিণের দিকে, পরস্পরের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে। প্রত্যেকটি বাহু চিরশ্যামল নিবিড় বনরাজিতে ঢাকা। মাঝে মাঝে বন পরিষ্কার করে লোকবসতি হয়েছে, পত্তন হয়েছে নগরের।

পাহাড়ের শ্রেণীর পায়ের নীচে যে ভূখণ্ড তার নাম তরাই। ঠিক সমতল নয়, তরঙ্গিত প্রান্তর। গভীর বনে ঢাকা। যেদিকে যাওয়া যাক, চোখে পড়বে যেন সবুজের ঢেউয়ের পর ঢেউ। তার বুকের উপর দিয়ে গিরিনদীর দল এগিয়ে চলেছে আঁকাবাঁকা সর্পিল গতিতে। পাগলাঝোরা সমতলে নেমে মহানন্দা নাম নিয়েছে। তিস্তা এসেছে সুদূর তিব্বত থেকে সিকিমের উপত্যকা ভেদ করে। এসেছে বালাসন, পঞ্চনদী, রুক্মিণী এবং আরো অনেকে। তারা সবাই চলেছে সাগরের সন্ধানে। বছরের অন্য সময় তাদের ক্ষীণ জলধারা দেখে কেউ ভাবতে পারে না যে, বর্ষায় এদেরই বুকে ফুলে ফুঁসে ওঠা ক্ষ্যাপা জলোচ্ছ্বাস ঐরাবতকেও ভাসিয়ে নিতে পারে। আবার শীতে তারা যেন শীর্ণকায়া তপস্বিনী। স্বচ্ছ জলধারা কুলু কুলু তানে অজস্র উপলখণ্ডের উপর দিয়ে বয়ে চলে। ওদের প্রায় সবাই যেয়ে মিশেছে মহানন্দায়। তিস্তা মিলেছে ব্রহ্মপুত্রে। সেখান থেকে পদ্মায়, তারপর সমুদ্রে।

সেই অরণ্যবলয়িত প্রান্তরের উপর দাঁড়ালে পাহাড়কে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে নানারূপে। কোথাও ঘন গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখলে এই অঞ্চলে নবাগতের মনে হবে উত্তরের আকাশের নীচের দিকটা জুড়ে কালো মেঘের পুঞ্জ জমা হয়েছে। আবার খোলা জায়গা থেকে চোখের সামনে হিমালয় তার মৌন মহান গরিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সারা দিনে কয়েকবার যেন পর্বতশ্রেণীর রং বদলায়। কখনও গাঢ় নীল, কখনও ফিকে নীল, আবার এক

সময় বেগুনী। তরাইয়ের যেখানেই যাই গিদ্ধা পাহাড়ের চূড়াটি ঠিক সামনে আকাশ ছুঁই-ছুঁই করে দাঁড়িয়ে আছে। আর সমস্ত শিখরগুলির মাথার বহু উপরে জেগে আছে তুষারকিরীট কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তুঙ্গ মহিমা। সকালে সূর্যের প্রথম রশ্মি সেই কিরীট চুম্বন করে। বিদায় সূর্যের রশ্মি অনেকক্ষণ তাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। সূর্যের আলোকে কাঞ্চনজঙ্ঘার চিরতুষার প্রথমে সোনালী, তারপর ঝকঝকে তামার মত রংয়ে রঙীন হয়ে ওঠে। পরে আবার ধীরে ধীরে সোনালী হয়ে আসে। সন্ধ্যায় নীচের পাহাড়ে, সমতলের বুকে যখন আঁধারের ছায়া গাঢ় হয়ে নেমে এসেছে, তখনও কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে আলোকের আভাস মিলিয়ে যেতে চায় না।

অন্ধকারে দেখা যায় পাহাড়ের আর এক রূপ। তার রং তখন ঘন কালো। তারা-ঝলমল আকাশের নীচে পর্বতশ্রেণীর ঢেউ-খেলানো রূপরেখা ছাড়া আর সব কিছু যেন অন্ধকারের তুলিতে লেপে পুঁছে একাকার হয়ে গেছে। মনে হয় বুঝি নীল আকাশের পশ্চাৎপটে কেউ পাহাড়ের একটি অতিকায় দৃশ্যপট খাড়া করে রেখেছে। সেই পটের গায়ে এখানে ওখানে নক্ষত্ররাজির মত আলোক-মালা চোখে পড়ে। চেনা চোখে ধরা পড়ে ঐ তিনধারিয়ার আলোকস্তবক, ঐখানে কার্শিয়ং শহরের দীপালোকমালা আর ঐ দেখা যায় পূব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত পাঙখাবাড়ী রোডের আলোকিত আভাস। মাঝে মাঝে আলেয়ার মত সঞ্চরণশীল আলোক দেখা যায়। ওগুলি চলন্ত মোটরযানের হেডলাইট। কখনও পাহাড়ী পথের বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার কখনও মোড় ঘুরে নীচের রাস্তাটিতে পৌঁছে দৃষ্টির সামনে ধরা দেয়।

তরাইয়ের বুকে এক একটি টিলার উপরে নিবিড় বনরাজি রহস্যসন্ধানীর মনে অ্যাডভেঞ্চারের দুর্বার আকর্ষণ জাগায়। অ্যাডভেঞ্চারের অভাবও হবে না সেখানে। বিশাল পল্লবঘন বনস্পতির ছায়ায় আর তাদের পাদমূলের দুর্ভেদ্য গুল্ম-লতাপাতা-ঝোপঝাড় ইত্যাদির আড়ালে লুকিয়ে আছে এক অন্য জগৎ। সেখানে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সগোত্রীয়েরা হরিণের পালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রতীক্ষায় ওৎ পেতে থাকে। উদ্যত ফণা বিষধর সর্প, নেকড়ে বাঘের মত হিংস্র বুনো কুকুরের পাল এবং এমনি আরো অনেক বন্যপ্রাণীর দেখা পাওয়া যাবে। বন্য হস্তিযূথ কখনও কখনও এই অঞ্চলের বনভূমিকে সাময়িক বাসস্থানরূপে ব্যবহার করে।

তরাইয়ের যেখানেই যাই প্রকৃতির নয়নভুলানো সৌন্দর্যকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। ঋতুতে ঋতুতে তার মোহিনী রূপের বিচিত্র সমারোহ। কখনও বনপ্রান্তরের শ্যামলিমার প্রাণবন্যা দুই চোখ জুড়িয়ে দেয়। কখনও পথের দুধারে কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলির মাথায় মাথায় যেন আগুনের রক্তিম আভা। আবার কখনও পলাশের গাছে গাছে কিংশুকের পুষ্পিত প্রলাপ নিরুদ্দেশের পথিক হবার আহ্বান জানায়। বনের পথে চলতে নাম-না-জানা ফুলের মিষ্টি গন্ধ মনকে উতলা করে তোলে।

ছেলেবেলা থেকে সেই তরাইয়ের বুকে শালের বনমর্মর আর পাহাড়ী নদীর কলতান শুনে মানুষ হয়েছি। সকালে উঠে নিজের অজান্তেই বুঝি প্রণাম জানিয়েছি হিমালয়ের শান্ত গম্ভীর মহান সৌন্দর্যকে। কতদিন বিকেলে মহানন্দার পুলের উপর দাঁড়িয়ে দিগন্তের দিকে চেয়ে থেকেছি। উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে নীল পাহাড়ের শ্রেণীকে পিছনে ফেলে শালের গভীর জঙ্গল ভেদ করে নদী এগিয়ে এসেছে। পশ্চিমে পাহাড়ের সারি যেখানে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে হতে দিকচক্রবালে মিশেছে তার ওপারে সূর্য অস্ত যায়। সেদিকে দু'চোখ মেলে ধরেছি। তারপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে বিলীয়মান আলোক-রেখার দিকে। সমস্ত অন্তর জুড়ে নেমেছে এক গাঢ় নীরবতা। কোন দিন বা তার সঙ্গে থাকে বিষাদের করুণ সুর মাখানো। কি খুঁজেছি আর কি পেয়েছি? অজানার আহ্বান? কোন অপূর্ণতা বা অভাবের হাত থেকে মুক্তি?

সেদিনের শিলিগুড়ি ছিল প্রায় গ্রামের মত একটি ছোট্ট শহর। সমবয়সী বা সতীর্থদের সংখ্যা ছিল খুব কম। এমন কেউ ছিল না যাকে কল্পনার ভাগ দেওয়া যায়। সময় সময় বড় নিঃসঙ্গ বোধ করেছি। নিঃসঙ্গতার মুহূর্তগুলিতে সাথী হয়েছে হিমালয়ের ঐ দিকবলয়িত পটভূমি। তাকে সামনে রেখে হিলকার্ট রোড ধরে মহানন্দার পুল পেরিয়ে মাল্লাগুড়ি বা পঞ্চনই পর্যন্ত চলে গিয়েছি। রাস্তার বাঁ পাশে ক্ষীণস্রোতা পঞ্চনদী প্রকাণ্ড এক অজগরের মত এঁকে-বেঁকে মাঠের মধ্য দিয়ে মহানন্দার দিকে এগিয়ে চলেছে। পঞ্চনই স্টেশনের কাছে নদী একটা মস্তবড় বাঁক ঘুরে পশ্চিমের উঁচু টিলাটার গা ঘেঁষে চলেছে। উপরে সমস্তটা জুড়ে ছিল চাঁদমণি ফরেস্ট। ফরেস্ট এসে শেষ হয়েছে মাটিগড়া রোডের উপরে। বাঘের ভয়ে হাটের দিন ছাড়া কেউ সে পথে একলা চলতে সাহস করত না। আর রামনবমীর দিন বনের মধ্যে চাঁদমণির পূজা উপলক্ষ্যে

মেলা বসত। সেই দিনটি ছিল আমাদের বয়েসী ছেলেদের পক্ষে একটা অ্যাডভেঞ্চারের দিন। হিলকার্ট রোড থেকে ঐ বনের দিকে চেয়ে আমার মনে হত বুঝি ওর মধ্যে লুকিয়ে আছে কোন দুঃসাহসিক অভিযানের ইঙ্গিত।

হিলকার্ট রোড সেদিনের শিলিগুড়ি স্টেশন থেকে শহরের বুকের উপর দিয়ে দার্জিলিং-এর দিকে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। শহরের মাঝামাঝি এসে আর একটি পথ বার হয়ে গিয়েছে পূবদিকে। সেটি এগিয়ে গিয়েছে শালুগড়া ফরেস্টের বুক চিরে শিভোকের অভিমুখে। দু-পাশের ঘন বনে আদিম নির্জনতা। দিনের বেলাতেও গা ছমছম করে। বন যেখানে শেষ হয়েছে তার এক-দিকে পাহাড়ের দেওয়াল। দক্ষিণে ঠিক নীচেই তিস্তার বালুচর। শিভোকে এসে তিস্তার নীল জলধারা দু'পাশের পাহাড়ের কঠিন শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছে। কোন দিন বিকেলে আপন মনে শিভোক রোড ধরে অগ্রসর হয়েছি। দু'পাশে সারি সারি দেবদারু আর মাঝে মাঝে আম এবং ছাতিমের গাছ। ছাতিমের ফুল যখন ফোটে, তীব্র মিষ্টি গন্ধে চারিদিক আমোদ করে রাখে। উত্তরে মাঠ এক প্রকাণ্ড ঢেউয়ের মত উঁচু-নীচু হয়ে ক্রমে গিয়ে মিশেছে মহানন্দার বালু আর পাথরের নুড়িভরা চরে। সেখানে বসে মনে হয় যেন নদীর ওপারে খানিক দূর গেলেই পাহাড়ের রাজত্ব শুরু। শিভোক রোড বহুদূর পর্যন্ত সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে একটি সরলরেখার মত। সে পথে চলতে চলতে আমার মনে হত শুধু এগিয়েই চলি, দেখি কোথায় তার শেষ?

মাথাভাঙ্গার জীবনে সামাজিক সংহতি ছিল, ছিল সমবয়সী বন্ধুদের মেলা। সে সব ছেড়ে প্রথম প্রথম মনটা খুবই খারাপ লাগত। কিন্তু শিলিগুড়ির বাইরের পরিবেশে এমনই বৈচিত্র্য আছে যা মনকে ভুলিয়ে দেয়। আমাদের বাসার ঠিক সামনে দিয়েই প্রসারিত ছিল দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথের লাইন। সকালে আর দুপুরে ট্রেন যায় পাহাড়ের দিকে। বিকেলে আর সন্ধ্যায় পাহাড় থেকে নামে। ডিসেম্বর মাসে কখনও কখনও দেখেছি পাহাড় থেকে আগত ট্রেনের গাড়িগুলির ছাদ বরফে সাদা হয়ে রয়েছে। দার্জিলিং-এ তুষারপাতের স্বাক্ষর বয়ে নিয়ে এসেছে বোধ হয় আমাদেরই জন্য। সকালে আর সন্ধ্যায় দার্জিলিং মেলের সময় আলোয় ঝলমল-করা স্টেশন সরগরম হয়ে ওঠে। সাদা মুখের নরনারী সোরাবজী হোটেলে প্রাতরাশ শেষ করে ছোট লাইনের খেলনা ট্রেনে চেপে পাহাড়ের দিকে যাত্রা করে। সাহেবী কেতাদুরস্ত কালা আদমীদের

দেখাও পাওয়া যায় যথেষ্ট পরিমাণে। সন্ধ্যায় গাড়ি ছাড়ে কলকাতা অভিমুখে। একটু বড় হওয়ার পর এই দুটি সময় স্টেশনটি ছিল আমাদের কাছে এক বিচিত্র আকর্ষণ। সকালে সব দিন যাওয়া হত না। কিন্তু সন্ধ্যায় হাজির থাকাটা ছিল প্রায় নিয়মিত। কখনও কখনও হঠাৎ দেশের প্রাতঃস্মরণীয়দের দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রভৃতির মত বরেণ্য ব্যক্তিদের চাক্ষুষ দেখার সুযোগ মিলেছে।

তরাইয়ের কোলে বসে ছোটবেলা থেকেই 'ভারতের মহামানবের সাগর তীরের' একটা আভাস যেন মানসনেত্রের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তরাই হল বাংলা, বিহার এবং হিমালয়ের সঙ্গম-ক্ষেত্র। তার প্রান্তরে, চা বাগানে আর শহরের পথে ভিড় করে চলে নানা ধরনের আর নানা জাতের মানুষ। তখনকার শিলিগুড়িতে বাঙ্গালীদের থেকে বিহারীদের সংখ্যাই ছিল বেশি। ছট্ পূজার দিন বিহারী মেয়ে-পুরুষ দল বেঁধে মহানন্দায় যেত স্নান করতে আর পুজো দিতে। যারা পাড়া-প্রতিবেশী ছিল তারা বাড়িতে এসে পূজোর প্রসাদ দিয়ে যেত। রবিবার ছিল হাটের দিন। সেদিন মফস্বল থেকে দলে দলে লোক শহরে আসে। রাস্তায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চলে চা-বাগানের কালো কালো চেহারার শক্তসমর্থ খাটো কাপড়-পরা কুলি মেয়ে-পুরুষ, নেংটি পরা গরীব রাজবংশী চাষী আর 'মেখলা'-পরা কৃষক বধূ। 'দাওরা-সুরুয়াল' পরা গোর্খারা দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথে শ্রমিকের কাজ করে। শীতকালে মেচী নদীর ওপার থেকে দুর্গম অরণ্য এবং পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে আসে সুদূর নেপালের গ্রাম ছেড়ে দুঃস্থ নরনারী। তারা ঠাণ্ডার সময়টা সমতলে থেকে কোনোমতে জীবিকার ব্যবস্থা করে নেবে। ওরা খোলা আকাশের নীচে গাছের তলায় বা নদীর ধারে শুকনো পাতা আর কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বেলে তার চারিদিকে শুয়ে-বসে রাত কাটায়। বসন্তের আভাসে আবার ফিরে যাবে পাহাড়ের কোলের সেই পিছনে ফেলে আসা গ্রাম-জনপদে। দু'একজন হয়ত এখানে থেকে যাবে। শৈলশিখরের তুহিন প্রবাহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য গরীব 'ভুটে'রাও এই সময় নীচে নেমে আসে। তাদের এক একটি দল শিলিগুড়িতেও এসে পৌঁছায়। এখানকার শীতে তারা আগুন জ্বালাবার দরকার বোধ করে না। ঘুমোবার সময় স্বচ্ছন্দ আয়াশে উন্মুক্ত আকাশের নীচে খোলা মাঠের বুকে হাত পা ছড়িয়ে দেয়। বিচিত্র

রং ও আকারের 'বক্কু'পরা মানুষগুলি দুর্বোধ্য ভাষায় গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে ফেরে। কেউ কেউ হাতের ধর্মচক্র ঘুরিয়ে সমান তালে একঘেয়ে সুরে মন্ত্র উচ্চারণ করে বলে 'মানে পেমে হুঁ'। কেউবা নানারকম মুখোশ পরে তিব্বত ও ভুটানের লোকনৃত্যের নমুনা দেখায়।

মাঝে মাঝে বড়দের সঙ্গে গিয়েছি শালুগড়া, শালবাড়ী, মাটিগড়া, বাগডোগরা আর নকশালবাড়ীর হাটে। কতকগুলি চা-বাগানের একটি সমষ্টিকে কেন্দ্র করে এই সব বাণিজ্য-কেন্দ্রের পত্তন হয়েছে। আঞ্চলিক নাম বন্দর। হাটবার ছাড়া অন্যদিনে জনবিরল। শুধু কয়েকটি কাঠের ঘরবাড়ী। সন্ধ্যার পর টিমটিম করে কেরোসিনের বাতি জ্বলে। তাতে অন্ধকারকে আরও গাঢ় মনে হয়। কিন্তু হাটবারে মানুষের ভিড়ে তিল ধারণের ঠাঁই হয় না। আশেপাশের গ্রামাঞ্চলের রাজবংশী চাষী নরনারী সওদা নিয়ে বসে। শিলিগুড়ি থেকেও দোকানীরা গিয়ে উপস্থিত হয় নানা রকমের শহুরে সওদা নিয়ে। চা-বাগানের আদিবাসী কুলি আর কুলি রমণীরাও ভিড় করে। এই সব হাট-গুলিতে বহু মানুষের মেলা আমার চোখে এক নতুন জগতের রূপ নিয়ে দেখা দিত।

ছেলেবেলায় ঐ সব বিচিত্র ধরনের মানুষগুলিকে দূর থেকেই দেখেছি শুধু বিস্ময় আর কৌতূহলে ভরা দৃষ্টি দিয়ে। তারপর ক্রমে ক্রমে কখন জানি না এই সব মানুষগুলিই আমার কাছে ব্যথিত মানবতার প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। সঙ্কল্প নিয়েছি যে এদেরই সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করব।

কেন যে এই রকম একটা সঙ্কল্প নিয়েছিলাম অত কথা তা' তখন ভাল করে বুঝি নি। কি কি কারণের সমাবেশ আমাকে সেদিকে ঠেলে দিয়েছিল তা' যাচাই করা ঐ বয়সে সম্ভবও ছিল না। আজ যখন পিছনের দিকে ফিরে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করি, একটি কারণই সবচেয়ে বড় হয়ে ফুটে ওঠে। বলতে গেলে কৈশোরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের সংঘাতটা অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছে। হিমালয়ের পটভূমিতে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের পরিবেশে অন্তরে বিরাটের ছোঁয়া লেগেছে। কিশোর হৃদয় প্রতিদিনকার গণ্ডী ঘেরা জীবনের পরিধি অতিক্রম করে ছুটে চলার আগ্রহে অধীর। কিন্তু কোথায় পাব পথের নিশানা? ঘরের আর বাইরের জীবনে দিনের পর দিন সেই একঘেয়ে রুটিন। শান্ত সুবোধ ছেলে হওয়ার উপদেশ শুনি আর অনুশীলনের

চেষ্টা করি। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছি। শাস্ত্র এবং আচারের খুঁটিনাটি নির্দেশ ও বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয় প্রতি পদক্ষেপে। চারিদিকে যেন ঘিরে রয়েছে প্রাচীরের পর প্রাচীরের বেষ্টনী। বিচরণের আঙ্গিনা যেন গণ্ডীর পর গণ্ডী দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। শহরের জীবনযাত্রা নিস্তরঙ্গ, একঘেয়েমি ও গুমোটে ভরা। তার উপর সামাজিক পরিবেশটি ছিল নিম্নবঙ্গের শহর ও গ্রামগুলি থেকে একেবারেই আলাদা ধরনের এবং খাপছাড়া।

শুনেছি এখন যেখানে শহর সেখানে শতাব্দীর গোড়ার দিকটায় অনেকখানি জুড়েছিল ঘন বন। তারপর ইংরেজের বাণিজ্য ও সীমান্ত রক্ষার তাগিদে দার্জিলিং জেলার গুরুত্ব হঠাৎ বেড়ে গেল। দার্জিলিং-এর প্রবেশপথ হিসাবে তরাইয়ের বনভুমির বহু শতাব্দীর আদিম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল। রেলপথ তাকে যেন আচমকা টেনে নিয়ে এল বর্তমান যুগের আবর্তের মধ্যে। বন পরিষ্কার করে মাইলের পর মাইল জুড়ে গড়ে উঠল চা-বাগান আর কুলি-বস্তি। বিদেশী বণিকের মুনাফা মৃগয়ার তাগিদে সাঁওতাল পরগনা, বিলাসপুর, ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে দলে দলে সপরিবারে আদিবাসীদের কুলি হিসাবে আমদানি করা হল। হিংস্র বন্য পশু ও তরাইয়ের কুখ্যাত ম্যালেরিয়ার সঙ্গে লড়াই করে বহু প্রাণের বিনিময়ে কি গড়ে তুললো তারা? মালিকদের জন্য মুনাফার পাহাড় আর নিজেদের জন্য মধ্যযুগীয় ধরনের নির্জলা গোলামি এবং বন্দিত্ব। চা-বাগানের অন্ধকারায় কুলি নরনারীর অসহায় বোবা কান্না আর বুকফাটা অভিশাপ ঐ নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যেই গুমরে মরত। হয়ত বা বনের মর্মরিত দীর্ঘশ্বাস চাইত তাদের ভাষাহীন আর্তনাদকে বাইরের জগতে পৌঁছে দিতে। তবু যে মাঝে মাঝে শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজারের হাতে কুলি রমণীর চরম লাঞ্ছনা এবং সবুট পদাঘাতে কুলি মরদের মৃত্যুর খবর বাইরে এসে পৌঁছাত না তা নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কান দেওয়ার বা মাথা ঘামাবার মত লোক কোথায়? আমার ছোট বেলায় দেখেছি যে, চা-বাগানের শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের দাপট শুধু বাগানের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমিত ছিল না। তাদের প্রতাপে কোন কালা আদমির পক্ষে মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হাকিম হয়ে আসার উপায় ছিল না। সীমান্তবর্তী এলাকা অজুহাতে ইংরেজ শাসক দার্জিলিং জেলাকে বিশেষ অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করে নানা বিধিনিষেধের জালে ঘিরে রেখেছিল। জেলার হর্তাকর্তা বিধাতা ডেপুটি কমি-শনারের হুকুমে যে কোন ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিসে জেলা ছেড়ে যেতে

হত। দার্জিলিং জেলার অংশ এবং প্রবেশ-পথ হিসাবে তরাই অঞ্চলও ছিল নানা বিধিনিষেধের বন্ধনে বাঁধা।

হিলকার্ট রোডের উপর দিয়ে পথচারীদের মুখে ধুলো ছড়িয়ে কখনও সখনও যেসব মোটর গাড়ি যাতায়াত করত তার আরোহী হয়ত কোন শ্বেতাঙ্গ চা-কর, নতুবা জেলার শাসক ডেপুটি কমিশনার। ব্রিটিশ শাসনের প্রতাপ উদ্ধতভাবে আত্মপ্রকাশ করত গ্রীষ্মকালে, গভর্নর সাহেবের শৈলসফরের সময়। তাঁর আগমনের দু'তিন দিন আগে থেকে রাস্তার মোড়ে পুলিস পাহারা বসত। রেল স্টেশনটা যেন পুলিস ছাউনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। মহানন্দা পার হলে পথের দুধারে নীল উর্দিপরা চৌকিদারদের মহড়া। রাজপ্রতিনিধির আগমনের আগের সন্ধ্যায় রেল স্টেশনটি পত্রপুষ্প ও ইউনিয়ন জ্যাকে সুসজ্জিত হয়ে আলোয় ঝলমল করত। আমাদের বয়েসী ছেলেদের কাছে সে এক বিচিত্র ব্যাপার। যেদিন তিনি আসবেন, সেদিন সমারোহ দেখার আগ্রহে কলকাতা থেকে দার্জিলিং মেল এসে পৌঁছাবার বেশ কিছু আগে ভোরে উঠে ওভারব্রিজের উপর ভিড় করি। কাছে ঘেঁষার উপায় নেই। দূর থেকে দেখি প্ল্যাটফর্ম জুড়ে লাল কার্পেট বিছানো! তার উপর দিয়ে দম্ভভরে পা ফেলে ছোট লাইনের গাড়ীর দিকে এগিয়ে চলেছেন দেহরক্ষী ও পরিষদ পরিবেষ্টিত হয়ে প্রদেশের ভাগ্যবিধাতা। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সেখানে উপস্থিত থাকার নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। তাঁরা প্রায় আভূমিপ্রণতভাবে ঝুঁকে গভর্নরকে সেলাম করেন।

নিম্নবঙ্গ থেকে আগত যে কিছুসংখ্যক লোক এই অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছেন তাঁরা এসেছেন জীবিকার তাগিদে, নিজ নিজ পিতৃপিতামহের বাসভূমি ছেড়ে ভাগ্যের সন্ধানে। এখানকার মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁদের নাড়ির যোগ স্থাপিত হয় নি। উপরন্তু তাঁরা নিজেদের শিক্ষাদীক্ষা ও কৌলিন্যের অহঙ্কারে এখানকার আদি-অধিবাসী রাজবংশীদের দূরে ঠেলে রেখেছিলেন। অথচ তাদের অজ্ঞতা এবং সারল্যের সুযোগ নিয়ে শোষণ করতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি। দুই একজন করিৎকর্মা ব্যক্তি ত' অল্পদিনের মধ্যেই আইন ও অন্যান্য ব্যবসার সুযোগে বৃহৎ জোতদারে পরিণত হন। তরাই ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতার বাইরে। তাই জমিদার পদবী লাভের গৌরব তাঁদের কপালে জোটে নি। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরাও এসেছেন এবং বছর কয়েক যেতে না যেতে স্ফীত হয়ে উঠেছেন। তরাইয়ের প্রাচীন বাসিন্দাদের অনেকের জমিজায়গা

হাতছাড়া হয়ে দু'চারজন মাড়োয়ারী এবং নিম্নবঙ্গ থেকে আগত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সমৃদ্ধি বাড়িয়েছে। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে সম্বন্ধ উঠেছে অত্যন্ত তিক্ত হয়ে। নবাগতেরা তাচ্ছিল্যভরে রাজবংশীদের 'বাহে' আখ্যা দিয়েছেন। নিজেরা তাদের নিকটে পরিচিত হয়েছেন 'ভাটিয়া' বলে। 'ভাটিয়া' শব্দটি এখানে শোষক কথাটির সমার্থবাচক হয়ে গিয়েছে।

মোটের উপর শিলিগুড়ি ছিল উত্তরবঙ্গের উত্তরতম জেলাগুলির আরো কয়েকটি অনুরূপ শহরের মতই আশেপাশের গ্রামজীবন ও লোকজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। হৃদয় ও মন দুদিক থেকেই সম্পর্কহীন। নিম্নবঙ্গের বর্ধিষ্ণু গ্রাম ও শহরগুলির চারিপাশে যে সামাজিক পরিমণ্ডল থাকে এখানে তার লেশমাত্র নেই। উপরন্তু শহরের ভিতরেও সামাজিক ঐতিহ্য, পরিবেশ ও সংহতির অভাব। শহরটি গড়ে উঠেছে মাত্র হাজার তিন-চার অধিবাসী নিয়ে। ইংরেজের প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক স্বার্থেই তা মহকুমার মর্যাদালাভ করেছে। শহরের জনসংখ্যাও পাঁচমিশেলি। বাঙ্গালীদের মধ্যে কেউ উকিল, কেউ স্কুলের শিক্ষক নতুবা কাষ্ঠব্যবসায়ী বা সরকারী ও রেল-কর্মচারী। চা-বাগানের দুই একজন বড়বাবু এবং কেরানি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার তাগিদে শহরে বাসা করেছেন। স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা খুবই কম। রেল-কর্মচারীদের ছেলেদের পড়ার সুযোগের জন্য রেল কোম্পানি যে অর্থসাহায্য দেয় তাই প্রধান সম্বল। এটিই তরাইয়ের মধ্যে একমাত্র হাই স্কুল। তাও মাইনর থেকে হাই-তে উন্নীত হয়েছে এখানে ছাত্র হিসেবে আমার প্রবেশের বোধহয় বছর দুই আগে। এই অল্প কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মধ্যে সামাজিক যোগসূত্র বড় ক্ষীণ। সবাই যে যার ধান্দা নিয়ে ব্যস্ত। তার উপর এক একজন এসেছেন নিম্নবঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে। তাই কালেভদ্রে পূজা-পার্বণ এবং শহরের সৌখীন রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনয় উপলক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ ঘটে, এই পর্যন্ত।

১৯৪৭ সালে আমার এক বন্ধু এখানে এসে বলেছিলেন যে, বাইরের চেহারা দেখে বোঝা যায় এটি একটি ভুইফোঁড় শহর। কোনরকম পরিকল্পনা ছাড়াই এলোপাথাড়ি গড়ে উঠেছে। ১৯২০ সালে অবস্থাটা কি রকম ছিল সহজেই অনুমান করা চলে। মহানন্দাপাড়া আর বাজারপাড়া, দুই পাড়া নিয়ে শহর। রেল কলোনি বাজার পাড়ারই মধ্যে। পুরানো শিলিগুড়িতে যে দুই এক ঘর বাসিন্দা থাকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে কচিৎ কখনও সখনও। লোক-

বসতি যেটুকু আছে তা হিলকার্ট রোড, স্টেশন ফীডার রোড এবং কিছু পরিমাণে বর্ধমান রোডের মহানন্দার নিকটবর্তী অংশটুকুর দুপাশে। সন্ধ্যার পর প্রধান শড়ক হিলকার্ট রোডে নিশুতি অাঁধার নেমে আসে। স্টেশন রোড রোড স্টেশনের কাছে পর্যন্ত একলা চলতে অন্ধকারে গা ছমছম করে। বর্ধমান রোড ত দিনের বেলাতেও জনবিরল। শহরে প্রাণচাঞ্চল্য জাগে সকালে কলকাতা থেকে দার্জিলিং মেল এসে পৌঁছাবার পর। রাত্রে কলকাতাগামী দার্জিলিং মেল ছেড়ে গেলে চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে পড়ে। মোটের উপর বলা চলে শহরটি গড়ে ওঠে অনেকটা বন কেটে বসত-বানানো উপনিবেশের ধাঁচে। সেখানে যেমন ছিল সমাজজীবনের ঐতিহ্য ও সংহতির একান্ত অভাব, তেমনি আবার বনেদী সামাজিক রীতি-নীতি আচারবিচারের কড়াকড়ি ছিল যথেষ্ট শিথিল। সেই পরিবেশে উপনিবেশের জীবনসুলভ বহু দুর্নীতি প্রায় প্রকাশ্যে প্রশ্রয়লাভ করেছে। একটু বড় হওয়ার পর মানুষের জীবনের নানা গ্লানিকর দিক চোখে পড়তে শুরু করেছে। দেখেছি স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতা, কূপমণ্ডূকতার নানা অভিব্যক্তি। সমবয়সীদের কথাবার্তা-আচার-আচরণে ঘটেছে বড়দের আচরণের প্রতিফলন। তাই মন এক এক সময় বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করেছি।

ঘরের পরিবেশও মনের প্রসারের পক্ষে সবসময় অনুকূল ছিল না। ছেলেবেলাতে পিতৃহীন হয়েছি। সামনে দেখেছি অভিভাবক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে। কিন্তু তাঁর গোটা জীবনটাই তীব্র সংঘাত আর তাতে পরাজয়ের কাহিনী। সংঘাত একদিকে প্রথাগত সামাজিক ধ্যানধারণা-সংস্কার এবং অন্যদিকে আধুনিককালের চিন্তার মধ্যে। দ্বন্দ্ব চলেছে তাঁর উদার মানসিকতা আর বাইরের পরিবেশের ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে। ফলে দেখা দিয়েছে নিদারুণ অশান্তি, যা কাছের মানুষের জীবনকে দুঃসহ করে তুলেছে। তিনি কুলগুরুর নির্দেশে জীবিকার জন্য ওকালতির পথ বেছে নিয়েছিলেন। গুরু গণনা করে বলেছিলেন যে, বড়দা পরে হাকিম হবেন। সেদিন 'আই-সি-এস' ত দূরে থাকুক, 'বি-সি-এস' হওয়ার স্বপ্নটাও ছিল নিম্নবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের ছেলেদের নাগালের বাইরে। তাই উকিল থেকে মুন্সেফ হওয়াটা সহজ রাস্তা ভেবে তিনি ওকালতির পথে পা বাড়ান। কিন্তু পেশাটা ছিল তাঁর মনোবৃত্তির একেবারে বিরোধী। হয়ত শিক্ষকতার বৃত্তি বেছে নিলে যেসব সদগুণ ও সম্ভাবনা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত

হয়ে উঠত সেগুলি আইনজীবীর ব্যবসায়ে পদে পদে বাধা পেয়েছে, সাফল্য-লাভের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। ব্যবসায়িক সাফল্যের খাতিরেও কোনরকম অন্যায়ের সঙ্গে এতটুকু আপস না করার নীতির দরুন বহুক্ষেত্রে সম-ব্যবসায়ীদের অসন্তোষ ও বিরক্তির কারণ হয়েছেন। তিনি যে তরাইয়ের রাজবংশী সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন এটাও সম-ব্যবসায়ীদের অনেকের ঈর্ষার কারণ হয়েছে।

আমরা দরিদ্র পিতার সন্তান। বাবাকে হারিয়েছি দশ বৎসর বয়সে। সে স্মৃতি আবছা মনে পড়ে। মার মুখে বাবার সম্বন্ধে নানা কথা শুনেছি। ভারতীয় ঐতিহ্য বলতে যে ধারণাগুলি খুব চলতি অর্থাৎ ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা, মানবপ্রেম, অধ্যাত্মপ্রেরণা, গরীব হয়েও কারুর সামনে মাথা নত না করার চারিত্রিক দৃঢ়তা. অন্যায় সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা, সেগুলি তাঁর ব্যক্তিত্বে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন তদানীন্তন কোচবিহার রাজ্যের একজন সামান্য বেতনের কর্মচারী। তবু চরিত্রগুণে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের কাছ থেকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মানলাভ করেছিলেন। আর এই চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্যই একবার উচ্চতর কর্মচারীর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে পুরো পেনশন লাভের যোগ্যতা অর্জনের পূর্বেই চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে এসেছিলেন। তাঁর বেলায় পরিবেশের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল কতখানি জানি না। কিন্তু বড় ভাইয়ের বেলায় দেখেছি ঐসব সদগুণের সঙ্গে মিশে ছিল বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতার অভাব আর প্রচণ্ড অসহিষ্ণুতা। সেদিনের ঐ শহরে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং হৃদয়ের উদারতার বিচারে তাঁর সমকক্ষ লোক ছিলেন নিতান্তই দুই একজন। অথচ এঁদের সঙ্গে সম্প্রীতির বদলে তিক্ততার সম্পর্কই গড়ে উঠেছিল। ঐ ছোট্ট শহরটির সমাজজীবনে কার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে তাই নিয়ে সংঘাত লেগে থাকত। অন্যেরা যখন বাইরের সৌজন্য ও অমায়িকতার আড়ালে তিক্ততাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করতেন, বড়দা তাকে প্রকাশ করে ফেলতেন অত্যন্ত রূঢ়ভাবে। নিজের মনের সঙ্গেও দ্বন্দ্বের বিরাম ছিল না। যে ভাব-ধারার প্রভাবে তিনি মানুষ হয়েছেন তার অনেক কিছু যে পরিবর্তনশীল দুনিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়েছে সেকথা যুক্তি দিয়ে বুঝতেন, কিন্তু আচার-আচরণে ছাড়তে পারেন নি। অনেককে দেখেছি ব্যক্তিগত জীবনে সামন্তযুগীয় ধ্যানধারণা আচার-ব্যবহারকে পুরোপুরি বজায় রেখেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সময়োপযোগীভাবে

চলতে পারেন। দাদার পক্ষে তা ছিল একেবারেই অসম্ভব। বোধ হয় নিজেকে প্রতারণা করার ক্ষমতার অভাবই সেজন্য দায়ী। বাইরের জীবনে আঘাতের পর আঘাত পেয়ে অন্তর্মুখীন হতে চেয়েছেন। আধ্যাত্মিক সত্যের সন্ধানে চিন্তা স্বাধীনভাবে অগ্রসর হওয়ার পথ খুঁজছে। কোচবিহার কলেজে পড়ার সময় তিনি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের স্নেহধন্য ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন। যুক্তিবাদ তাঁর দার্শনিক চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল। তা সত্ত্বেও দৈনন্দিন জীবনে শাস্ত্রাচারের কঠোর বিধিনিষেধ, সংস্কার, অদৃষ্টে বিশ্বাস প্রভৃতিকে উপেক্ষা করে চলার মত দৃঢ়তা ছিল না। প্রতি বৎসর কুলগুরুর আগমন হলে দেখেছি যে তাঁর সঙ্গে দাদার তুমুল তর্ক বেধে যেত। তর্কের সময় অনেক পুরাতন প্রথা ও ধারণাকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেন অথচ বাস্তবক্ষেত্রে সেগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস হয় না; তখন জাত-অজাত বিচার, ছোঁয়াছুঁয়ি, ব্রাহ্মণ্যের অভিমান, হাঁচি-টিকটিকি, দৈব, গুরুবাক্য ইত্যাদি যেন দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মত সম্মুখের পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

ঘরে আর বাইরের বায়ুমণ্ডলে যদি এমনিভাবে বদ্ধ গুমোট এবং অশান্তির রাজত্ব চলতে থাকে তবে তার মাঝে কিশোর মনের স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তির অবকাশ কোথায়? কোথায় বা পাই রোজকার ছকে বাঁধা জীবনযাত্রার বাইরে যাওয়ার পথের নিশানা? শুধুই কি তাই? কঠোরভাবে চিহ্নিত ছকের বাইরে পা ফেলার সামান্য প্রয়াসের বিরুদ্ধে ত নানা বিধিনিষেধের অনুশাসন তর্জনী উদ্যত করে রয়েছে। চারিদিকে শুধু মানা আর মানা, এবং যেন একটা অদৃশ্য ভয়ের রাজত্ব।

তবু অচলায়তনের রুদ্ধ জানালাগুলি একে একে খুলতে আরম্ভ করে। দাদার অভিজ্ঞতা থেকে সঙ্কল্প করেছিলাম যে, ভবিষ্যতের জন্য যে পথই বেছে নিই না কেন, তা বেছে নেবো নিজের বিবেকের তাগিদে। জীবনের পথ নির্বাচনের প্রশ্নটি তখনই আমার সামনে এসে গিয়েছিল। প্রশ্নটি আমার মন থেকে হারিয়ে যায় নি। চলার পথের প্রত্যেক নতুন মোড়ে বার বার নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছি। অনেক সময় দোটানার মধ্যে পড়েছি। অন্তরে বেশ টানাপোড়েনের পর একটা পথ বেছে নিয়েছি। বিভিন্ন সময়ে হয়ত নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন জবাব দিয়েছি। আজ পিছনের দিকে চোখ মেলে বুঝতে পারি সব জবাবের মধ্য দিয়েই একটা মূল সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। নিজের অজানতে অন্তরে বিরাটের

যে অনুভূতি অঙ্কুরিত হয়েছিল তা যেন আমার বাইরের জীবনের সকল কাজে প্রতিফলিত হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা আর প্রাত্যহিককার ক্ষুদ্রতা মলিনতা যেন সেই অনুভূতিকে কখনও গ্রাস করতে না পারে। এমনি এক পরশমণির সন্ধানেই বেছে নিয়েছিলাম বঞ্চিত মানবতার সেবার পথ। উপলব্ধি করেছি যে, এর মধ্য দিয়েই লাভ করব জীবনের সার্থকতা।

সেই উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যেতে যিনি সাহায্য করেছিলেন তাঁর কথা আজ বিশেষভাবে স্মরণ করি। সচেতনভাবে বোঝার আগেই হাতেকলমে কাজ শুরু হয় সেই মানুষটির প্রেরণায়। তিনি ছিলেন একজন অতি সাধারণ সরকারী কর্মচারী। স্থানীয় সাব-জেলের কেরানীর কাজ করতেন বলে তিনি আমাদের কাছে 'জেলারদা' নামে পরিচিত ছিলেন। চাকুরীর মত শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকেও তাঁর কোন কৌলিন্য ছিল না। কিন্তু আমাদের মতন ছেলেদের কাছে তিনি ছিলেন দস্তুরমত 'হীরো'। কেননা আমরা দেখতাম যে ছোট্ট শহরটির সমস্ত বারোয়ারী অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের চাবি-কাঠি তাঁর হাতে, বিশেষ করে সেই সব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান—যেগুলি ছিল আমাদের কাছে প্রধান আকর্ষণের বিষয়। আমরা দেখতাম 'জেলারদা' না হলে তরাই পাবলিক লাইব্রেরী খোলা হয় না। তখন সবে নাটক-উপন্যাস পড়তে শিখেছি। বৌদিদের নাম করে সেগুলি নিয়ে এসে গোগ্রাসে গিলি। বড়দার চোখে যাতে না পড়ে সেজন্য অত্যন্ত সাবধানে চলতে হয়। জেলারদা সদয় না হলে ইচ্ছেমত বই আনা চলে না। বৌদির নাম করে আনলেও পাঠক যে আমি তাও তাঁর নজর এড়ায় নি। শহরের সৌখিন রঙ্গমঞ্চ 'মিত্র সম্মিলনী'তে তখনও দর্শকদের জন্য স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ গড়ে ওঠেনি। করোগেট টিনের চাল আর বেড়া দিয়ে তৈরী মঞ্চের সামনে সামিয়ানা টাঙিয়ে দর্শকদের বসার ব্যবস্থা হত। প্রেক্ষাগৃহ তৈরী করার ব্যাপারে দেখতাম তিনিই অগ্রণী। নিজেই খন্তা-কোদাল নিয়ে মাটি খুঁড়ে খুঁটি পোঁতার কাজে লেগে যেতেন। আবার সেই অস্থায়ী প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশ পথে তিনিই প্রহরী এবং প্রোগ্রাম বিতরণের ভার তাঁরই হাতে। দক্ষ অভিনেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কারও বাড়িতে সামাজিক ক্রিয়াকলাপে, উৎসবে, নিমন্ত্রণে, অতিথিদের পরিবেশনে সেই একই লোকটিকে সকলের আগে এগিয়ে আসতে দেখেছি। এহেন ক্ষমতাশালী মানুষটি ছিলেন সদাপ্রফুল্ল ও স্নেহ-কোমল। তাঁর কাছে ছেলেদের জন্য দ্বার ছিল অবারিত।

কিশোর মনের রঙীন ফানুসগুলির কথা তাঁর সামনে অকপটে ব্যক্ত করা যেত।

শিলিগুড়ির অতীত ইতিহাসের কথা উল্লেখের সময় এখন তাঁর নামটি সবাই ভুলে যায়। না ভুললেও হয়ত স্থানীয় দিকপালদের পিতা-পিতামহদের নামের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে তার নাম উচ্চারণের কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনা। কেনই বা ভাববে? সে মানুষটির যা কিছু অবদান তা ছিল সেবায়—অর্থে নয়, সামাজিক প্রতিপত্তিতে নয়, জ্ঞানে নয়; শুধু মানুষের সেবা; তাও নীরবে। যাদের কাছ থেকে প্রতিদানে কিছু পাওয়ার নেই তাদের প্রতিই তাঁর মমতা ছিল বেশি। দেখেছি রাস্তার ধারে পড়ে থাকা সহায়-সম্বলহীন নেপালী বা রাজবংশী অথবা বিহারী ভিক্ষুককে নির্বিকারে কোলে তুলে নিয়ে সরকারী হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছেন। শহরে কারও বাড়িতে কঠিন অসুখে আক্রান্ত রোগীকে রাতের পর রাত জেগে শুশ্রূষা করতে দেখেছি। এই লোকটি যেদিন আমাদের দুই-তিন জন বন্ধুকে সেবাব্রতে সঙ্গী হতে ডাক দিলেন সেদিন সাড়া দিতে একটুও দেরি করি নি। দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ থেকে শুরু করে সমাজ সেবার অনেক কাজে এমনিভাবে হাতে-খড়ি হয়েছে।

জেলারদা হাতেকলমে কাজ শিখিয়েছেন, তত্ত্ব-উপদেশ দেন নি কখনও। তবু তত্ত্ব সম্বন্ধে আগ্রহটা তিনিই জাগিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের মনে। একবার তাঁর উৎসাহে আমাদের সমবয়সী ছাত্রদের মধ্যে প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা হয়। স্কুলের মাস্টার মশায়রাই ছিলেন. বিচারক। প্রবন্ধের বিষয় কি ছিল ভুলে গিয়েছি। আমিই প্রথম হয়ে পুরস্কার লাভ করেছিলাম। পুরস্কারদাতা জেলারদা। তিনি দিয়েছিলেন অরবিন্দের 'কর্মযোগ' নামে বইটি। কর্মযোগের দার্শনিক তত্ত্ব বোঝার মত যোগ্যতা তখনও হয় নি নিশ্চয়ই। তবে বিষয়বস্তুটি একেবারে অজ্ঞাত বা দুর্বোধ্য ছিল না। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই বিভিন্ন আশ্রমের সাধু-সন্ন্যাসীরা অতিথি হিসাবে আসতেন। তাঁদের কারুর কারুর সাথে শাস্ত্র ও দর্শন নিয়ে বড়দার ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলত। বড়দা ব্যক্তিগত জীবনের লাভক্ষতি, পাপপুণ্য, মোক্ষ ইত্যাদির বদলে অনেক দার্শনিক প্রশ্নের অবতারণা করতেন। আলোচনায় সামাজিক সংস্কার, ভেদাভেদ ইত্যাদির বদলে জ্ঞান ও কর্মের এবং যুক্তি ও চিন্তার দিক প্রাধান্য লাভ করত। সন্ন্যাসীদের মধ্যে যে দুই-একজনের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল তাঁরা বাইরের

আচার-নিয়ম, পূজা ইত্যাদির বদলে অন্তরের পবিত্রতা, জ্ঞান ও মানবকল্যাণের কথাই বেশি করে বলতেন। ঘরের এই আবহাওয়ার প্রভাবে আমার চিন্তা ও ধ্যানধারণায় অধ্যাত্মবাদের রং গাঢ় হয়েই লেগেছিল। কিন্তু তা কর্ম বা জীবন-বিমুখ করে নি। বরং অধ্যাত্মবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল আশেপাশের ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, মলিনতার উর্ধ্বে ওঠার একটি সোপান।

সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় আর একজন বয়স্ক অথচ ছেলেদের সঙ্গে সহজ-ভাবে মিশতে পারেন এমনি মানুষের সংস্পর্শে আসি। তিনি ছিলেন বড়দারই বন্ধু। তিনি কর্মযোগের মূল শিক্ষাটি বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। সুখেনবাবুর ব্যাখ্যায় সেবাব্রতের দিকটিই প্রাধান্য লাভ করে। বড় হয়ে জেনেছি যে, ঐ যুগে বিপ্লবী তরুণদের কাছে কর্মযোগের উক্ত ব্যাখ্যাই ছিল প্রধান। তা যেন মায়াবাদ এবং অদৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। সেইজন্যই বইখানির উপরে ছিল পুলিসের বিষদৃষ্টি। সুখেন-বাবুর সঙ্গে কোন বিপ্লবী দলের সম্পর্ক ছিল বলে পরেও কোনদিন শুনি নি। বিপত্নীক মানুষ, বই নিয়ে সারা দিন কাটাতেন। শহরের জীবনে কোন ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহ নিতেও দেখি নি। তিনি শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণীও শোনাতেন। ওঁদের শিক্ষার মানবিক আবেদনটাই তুলে ধরতেন অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে। সেখানে শুনেছি জাতিধর্ম, উচ্চনীচ, ছোঁয়াছুঁয়ির ভেদাভেদ ভুলে সমস্ত মানুষের মধ্যে দেবতাকে দেখার উদাত্ত আহ্বান। শুনেছি বেড়াভাঙার ডাক। পেয়েছি নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করে এগিয়ে চলার প্রেরণা। মনে অঙ্কুরিত হয়েছে সর্বমানবের ঐক্যের ধারণা।

ছোড়দা তখন কোচবিহার কলেজের ছাত্র। সেখানে অসহযোগ অন্দো-লনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কলেজের ছুটির সময় যখন শিলিগুড়িতে আসতেন তার পরিধানের মোটা খদ্দর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত। স্বামীজীর লেখা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, পত্রাবলী, বিবেকবাণী প্রভৃতি বইগুলি সব সময় সঙ্গে রাখতেন। দাদার কাছ থেকে নিয়ে বইগুলি পড়তে শুরু করি। যে সব কথা বুঝতে পারিনা বা যেখানে মনে প্রশ্ন ওঠে সে সব নিয়ে সুখেনবাবুর কাছে চলে যাই। আমার শোবার ঘরের কাঠের বেড়ার গায়ে টাঙানো ছিল শ্রীচৈতন্যের ছবির পাশাপাশি দক্ষিণেশ্বরের আত্মভোলা সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর মানসপুত্র বিবেকানন্দের ছবি। দাদারা

তাঁদের দেবতারূপে পূজা করতেন। সুখেনবাবুর শিক্ষার ফলে ও'রা দেবতার আসন ছেড়ে নেমে এলেন আমার মনে অত্যন্ত কাছাকাছি। তাঁদের চিনতে শিখি মানবপ্রেমিক মহাপুরুষ রূপে।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ত ছিল সে যুগের যুবক ও কিশোর সমাজের প্রধান সম্বল। তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছি শক্তির বলিষ্ঠ প্রকাশ, মানুষ মাত্রেরই মর্যাদা সম্বন্ধে দৃপ্ত ঘোষণা। শুনেছি কর্মের আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ার অমোঘ আহ্বান। সমস্ত অন্তর জুড়ে ধ্বনিত হয়েছে দাস মনোভাব, মোহ এবং ভীরুতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বজ্রনাদ। স্বামীজীকে জেনেছি নবযুগচেতনার প্রতিনিধি হিসেবে। তাঁর বাণীকে পাথেয় করেছি। ভেবেছি এরই সাহায্যে পাব বড় ভাইয়ের জীবনের ব্যর্থতাবোধের হাত থেকে মুক্তিলাভের পথনির্দেশ। তাই প্রথম থেকেই আধ্যাত্মিকতা আমাকে অন্তরমুখীন করেছে কিন্তু আত্ম-কেন্দ্রিক করে নি।

মন যখন আত্মসচেতন হয়ে উঠতে থাকে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা স্বপ্নের জাল রচনা করে, সেই বয়েসে সবারই সম্ভবত নিজের সম্বন্ধে ধারণাটা অনেক বড় হয়। আমার বেলায় ব্যতিক্রম হয় নি। নিজেকে মনে হত যেন এক অনাবিষ্কৃত জগতের অভিযাত্রী। সেখান থেকে বহু অমূল্য সম্পদ আহরণ করে এনে পৃথিবীকে উপহার দেব। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রেখে যাব আপন অস্তিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। বইতে পড়া যে সব কাহিনী হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে সেগুলির নায়কের ছাঁচে নিজেকে গড়ে তুলতে চাই; তাই বুঝি সেদিনের কল্পনায় চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের পাশে এসে দাঁড়ায় অমিতাভ বুদ্ধের জ্যোতির্ময় ছায়ামূর্তি। তিনি ত মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়ায় সাধনায় খুঁজেছিলেন জ্ঞানের পথে মুক্তি। দাদার মুখে নিত্য শোনা জপের মন্ত্র 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' নতুন অর্থ পরিগ্রহ করতে থাকে। জ্ঞানের জ্যোতি কবে অজ্ঞানের তমসাকে দূর করে দেখা দেবে? হবে 'তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়'?

ইতিমধ্যে মানুষের সেবার ধারণায় একটা মোড় পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তাতে একটু একটু করে রাজনীতির ছাপ পড়তে আরম্ভ করে। দুঃখী মানবতার সেবার ব্রত কখন যেন দেশজননীর শৃঙ্খল মোচনের সঙ্কল্পে রূপান্তরিত হয়। শিলিগুড়ির মত শহরের পরিবেশে এই প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট রূপ নিতে বেশ কয়েক বছর সময় লেগেছে। রাজনীতি মানেইত বিদেশী শাসকের

বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। শিলিগুড়ি শহরের আবহাওয়াতে সেই বিপদের ঝুঁকি নেওয়া দূরে থাকুক, সে কথা ভাবার মত বুকের পাটা কয়জনের ছিল? বড়দের আচরণে রাজভক্তির প্রকাশটাই বেশি করে চোখে পড়েছে। স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণের সভায় পৌরহিত্য করতেন দার্জিলিংয়ের শ্বেতাঙ্গ ডেপুটি কমিশনার। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সেই 'মহাপুরুষ'-এর সঙ্গে করমর্দনের সময় বিনয়ে প্রায় আ-ভূমি ঝুঁকে পড়তেন। অভিভাবকেরা চাইতেন ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্যের আদর্শকে আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে দিতে। তবুও এত সতর্ক পাহারার বেড়া ডিঙিয়ে এক বে-হিসেবী বে-পরোয়া জীবনের ইশারা এসে পৌঁছায়।

আমরা শিলিগুড়িতে আসার কিছুদিন পর থেকেই ঐ অঞ্চলে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে যা মনের গভীরে স্থায়ী প্রভাব রেখে গিয়েছিল। বাল্যে সেগুলির তাৎপর্য বুঝিনি। কিন্তু কিশোরে পা দেওয়ার পর সেগুলির স্মৃতি জীবন্ত হয়ে উঠে জীবন জিজ্ঞাসাকে উদ্দীপ্ত করেছে।

মাথাভাঙ্গা ছেড়ে আসার বোধ হয় বছর খানেকের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ অল্পকালের জন্য হলেও হিমালয়ের পাদপ্রান্তে এসে আছড়ে পড়েছিল। দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলও উঠেছিল বিক্ষুব্ধ হয়ে। গোর্খা নেতা দলবাহাদুর গিরির কথা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে। তিনিই পাহাড়ের নেপালী ভাষী জনতার মধ্যে স্বাধীনতার বাণী প্রথম প্রচার করেন। ফলে ডেপুটি কমিশনার তাঁর উপর হুকুম জারী করেন যে, চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর জেলা ছেড়ে যেতে হবে। দলবাহাদুর সে নির্দেশ অমান্য করে কারাবরণ করেন। শিলিগুড়ি শহরেও কয়েকজন লোক বে-পরোয়া হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গ্রেপ্তার হন। এঁদের নেতৃত্বে ছিলেন মঙ্গল সিং নামে একজন বিহারী ভদ্রলোক। তখন তিনি ছোট ব্যবসায়ী মাত্র, শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ নন। তাঁর সঙ্গীরাও সাধারণ মানুষ। কিন্তু এই সব অখ্যাতনামা মানুষগুলিকে সম্বর্ধনা জানাতে কোর্টের প্রাঙ্গণে সেদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনসমাবেশ হয়েছিল। শহরের সাধারণ মানুষেরাই ভিড় করেছিল সেখানে। বাঙ্গালী, বিহারী ছাড়া গোর্খাও ছিল কয়েকজন। নিছক কৌতূহলী জনতা নয়, পুলিশের হুমকি উপেক্ষা করেই তারা সেখানে সমবেত হয়েছিল। বিচারের পর যখন বন্দীদের জলপাইগুড়ি জেলে স্থানান্তরিত করা হয় তখন রেলস্টেশনও মানুষের ভিড়ে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল।

অবশ্য এই অঞ্চলে অসহযোগ আন্দোলন কয়েকদিনের বেশি স্থায়ী হয় নি। তার তরঙ্গ যেন জোয়ারের বেগে এসেছে আবার ফিরতি বেলায় ভাঁটার টানে ফিরে চলে গেছে। তবু দেশজোড়া স্বাধীনতা আন্দোলনের উন্মাদনা মানুষের মনে তার চিহ্ন রেখে যায়। কোথায় কিভাবে চিহ্ন রেখে গিয়েছে আপাতঃ দৃষ্টিতে সবার চোখে ধরা পড়ে না বটে—কিন্তু কিছুদিন পরে আর একটি ঘটনায় তার প্রতিধ্বনি জাগে। গোটা তরাই অঞ্চল ওঠে সচকিত হয়ে। সেই ঘটনার নায়ক চা-বাগানের নিরীহ স্বভাবের ওরাওঁ, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসী কুলিরা। এই বোবা মানুষগুলি শহরের ভদ্রলোকদের কাছে 'ধাঙড়' বলে পরিচিত। কথাটার আসল অর্থ যাই হোক না কেন, ভদ্রলোকদের কাছে তা নেহাৎ নির্বোধ জংলী মানুষের সমার্থবাচক হয়ে গেছে। সেই মানুষগুলিকে চা-বাগানের বাইরের দুনিয়ায় দেখতে পাওয়া যায় শুধু হাটবারগুলিতে। মাটিগড়া, শালবাড়ি, বাগডোগরা, নকশালবাড়ি, পানিঘাটার হাটগুলিতে ওদের ভিড়ে পা ফেলা দুষ্কর হয়। তারা অতি সাধারণ দু'একটা সওদা কেনে। মেয়েরা কেনে পুঁতির মালা বা নাকে কিংবা কানে পরার পুঁতির গয়না। তারপর সবাই মিলে সারা সপ্তাহের রক্তজল করা পয়সা ঢেলে দিয়ে আসে দেশি মদের দোকানে। দিনের পর দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম ও পশুর মত লাঞ্ছনাময় জীবনে ঐটুকুইত তাদের জীবনে একমাত্র বৈচিত্র্য। একে ত' ঘরে তৈরী 'হাঁড়িয়া' খাওয়া উপজাতিদের মধ্যে বহুল প্রচলিত পুরানো রীতি—তার উপর বাগানের কর্তৃপক্ষ ও মদের দোকানদার নানা কৌশলে তাদের আকর্ষণ করে বিষভাণ্ডের দিকে। শান্ত ভীরু স্বভাবের মানুষগুলি ফরসা জামা-কাপড় পরা লোক দেখলে সভয়ে পথ ছেড়ে দেয়। মঙ্গল সিং হাটে হাটে ঘুরে এদের কাছে যখন অসহযোগের বাণী প্রচার করতেন তখন তারা মুখ বুজেই শুনেছে। হয়ত দুই'এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছে। তারপর আপন কাজে বা নেশার খোঁজে চলে গেছে। একদিন সেই ভীতু মানুষগুলি কি কারণে আচম্বিতে ক্ষেপে গিয়ে মাটিগড়ার হাটে মহাজনদের গদি লুঠ করে বসল। তার সঙ্গে রাজনীতির কোন সংশ্রব ছিল না। তবু আইন ও শৃঙ্খলার মর্যাদা রক্ষার জন্য বহু সশস্ত্র পুলিশ আমদানী করা হল। গ্রেপ্তার করা হল অনেককে, মেয়ে-পুরুষ কেউ বাদ গেল না। এই মামলা চলে শিলিগুড়ি কোর্টে, বেশ কিছুদিন ধরে। আসামীদের অনেকেই দীর্ঘ মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

এর কিছুদিন পরেই মহকুমা কোর্টে শুরু হয় লবণ ডাকাতের মামলা। চা-বাগানের কুলিদের মতই অবজ্ঞাত, পায়ের তলার নিষ্পেষিত রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে ওঠা এই মানুষটি তখন গোটা তরাইয়ের ভয়, বিস্ময় ও কৌতূহলের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার কর্মক্ষেত্র ছিল মেচী নদী পার হয়ে নেপালের তরাই অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। সত্য মিথ্যা জানিনা, লোকমুখে লবণের সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছিল। সে নাকি ধনী মহাজন এবং অত্যাচারী জোতদারদের বাড়ি ছাড়া ডাকাতি করত না। অনেক সময় লুঠের ধন গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিত। সেই মানুষটি যখন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ও তার বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয় তখন তাকে দেখার আগ্রহে আদালত প্রাঙ্গণে লোক জমা হত।

অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষণিক জোয়ার ভাঁটার টানে নেমে যাওয়ার পর আমাদের শহরে প্রায় সবাই তার কথা ভুলতে বসেছিল। অন্ততঃ কারুর মুখে আলোচনা শুনি নি। আবার আলোড়ন জাগল ডিউক অফ কনটের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভেবেছিল সম্রাটের প্রতিনিধির সম্মানে ভারতবাসীর মজ্জাগত রাজভক্তি উথলে উঠে বিদ্রোহের মনোভাবকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কিন্তু হল তার বিপরীত। বাড়িতে অমৃতবাজার পত্রিকা রাখা হত। বড়দার মন প্রফুল্ল থাকলে বিশেষ বিশেষ খবরের কথা মা ও বৌদিকে শোনাতেন। অমনিভাবেই শুনেছি যে, মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সারা দেশে প্রতিবাদের সুস্পষ্ট ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছে। ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ মিছিলে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আলোড়িত হয়ে উঠেছে। এবার সেই বিক্ষোভের প্রতিধ্বনি শুনি অত্যন্ত কাছে, আমাদেরই স্কুলের প্রাঙ্গণে। ডিউকের সম্মানে ছাত্রদের মেডেল বিতরণ করা হবে। হেডমাস্টার মশায়ের আদেশে আমরা মাঠে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ উপরের শ্রেণীর দু'তিন জন ছাত্র মেডেল নিতে অস্বীকার করে বসল। শিক্ষকের রক্তচক্ষু আর শাসানি তাদের মাথা নোয়াতে সমর্থ হল না। ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে হেডমাস্টার মশায় বেত্রাঘাতের পর বেত্রাঘাতে ওদের শরীরে রাজভক্তির রক্তাক্ত চিহ্ন এঁকে দিলেন। তবু তারা অটল, সকলের চোখের সামনে মাথা উঁচু করে দৃপ্ত পদ-ক্ষেপে স্কুল ছেড়ে চলে গেল। আমরা তখন অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে দেখেছি। মুখ ফুটে প্রতিবাদ করার সাহস হয় নি। শাস্তির ভয়ে চোখের জল চেপে

রেখেছি। এই খবর শোনার পর অবিভাবক মহলের এক অংশে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা দিল। হেডমাস্টার মশায়ের আচরণে শহরের মানুষ বিক্ষুব্ধ। অনেকে হয়ত মানবিকতার দিক দিয়ে তাঁর কাজের সমালোচনা করেন। আমার বড়দার মত দুই একজন খোলাখুলিই বল্লেন যে, এভাবে রাজভক্তি প্রদর্শনের কোন অধিকার হেডমাস্টারের নেই। এর বিহিত করতে হবে। আমার মেজদা সরকারী কর্মচারী। সেই সময় তিনি শিলিগুড়িতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছদ্মনামে অমৃতবাজার পত্রিকায় চিঠি পাঠিয়ে প্রতিবাদ জানালেন। চিঠি ছাপা হওয়ার পর শহরে বেশ চাঞ্চল্য শুরু হল। পত্রপ্রেরক কে তাই নিয়ে নানা জল্পনা। তাঁর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানা মতের অভিব্যক্তি। এখানকার খবর সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে তাই নিয়ে যেন কাউকে কাউকে গর্ববোধ করতেও দেখেছি।

বঙ্গভঙ্গ যুগের স্বদেশী আন্দোলন এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের কার্যকলাপের কথা প্রথম শুনি আমার মায়ের মুখে। সেও একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে। ঘটনাটি ছিল হয়ত ছোট কিন্তু তার তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। সেবার মাস দুয়েকের জন্য মাথাভাঙ্গায় ফিরে গিয়েছিলাম মা ও ছোড়দার সঙ্গে। ছোড়দার কলেজের ছুটির সময়টা আমরা ওখানে কাটাবো। ওখানকার বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের একটা ব্যবস্থাও ছোড়দাকে করে আসতে হবে। কয়েক বছরের ব্যবধানের পর শৈশবের বহু প্রিয় স্মৃতিজড়িত সেই পরিচিত পরিবেশে ফিরে গিয়ে তাকে যেন নতুন করে পেতে চাই। ছেলেবেলার সঙ্গী-সাথীরা দেখা করতে আসে। তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই মানসাই আর সুটুঙ্গা নদীর তীরে। দিনগুলি অনাবিল আনন্দে কেটে যায়।

ছোটবেলায় দেখেছি আমাদের শোবার ঘরে একটা কাঠের সিন্দুক, বইতে ঠাসাঠাসি। মা মাঝে মাঝে বইগুলিকে বার করে উঠোনে রোদে শুকোতে দিতেন। এগুলির উপর আমার আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। রোদে বসে বইগুলি নাড়াচাড়া করতাম। এবার যখন মা বইগুলি বার করলেন তখন পুরাণো বন্ধুকে ফিরে পাওয়ার মত মনের আনন্দ নিয়ে সেগুলির উপর ঝুঁকে পড়ি। নামগুলি পড়ে যাই, পাতার পর পাতা উল্টে চলি। বুঝি আর না বুঝি তা থেকে কল্পনার খোরাক সংগ্রহ করি। নানা ধরনের বই। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ভাগবত ইত্যাদি থেকে শুরু করে তৎকালীন খ্যাতনামা লেখকদের

গ্রন্থাবলী। হঠাৎ একদিন দেখি মা কয়েকখানা বই বেছে নিয়ে গোপনে রান্নাঘরে ঢুকেছেন সেগুলি পুড়িয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে। দুটি বইয়ের নাম মনে অছে। যোগেন্দ্র নাথ গুপ্তের লেখা "ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনচরিত" এবং রজনী গুপ্তের লেখা "সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস"। বই পোড়ানো হচ্ছে কেন মাকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন যে, কলকাতায় কোন এক ষড়যন্ত্রের মামলায় মাথাভাঙ্গা স্কুলের হেডমাস্টার মশায়ের এক ছেলে ধরা পড়েছে। কলকাতার পুলিশ এসে রাজ্যে পুলিশের সহযোগিতায় হেডমাস্টার মশায়ের বাড়িখানা তল্লাসী করছে। ঐ যুবকটি ছিলেন ছোড়দার বন্ধু। সুতরাং সেই সুবাদে আমাদের বাড়িতেও খানাতল্লাসী হতে পারে আশঙ্কায় এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। বইগুলি নিষিদ্ধ না হলেও পুলিশের চোখে রাজদ্রোহাত্মক বলে গণ্য হত।

কিসের ষড়যন্ত্র? কেনই বা ছোড়দার বন্ধু তার সঙ্গে জড়িত হল? কি করতে চায় তারা? মাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করি। উত্তরে তিনি শোনান অগ্নিযুগের নানা কাহিনী। সেই ছবিটি আজও আমার স্মৃতির পটে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। ঘরের বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। মা উনুনের কাছে বসে বইয়ের পাতার পর পাতা ছিঁড়ে আগুনে নিক্ষেপ করছেন আর গল্প বলে চলেছেন। আগুনের আভা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর মুখে। বলার ভঙ্গীতে আবেগ ফুটে উঠেছে। অধীর আগ্রহে শুনি নতুন রূপকথা। রূপকথার মতই রহস্যময় রোমাঞ্চকর সেইসব কাহিনীর নায়ক বীর তরুণেরা আমার কল্পনায় জীবন্ত হয়ে যেন পাশে এসে দাঁড়ায়। স্পষ্ট করে বুঝি বা না বুঝি, তারা আমার কাছে হয়ে দাঁড়ায় এক নতুন মহত্তর জীবনের প্রতীক।

আমরা সেবার মাথাভাঙ্গতে থাকার সময়েই চারণ কবি মুকুন্দ দাস তাঁর স্বদেশী যাত্রার দল নিয়ে সেখানে আসেন। পর পর কয়কদিন ধরে পালাগান শুনি। নতুন ধরণের যাত্রাভিনয়, সাজপোষাকের জাঁকজমক নেই, নাচগানের নামগন্ধ নেই। নেই যুদ্ধবিগ্রহ। তবু তা মনে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার জোয়ার এনে দেয়। মুকুন্দ দাস একই সঙ্গে বিদেশী শাসকের এবং সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী বজ্রকণ্ঠে প্রচার করেন। অত্যাচারী জমিদার, ভণ্ড সমাজপতি, সুদখোর মহাজন এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট সবাইকে হুঁশিয়ারী দিয়ে মেঘমন্দ্র স্বরে গান ধরেন "সাবধান! সাবধান! আসিছে নামিয়া ন্যায়েরই দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান।"

কোচবিহার রাজ্যের শাসন সেই সময় পর্যন্ত চলেছে অনেকটা benevolent despotism-এর ধরনে। রাজা-প্রজার সম্পর্ক খুব তিক্ত হয়ে ওঠেনি। ব্রিটিশ-মুকুটের প্রতি আনুগত্যও অত্যন্ত উৎকট নয়। তাই মুকুন্দ দাসের "সাথী" পালাটির অভিনয় হয় স্বয়ং মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণের উপস্থিতিতে। মহারাজা তখন বার্ষিক পরিদর্শনে এসেছেন। বড়দের মুখে শুনি যে, ব্রিটিশ-ভারতে "সাথী" পালাটির কয়েকটি অংশ বাদ দিয়ে অভিনয় করতে হত নতুবা কর্তৃপক্ষের অনুমতি মিলত না। এখানে এতটুকু বাদ না দিয়ে পালাটি অভিনীত হয়। শেষের দিকে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের ইঙ্গিত দেওয়া হয় প্রায় খোলাখুলিভাবে।

এমনি ভাবে মনে স্বাদেশিকতার যে প্রেরণা অঙ্কুরিত হয় তাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "মেবার পতন" নাটকটির অভিনয়। মাথাভাঙ্গা থাকাকালেই সেখানকার তরুণদের সৌখীন থিয়েটার ক্লাবের উদ্যোগে নাটকটি অভিনীত হয়। ঐ বইটি ত সে সময়ে ছিল স্বাদেশিকতার একটি জ্বলন্ত প্রতীক। নাটকের ঐতিহাসিক কাহিনী ছিল শুধু উপলক্ষ্য বা আবরণ মাত্র। কার্যত তা দর্শকদের হৃদয়ে স্বাধীনতার প্রেরণাকে দুর্বার করে তুলত।

মাথাভাঙ্গা থেকে ফিরতে হয়। ছোড়দার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। শৈশব স্মৃতি বিজড়িত মাথাভাঙ্গাকে এবার পেয়েছিলাম নতুন ভাবে, তাই ছেড়ে আসার সময় বিয়োগব্যথায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। শিলিগুড়িতে ফিরে আসি নতুন দৃষ্টি নিয়ে। চিন্তায় দেশপ্রেমের রং পাকা হয়েই লেগেছে। এবার বড়দার মধ্যে অন্য এক ধরণের দোটানার অস্তিত্ব আবিষ্কার করি। বুঝতে পারি যে, তাঁর মনের গভীরেও রয়েছে দেশপ্রেমের ফল্গুধারা। মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের সংবাদে তাঁকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হতে দেখি। অসুস্থ দেশবন্ধু দার্জিলিং যাবেন শুনে সে-দিনটিতে ছোটলাইনের ট্রেন যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকে বাসার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। চলন্ত ট্রেনের কামরার জানালার ধারে দেশবন্ধুকে দেখতে পেয়ে করজোড়ে নমস্কার করেন। তাঁর প্রতি-নমস্কারে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন অথচ প্রকাশ্যে স্বাদেশিকতার প্রতি সহানুভূতির সামান্য নিদর্শন দেখাতেও ভয় পান। ছোড়দা যাতে সক্রিয়ভাবে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়েন সেজন্য কড়া হাতে রাশ টেনে ধরেন। আবার ছোড়দাকেও দোটানায় পড়ে পিছু হঠে আসতে দেখেছি। আন্দোলনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও ঝাঁপিয়ে পড়তে [illegible] দাঁড়ান।

বড়ভাইদের এই দোটানা আমার পথেও বহু বাধা সৃষ্টি করেছে। এক পা এগোতে গেলে নানা দিক থেকে কত না পিছুটানের মোকাবিলা করতে হয়েছে। বিধিনিষেধ আর অভিভাবকের কঠোর অনুশাসনে চারিদিকে যেন পাঁচিল তুলে রেখেছে। এদিকে অন্তরে জমার ঘর যতই একটু একটু ভরে উঠতে শুরু করেছে ততই কর্মের তাগিদ উঠেছে প্রবল হয়ে। প্রকাশের মাধ্যম খুঁজেছে। ভেবেছি গতানুগতিকতার ধারা বেয়ে চলব না, তার বাইরে কিছু খুঁজে নিতে হবে। সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে খেলাধুলা করি কিন্তু তাতে মন ভরে না। 'জেলারদা'র ডাকে আর্তের সেবাব্রতে দীক্ষা হয়েছিল বোধহয় মাথাভাঙ্গা থেকে ফেরার বছর খানেক পরে। কিছুদিনের মধ্যে অনুভব করি একাজের পরিধিও বড় সীমিত। সঙ্গী দু'এক জনের বেশি পাওয়া যায় না। অভিভাবকের তরফ থেকে প্রবল বাধা আসে। মুষ্টিভিক্ষার থলি কাঁধে বাড়ি বাড়ি থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করি দেখে শহরের অন্য ভদ্রলোকেরা বিদ্রূপ করেন। তাতে বড়দার সম্মানবোধে আঘাত লাগে। আর্তের সেবাই বা এই ভাবে কতটুকু করতে পারি ?

সব চেয়ে বড় কথা, মনের খোরাক কতটুকু পাওয়া যায় এই কাজে ! তাই অন্য কিছুর সন্ধান করি। একটা নতুন কাজ খুঁজে বার করি। সেটা হল নাটক লেখার ও সমবয়সী ছেলেদের নিয়ে নিজের লেখা নাটক অভিনয় করার নেশা। স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যোগ নিতাম। ইংরাজী কবিতা আবৃত্তিতে বার দুই প্রথম পুরস্কার লাভ করেছি। নাটকের দিকে ঝোঁকটা গিয়েছিল প্রধানত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রভাবে। মাথাভাঙ্গায় ডি, এল, রায়ের 'মেবার পতন' দেখার পর কখন যে তাঁর ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম, তা নিজেই টের পাই নি। শিলিগুড়িতে ফিরে মিত্র সম্মিলনী মঞ্চে দ্বিজেন্দ্রলালের আরো কয়েকটি নাটক অভিনীত হতে দেখি। মনে মনে দ্বিজেন্দ্রলালকে গুরুপদে বরণ করে তাঁরই অনুকরণে নাটক লেখার কাজে হাত দিই। কাঁচা হাত, অপরিণত মন, অপটু অনুকরণ। তবু তার মধ্যেই খুঁজে পাই নতুন সৃষ্টির আনন্দ। শুধু নাটকই নয়, অভিনয়ের দল সৃষ্টি। লাইব্রেরীতে দ্বিজেন্দ্রলালের যতগুলি নাটক পাই সবগুলি পড়ে ফেলি। এক অনাবিষ্কৃত জগতের সিংহদ্বার যেন উন্মুক্ত হয় আমার সামনে। কি কি সম্পদ আহরণ করেছি সেখান থেকে, আজ অঙ্ক কষে তার হিসেব মেলানো সম্ভব নয়। তবে

পেয়েছি অনেক কিছু, যা উত্তরজীবনের পাথেয় হিসাবে কাজ করেছে। পেয়েছি দেশপ্রেমের উদ্দীপনা, সেই সঙ্গে উদার মনুষ্যত্বের আবেদন। নিকটের চরিত্রগুলির ঋজু মেরুদণ্ড, হিমালয়ের মতই অটল বলিষ্ঠ ভাস্বর ব্যক্তিত্ব। ভাষায় বজ্রের নির্ঘোষ আর জলপ্রপাতের গর্জন। তাকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে এক অপূর্ব কাব্যময়তা। মোটের উপর দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি আমাকে চারিপাশের ভীরুতা, ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতার গ্লানিময় পরিবেশের অনেক ঊর্ধ্বে উঠে এক মহিমময় দিগন্তের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিতে সাহায্য করেছে।

এমনিভাবে হৃদয়ের মণিকোঠায় অনেক দিন ধরে সঞ্চিত হচ্ছিল বহু বিচিত্র উপাদান। ছোটবড় কত ঘটনার সঙ্গে কত বিচিত্র অনুভূতি স্মৃতির পটে হয়ত বা এলোপাথাড়িভাবে অঙ্কিত হয়ে গেছে। কখন যে সেগুলি একত্রে মিলে-মিশে একটি বিশেষ দিক অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে, দানা বেঁধে উঠেছে একটি বিশেষ রূপ নিয়ে তা টের পাই নি। উত্তরকালে তাই আমাকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে দিয়েছে, একটি বিশেষ চরিত্র দান করেছে আমার বিপ্লব সাধনাকে। সে পথে অগ্রগতি সহজ সরল রেখায় এগিয়ে চলে নি। ঐ শহরে যদি কোন গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির অস্তিত্ব থাকত তাহলে সম্ভবত সব কিছু ভাল করে বোঝার আগেই তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তাম। যেহেতু তা ছিল না তাই দেরি হয়েছে। গুপ্ত বিপ্লবীদলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে আরো কয়েক বছর পরে। তবে এই বিলম্বের দৌলতে হয়ত খানিকটা সুফল লাভ করেছি। পথ হাতড়ে চলতে চলতে বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে ক্রমে নিজের পায়ে দাঁড়াতে অভ্যস্ত হয়েছি। মনে জেগেছে অনিবার্য জিজ্ঞাসা। যাচাই না করে নিছক ঝোঁকের বশে কোনো পথে পা বাড়াব না বলে সঙ্কল্প করেছি।

দিন কেটে চলে। নাটকের দলে ভাঙন ধরে নানা কারণে। ফলে ওদিকটা থেকে মন সরে আসে। সুখের বিষয় যে, ঠিক এই সময়টাতে একজন মনের মতন সঙ্গী জুটে যায়। তার নাম শশাঙ্ক। শশাঙ্ক সবে এখানে এসে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। তার মামা ছিলেন আমাদের গৃহচিকিৎসক, শুধু আমাদেরই নয়, মহানন্দাপাড়ার অনেক পরিবারের চিকিৎসক। বলিষ্ঠ চেহারা এবং অত্যন্ত রাগী মেজাজের এই প্রবীণ চিকিৎসকটিকে রোগীরা অত্যন্ত ভয় করত। আমাদের বয়সের ছেলেদের কাছে ত তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ যম। তরাইয়ের ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তেতো ওষুধগুলি বিনা ওজর-আপত্তিতে গলাধঃকরণ করেছি শুধু

হেমন্ত ডাক্তারকে ডাকা হবে শুনে। শশাঙ্কর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় ডাক্তার-বাবুর বাসাতেই। তারপর ধীরে ধীরে পরস্পরের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠি। তার মধ্যেও ছিল অন্তর্মুখীনতা আর বই পড়ার নেশা। আমরা দুজনেই ছিলাম দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভক্ত। হয়ত সেটাই যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেছে। দুজনে মিলে অনেক নতুন নতুন বই পড়ে ফেলি। স্কুল লাইব্রেরী থেকে নিয়ে পড়ি যোগীন্দ্রনাথ সরকারের দুটি কাব্যগ্রন্থ 'শিবাজী'ও 'পৃথ্বীরাজ'। ঠিক কোন বইটিতে মনে নেই, প্রচ্ছদে ভারতবর্ষের মানচিত্রকে দেখানো হয়েছিল ভারত জননীর মূর্তি রূপে। কোন শিল্পী যেন তাঁর অন্তরের সমস্ত আবেগ ঢেলে "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ" গানটির প্রাণবস্তুকে রং ও তুলির সাহায্যে একেবারে জীবন্ত করে তুলেছেন। কিশোর মনের রোম্যান্টিক কল্পনায় দেশমাতৃকার সেই প্রতিমূর্তি এক অপূর্ব অনুভূতির আলোড়ন তোলে। কে তিনি—ভাল করে জানি না, বুঝি না। শুধু জানি, মায়ের মুখে শোনা কাহিনীর মৃত্যুঞ্জয়ী ছেলেরা তাঁরই জন্য নিজেদের আহুতি দিয়ে গিয়েছে। মানবী মায়ের চেয়েও গরিয়সী সেই মায়েরই ডাক শুনেছি চারণ কবি মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে। কখনও দেশজননীর কথা ভাবতে ভাবতে একটি ছবি মনের সামনে ভেসে ওঠে। হাটের দিন। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। তরকারির ঝুড়ি মাথায় একটি আধাবয়সী চাষী মেয়ে ভিজতে ভিজতে চলেছে। সঙ্গে নেংটিপরা সাতআট বছরের ছেলে। মা নিজের ছেঁড়া আঁচল দিয়ে ছেলেকে বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে। আমাদের দেশে পথেঘাটে হামেশাই এমনটা দেখা যায়। তবু সেই কবে দেখা ছবিটি দেশমাতৃকার কল্পনার সঙ্গে মিশে বেয়ে আমার মনে এক-এক সময় বিষাদের করুণ মূর্চ্ছনা জাগায়। নতুন করে সঙ্কল্প নিই যে, দুঃখী মানুষের চোখের জল মোছাবার কাজে আত্মনিয়োগ করব। হয়ত এর পিছনে ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার প্রভাব কাজ করেছে। মায়েদের সম্বন্ধে আমার মন অত্যন্ত কোমল। পিতৃস্নেহ কি তা ভালভাবে বোঝার আগেই বাবাকে হারিয়েছি। তাই মাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরি। ভয় হয় বুঝি তিনি চোখের আড়ালে গেলেই তাঁকে হারাতে হবে। ছেলেদের উপরে মায়ের অত্যন্ত অসহায় নির্ভরশীলতা চোখে দেখি। শুনি অনাদরে দুঃখে অভিমানে তাঁর ভাষাহীন চাপা দীর্ঘশ্বাস। নিজের মায়ের বেদনার মধ্য দিয়েই যেন ব্যথিত মানবতার বোবা কান্নার কথাটা

সহজে উপলব্ধি করতে পারি। আবার এক-এক সময় অন্যরকম অনুভূতিতে অন্তর উদ্বেল হয়ে ওঠে। মন যখন প্রফুল্ল থাকে তখন কোন কোন দিন হয়ত বসন্তের অপরাহ্নে কোকিলের কূজন শুনতে শুনতে অন্তর এক অব্যক্ত আবেগে ভরে ওঠে। ভাবি আমি ভালবাসি এই মাঠ, ঐ নদী আর উত্তরে ঐ হিমালয়ের পটভূমিকে। ভালবাসি তরাইয়ের তরঙ্গিত বন-প্রান্তরকে এবং তার বুকের উপরের নানা ধরনের মানুষগুলিকে।

শশাঙ্কর মনও খানিকটা কল্পনাপ্রিয় ছিল। বইয়ে পড়া ঘটনার উপরে কল্পনার রং বুলিয়ে দিবাস্বপ্নের জাল সৃষ্টি করতে সেও ভালবাসত। সে কোথা থেকে সংগ্রহ করে আনে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'। তার কিছুদিন আগে 'দেবী চৌধুরাণী' বইটি পড়ে ফেলেছি। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসটির নায়ক-নায়িকাদের ঘরের কাছের মানুষ বলে মনে হত। বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল ত শুরু হয়েছে শিভোক রোড ধরে কিছুদূর এগিয়ে গেলে দক্ষিণ দিকে। খরস্রোতা তিস্তা প্রবাহিতা ঐ বনেরই ওপার দিয়ে। আর দেবীর পাইক-বরকন্দাজেরা ত রাজবংশী চাষীদেরই পূর্বপুরুষ। তাই 'আনন্দ মঠ' বইটির কাহিনীকেও সহজেই পরিচিত পরিবেশে কল্পনা করে নিই। ভাবি যে 'পদচিহ্ন' গ্রামটি ছিল বুঝি বনের ঠিক ওপারে, আর বনের মধ্যেই ছিল মাতৃমুক্তিব্রতী সন্ন্যাসীদের গোপন কর্মকেন্দ্র। শশাঙ্ক আর আমি যখন তরাইয়ের বুকে ঘুরে বেড়াই, তখন দুজনে কল্পনার রাশ ছেড়ে দিই। কোন শীতের দুপুরে চলে যাই সুকনা ফরেস্টের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের দিকে। পিচ-বাঁধানো হিলকার্ট রোড় ধীরে ধীরে উপরে উঠেছে। বাঁ-পাশে শালবনে ঢাকা টিলাটি সমতলের সঙ্গে পাহাড়ে সীমানা নির্দেশ করে। কার্টরোডেরই একপাশ ধরে দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথ এগিয়ে চলেছে সর্পিল গতিতে। দুধারে ঘন বন ঝিল্লীরবে মুখরিত। বনের গহন ভেদ করে দৃষ্টি বেশি দূর এগোতে পারে না। আঁকাবাঁকা বন্ধুর পথে মাইল দুয়েক অগ্রসর হওয়ার পর মোড় ঘুরে হঠাৎ দেখা যায় যে, পাহাড়ের বেশ কিছুটা উপরে উঠে এসেছি। একপাশে পাহাড়ের চূড়া আকাশের দিকে মাথা তুলেছে, অন্যপাশে গভীর বনে ঢাকা খাদ। সামনের দিকে মিঠাইডারার ঠিক ওপারে তিনধারিয়া পাহাড়ের চূড়ায় সাদা মেঘের দল জমতে শুরু করেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে দূরে তিস্তা উপত্যকার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কল্পনায় সামনে এসে দাঁড়ান যেন অরণ্যচারী গুরুগোবিন্দ। সত্যের সন্ধানের জন্য তিনি

বার বৎসর বনবাস বেছে নিয়েছিলেন। তার পর সত্যের পরশমণির ছোঁয়া পেয়ে ফিরে এসে শিখদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন নবজীবনের অমোঘ মন্ত্র। কবিগুরু যে মন্ত্রকে অনবদ্য রূপ দিয়ে লিখেছেন "লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ। জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন"। আসেন ছত্রপতি শিবাজী। তাঁরও ছেলেবেলা কেটেছে এমনি পাহাড়ে-জঙ্গলে এবং গোর্খাদেরই মত কঠিন পরিশ্রমী মাওয়ালীদের মধ্যে। সমতলের দিকে যখন ফেরা শুরু করি ততক্ষণে সূর্য অস্তাচলের দিকে হেলে পড়েছে। ফিরতি পথে যেন সঙ্গী হন 'আনন্দমঠে'র সেই সন্তানবীরের দল। পাহাড়কে পিছনে ফেলে সুকনা স্টেশন ছাড়িয়ে যখন এগিয়ে এসেছি ততক্ষণে মাথার উপরে চাঁদ উঠেছে। বনের পর দুপাশে অবারিত মাঠ। দূরে অরণ্যের রহস্যলোক। শুভ্রজোৎস্না-পুলকিত যামিনী। নির্জন পথে শশাঙ্ক গান ধরে "বন্দেমাতরম"। সমস্ত শরীর এবং অনুভূতি জুড়ে নামে এক বিচিত্র শিহরণের বন্যা।

বিদেশী শাসনের অর্থনৈতিক শোষণের চরিত্র সম্বন্ধে জেনেছি ও বুঝেছি আরো কয়েক বৎসর পরে। যে সময়ের কথা এখন লিখছি, তখন এইটুকু বুঝেছি যে, পরাধীনতা আমাদের অগ্রগতির পথকে সব দিক দিয়ে রুদ্ধ করে রেখেছে। হয়ত সে উপলব্ধিও খুব স্পষ্ট ছিল না। স্পষ্ট ছিল না দেশের অনেকেরই কাছে। আপাতদৃষ্টিতে দেশপ্রেমে হৃদয়াবেগের প্রাবল্যই চোখে পড়ত। কিশোর হৃদয়ের পক্ষে একথা আরো সত্য। তবু সেই হৃদয়াবেগের পিছনে ছিল বহু উপাদান, স্পষ্ট করে বোঝা এবং না-বোঝা অনেক উপলব্ধির অবদান। বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে তারই বন্যামুখ খুলে যেয়ে আন্দোলনের এক একটা জোয়ার আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষকে প্লাবিত করেছে। কখনও সারা দেশ উদ্বেল হয়ে উঠেছে কোন বৃহৎ ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। আবার কখনও সীমিত স্থানীয় পরিধির ভিতর ছোট্ট কোন ঘটনা ক্ষণিকের জন্য হলেও সেখানকার মানুষের মনকে উত্তেজিত করে তুলেছে। উত্তেজনা হঠাৎ দেখা দিয়ে হয়ত হঠাৎ-ই মিলিয়ে গিয়েছে। তবে মানুষের মনের গভীরে রেখে গেছে স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন। এই সব ছোট ছোট ঘটনার তাৎপর্যই বা কম কিসে! বিন্দু বিন্দু মিলেই ত তরঙ্গের সৃষ্টি। ইংরাজ রাজপুরুষ বা গোরা সৈনিকের হাতে কালা আদমির লাঞ্ছনার ব্যাপার ত তখন হামেশাই ঘটত। সেগুলি দেশের মানুষের আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত করে তাদের মনে অজানতে

বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত করে তুলেছে। ঐসব ঘটনা সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আমরা নিজবাস ভূমে পরবাসী। দাসত্বের অদৃশ্য শৃঙ্খল এখানকার ছোট-বড় সকলেরই গলায় জড়িয়ে রয়েছে। এমন একটি ঘটনা ঐ সময়ে শিলিগুড়ির মানুষগুলিকে যুগপৎ বিক্ষুব্ধ এবং আনন্দিত করে তোলে। বিক্ষোভের কারণ—বিদেশীর হাতে দেশের একজন মানুষের লাঞ্ছনা। আনন্দের কারণ—লাঞ্ছিত মানুষটি রুখে দাঁড়িয়ে উপযুক্ত পাল্টা জবাব দিয়েছে।

তরাইয়ের কোন একটি চা-বাগানের সাহেব ম্যানেজারের ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বাগানের নামটি এতদিন পরে ঠিক মনে পড়ে না। সাহেবের হাতে শুধু কুলিদেরই নয়, বাগানের কেরানী, বড়বাবু, ডাক্তার সবাইকে দৈনন্দিন নিদারুণ অপমান সইতে হত। মুখ বুঁজে নিরুপায়ে সহ্য করে যেত সকলে। কিন্তু একদিন ব্যতিক্রম ঘটে গেল। সাহেবের সঙ্গে বাঙ্গালী ডাক্তারবাবুর বচসা হতে হতে ইংরাজনন্দন ডাক্তারবাবুকে এমন একটি অশ্রাব্য গালি দিয়ে বসে যা হজম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনিও উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিলেন। রাজার জাত কালা আদমির মুখে কটূক্তি সহ্য করতে না পেরে ডাক্তারবাবুর গায়ে হাত তোলে। ডাক্তারবাবুও টেবিলের উপর থেকে কাঠের রুল তুলে নিয়ে প্রহারে-প্রহারে সাহেবকে আধমরা করে ছেড়ে দেন। আমরা ঘটনাটির কথা জানতে পারি যখন মহকুমা কোর্টে ডাক্তারবাবুর বিরুদ্ধে মামলার শুনানি শুরু হয়। তাঁর কি সাজা হয়েছিল মনে নেই। এইটুকু মনে আছে যে, সেই বলিষ্ঠদেহ বাঙ্গালী ভদ্রলোক সেদিন শহরের সবার চোখে বীরের মর্যাদা লাভ করেন। যারা কোর্টে উপস্থিত ছিল তাদের মুখে গল্প শুনি যে, সাহেব হাকিমের সামনে নিজের গায়ের জামা খুলে দেখিয়েছে, কি ভাবে মারের চোটে পিঠে কালশিরা পড়ে গিয়েছে। এই দৃশ্যকে উপস্থিত সবাই খুব উপভোগ করে।

বুঝি যে জাতীয় অবমাননা সবারই মনে গ্লানি আর বেদনাবোধের জন্ম দেয়। বেশির ভাগ মানুষের প্রতিবাদ করার সাহস হয় না, কিন্তু যদি কেউ সেই অবমাননার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তখন তাকে শ্রদ্ধার অর্ঘ দিতেও তারা কুণ্ঠিত হয় না। বড়দের মধ্যে যখন এই ধরনের দ্বৈত মনোভাবের টানাপোড়েন চলেছে, তরুণেরা তখন দেশজননীর লাঞ্ছনা মোচনের উপায়ের সন্ধানে অ-যাত্রা পথের পথিক হয়েছে। বড়দের আসরে মাঝে মাঝে সেই সব দুঃসাহসী ছেলেদের

প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তাঁরা বলেন যে, গুপ্ত বিপ্লবী দলগুলির নাকি এখন আর কোন অস্তিত্ব নেই। যারা অগ্নিযুগে বহ্ন্যুৎসবে মেতেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখন আধ্যাত্মিকতার সাধনায় নিযুক্ত হয়েছেন, কেউ বেছে নিয়েছেন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পথ। আবার কেউ হয়ত শান্ত সংস্কারযাত্রার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এক-এক সময় আকুল হয়ে ভাবি তবে কি আবার কখনও সেই সব ঘরছাড়া মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের দেখা মিলবে না? আর কোনদিন কি তারা গোপন অন্তরাল থেকে বার হয়ে এসে নিজেদের হৃৎপিণ্ডের রক্তে হোলিখেলার অনুষ্ঠানে দেশবাসীকে সচকিত করে দেবে না? ঠিক এমনি সময়ে আকস্মিকভাবে কলকাতার বুকে বিপ্লবীদের কয়েকটি কার্যকলাপ যেন বিদ্যুৎ চমকের মত তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ ঘোষণা করে গেল। গোপীনাথ সাহার হাতে পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ট ভ্রমে মিঃ ডে নামক একজন ইংরাজ হত্যা, শাঁখারিটোলা পোস্টঅফিস ডাকাতি ইত্যাদিকে উপলক্ষ্য করে বাংলার তরুণ সমাজের উপর আবার নেমে এল ব্রিটিশ দমননীতির খড়্গ। পুরাতন ও নতুন বিপ্লবী নেতাদের অনেকেই রেগুলেশান থ্রী এবং বেঙ্গল অর্ডিনান্সের জালে বন্দী হলেন। বন্দী হলেন সুভাষচন্দ্র। আমাদের পাশের শহর জলপাইগুড়ি থেকেও একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী বেঙ্গল অর্ডিনান্সের শিকার হলেন। দমননীতির প্রতিবাদে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সিংহগর্জনের প্রতিধ্বনি আমাদের ঐ অঞ্চলেও গিয়ে পৌঁছায়। আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠি। তাহলে সেই অগ্নি-উৎস নির্বাপিত হয় নি। একদিন তার সন্ধান নিশ্চয়ই পাব।

মানুষের জীবন এগিয়ে চলে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। শুধু বাইরেই নয়, মনের জগতেও। যারা সচেতনভাবে এক বৃহত্তর মহত্তর জীবনের পথ বেছে নিতে চায় তাদের বেলায় বোধ হয় মনের জগতে সংঘাত হয় অনুক্ষণের সাথী। সেই ছোটবেলা থেকে আমার জীবনেও তাই ঘটেছে বারে বারে। হয়ত এমনিভাবে আঘাতের পর আঘাত এসে আমার মনকে ভবিষ্যতের বহু কঠিন অগ্নিপরীক্ষার জন্য তৈরী করে দিয়েছে। তাই বুঝি প্রিয় সঙ্গীর সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই তীব্র মতান্তর শুরু হয়। শশাঙ্ক কিছুটা কল্পনাপ্রবণ হলেও অন্তর্মুখীন নয়। আমার অন্তর্মুখীনতায় তখন পর্যন্ত অধ্যাত্মবাদের প্রভাব বেশি হলেও তা কর্মেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অন্তরলোককে ভরে তুলতে চাই নানা বিচিত্র সম্পদে। শুধুমাত্র চোখেদেখা বা কানেশোনা ঘটনার উপর-উপর

অভিজ্ঞতাটাই আমার কাছে যথেষ্ট নয়। সবকিছুকে একান্তভাবে উপলব্ধি করতে চাই মনের গভীরে। তবেই ত আমার চিন্তা ও কর্মে একটা ঐকতান স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধ্বনিত হবে। বন্ধুকে যখন আমার মনের সেই পাওয়ার ভাগ দিতে চাই সে তার মূল্য বোঝে না, অন্তর্মুখীনতাকে উপহাস করে। দ্বন্দ্ব বেড়ে উঠে বিশেষভাবে দুটি জিনিসকে কেন্দ্র করে।

সেই সময়ে হিন্দু মিশনের একদল সন্ন্যাসী মিশনের জন্য অর্থসংগ্রহে উত্তরবঙ্গ পরিক্রমায় বার হয়েছিলেন। শিলিগুড়িতে এসে প্রথমটা তাঁরা আমাদের বাড়িতে অতিথি হন। তাঁদের পথপরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে থাকত পার্থসারথিরূপে শ্রীকৃষ্ণের একটি বেশ বড় ছবি। ঐ ছবিটি ছোট ছোট সাইজে তাঁরা বিক্রি করতেন। পরে শুনেছি যে, ছবিটি তখন খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সেটি ছিল আমাদের অত্যন্ত পরিচিত ননীগোপাল বা বংশীবাদনরত কৃষ্ণের বদলে শঙ্খচক্রধারী বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তি। ছবির নীচে লেখা রয়েছে "অবনত ভারত চাহে তোমারে, এস সুদর্শনধারী মুরারী"। দেবতা নয়, এ যেন সেই মানুষ শ্রীকৃষ্ণ যিনি ভারতের সুদূর অতীত ইতিহাসের এক মহাযুগসন্ধিক্ষণে মহানায়কের ভূমিকা নিয়েছিলেন। কৃষ্ণের যে কল্পনা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙ্গালীর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা থেকে এটি একটি বিরাট ব্যতিক্রম। প্রেম বিরহ অশ্রুজল মান অভিমানের পালার নায়ক কৃষ্ণের যে ধারণা বাঙ্গালী চিত্তকে কোমল-করুণ রসের প্রাবল্যে দুর্বল এবং মোহনিদ্রায় অভিভূত করে রেখেছিল এই ছবিটি যেন তার মায়াজালকে ছিন্নভিন্ন করে রণক্ষেত্রের আহ্বানকে ধ্বনিত করে তুলেছে। যে যুগে মানুষের মন ধর্মের প্রভাবে অসাড় থাকে, সেই যুগে তাদের ঘুম ভাঙ্গাতে ত সব দেশেই নতুন সংগ্রামী চেতনা প্রথম প্রথম ধর্মীয় ধ্যানধারণার আবরণে আত্মপ্রকাশ করেছে। আরো অনেকের মতন আমিও সেদিন সুদর্শনধারীর সেই মূর্তিকে নবযুগ-চেতনার প্রতীক হিসাবেই নিয়েছিলাম। সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে একটি ছবি সংগ্রহ করে শোবার ঘরের কাঠের বেড়ায় টাঙিয়ে রাখি। সন্ধ্যায় রুদ্ধদ্বার নির্জন কক্ষে ধ্যাননেত্রের সামনে সেই মূর্তিকে জীবন্ত করে তুলতে চেষ্টা করি। পার্থসারথি এবার স্বাধীনতা-সংগ্রামের সারথি। সমগ্র অনুভূতি জুড়ে অপূর্ব শিহরণ জাগে, ঠিক যেমনটি হয়েছিল সুকনার বনপথে শশাঙ্কর কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' গানটি শুনে। কিন্তু শশাঙ্ককে যখন একথা বলি সে বিদ্রূপের কশাঘাত হানে।

শশাঙ্ক যদি ধর্মীয় ধ্যানধারণার বিরোধী হত তাহলে সম্ভবত আঘাতকে সয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু সে সমস্ত সংস্কার, বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানকে মেনে চলে। তার মধ্যে গভীরতার অভাবটিই আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে আর আগের মতন বন্ধুর সামনে মনের কপাট উন্মুক্ত করে দিতে ইচ্ছা হয় না। তখনই বিচ্ছেদ ঘটে না বটে, তবে বিরোধ আর দ্বন্দ্ব দিনের পর দিন বেড়ে চলে। সংঘাত বাধে আরো একটি কারণে। আমি বলি যদি কোনদিন গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির সন্ধান পাই তবে তাতে যোগ দেব। শশাঙ্ক বিপ্লবী আন্দোলন দূরে থাকুক, সক্রিয়ভাবে কোনরকম রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত হতে অনিচ্ছুক। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে অবসর সময়ে রোম্যান্টিক সহানুভূতি জানানো—এর চেয়ে বেশি কিছু করার কথা ভাবে না। তার দেশসেবার ধারণা সমাজ-সেবার গণ্ডীর মধ্যেই সীমিত।

আবার নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করি। নাটকের দল আগেই ভেঙ্গে গেছে। সহপাঠি বা সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধূলা আর কচিৎ কখনও আড্ডা দেওয়ার বেশি আর কিছু পাই না। ওদের চিন্তার পরিধি বড় সংকীর্ণ, আলগা, হাল্কা, অসংলগ্ন। তার উপরে তাদের কথাবার্তায় একটুতেই এসে পড়ে কিশোর মনের সদ্য উন্মেষিত যৌনচেতনার অভিব্যক্তি। আসন্ন যৌবনের ইশারা আমার মনকেও যে মাঝে মাঝে উতলা করে তোলে না তা নয়। তবে ওদের কথাবার্তাকে মনে হয় বড় স্থুল, উলঙ্গ, অশালীন। অধ্যাত্মবাদ এবং স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশের প্রভাবে ব্রহ্মচর্যের ধারণাটা আমার মনে দৃঢ়মূল বিস্তার করেছিল। ব্রহ্মচারী হতে হবে বলিষ্ঠ দেহ আর সংযত মন অর্জনের জন্য। আর যে পথের পথিক হব বলে নিজেকে গড়ে তুলতে চাই সেখানে ত ব্যক্তিগত কামনাবাসনার স্থান নেই। সেইসব নিয়ে মাথাঘামাবার অবকাশই বা কোথায়—সেই ঝড়বাদলের আশীর্বাদধন্য দুর্গম যাত্রাপথে! আনন্দমঠের ভবানন্দ ত ব্রত থেকে স্খলনের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল যুদ্ধক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে।

সৌভাগ্যের বিষয় মনের নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে ওঠার একটা উপায়ের হদিস পেয়ে যাই কিছু দিনের মধ্যেই। স্কুলে ত ভাল ছাত্রই ছিলাম। লাইব্রেরী থেকে গল্পের বই এনে পড়ার অভ্যাসও ছিল। ততদিনে উপরের ক্লাসে উঠেছি। ইংরাজী ভাষায় কিছুটা পারদর্শিতা অর্জন করেছি। শিক্ষকদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে সাহায্য করেন। মণি

ভৌমিক ছিলেন ইংরাজীর শিক্ষক। বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারার মানুষটিকে অধ্যাপক হলেই মানাত ভাল। সাহিত্যের প্রতি তাঁর নিজের বিশেষ অনুরাগ ছিল। ঘটনাচক্রে জীবিকার তাগিদে এমন এক পরিবেশে এসে পড়েছেন যেখানে সাহিত্যপ্রেম বা শিক্ষার বিশেষ মর্যাদা নেই। সুযোগও নেই সাহিত্য-চর্চার। অর্থই যেখানে একচ্ছত্র অধিপতি সেখানে বাণীর সাধনাকে অক্ষুণ্ণ রাখার সুবিধাই বা কোথায় আর অনুকূল আবহাওয়াই বা কই? তবু তিনি হার মানতে রাজী নন। উপরের শ্রেণীর মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাত্রকে উৎসাহ দিয়ে হাতেলেখা পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। "উষা" নামের সেই পত্রিকার মাধ্যমেই আমার সাহিত্যিক হিসাবে হাতখড়ি। মাস্টারমশায় নিজে লেখেন এবং আমাদেরও প্রেরণা দিয়ে, তাগিদ দিয়ে, হাতে ধরে লিখতে শেখান। স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে যে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হত তাতে তিনিই ছিলেন শিক্ষাদাতা। ইংরাজী কবিতা আবৃত্তি করতে তিনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন। এবার তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার বাইরে যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার রয়েছে, বিশেষ করে ইংরাজী সাহিত্য, তার দিকে সুনির্দিষ্টভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নিজে বই বেছে দিয়েছেন, বলেছেন যে 'সবটা যদি বুঝতে নাও পারো তবু পড়ে যাও, দেখবে চোখের সামনে এক নতুন জগতের দরজা খুলে গেছে।' যদি তাঁর নির্দেশিত কোন বই স্কুল লাইব্রেরীতে না পাওয়া যায় তাহলে নিজে উদ্যোগী হয়ে তরাই পাবলিক লাইব্রেরীতে খোঁজ করে জানিয়েছেন ওখানে পাবে। মাস্টার মশায় ছিলেন ইংরাজ কবি শেলীর ভক্ত। শেলীর 'ওড টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড' কবিতাটি তাঁর খুব প্রিয়। আমাকে দিয়ে একবার আবৃত্তি করিয়েছিলেন। 'উষা'য় কবিতাই লিখতেন বেশি। কখনও কখনও অতি সতর্কতা সত্ত্বেও লেখনীর মুখে দেশপ্রেমের জ্বালা ফুটে বেরোত।

কি কি ইংরাজী বই তখন পড়েছি সবগুলির নাম আজ মনেও নেই। প্রথম শুরু হয়েছিল উত্তরমেরু, দক্ষিণমেরু এবং পর্বত অভিযান সম্বন্ধে লেখা কয়েকটি বই দিয়ে। দুর্গম পথে প্রকৃতির ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে, বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে অভিযানের বিবরণ মনের রোম্যান্টিক ঝোঁকটিকে আরো শক্তিশালী করে তুলেছে। অন্য দুটি বইয়ের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। দুটিই হল কালজয়ী ফরাসী লেখক ভিক্তর হুগোর চিরায়ত উপন্যাসের ইংরাজী

অনুবাদ : 'লা মিজারেবল' এবং 'নাইনটি থ্রী'। লা মিজারেবলের প্রধান চরিত্র জ্যাঁ ভালজ্যাঁ অনায়াসেই আমার মনে চিরস্থায়ী আসন দখল করে নেয়। শোষকের সমাজ তাকে নীচের তলার পঙ্ককুণ্ডে দাবিয়ে রাখতে চায়, আর সেই পীড়নের বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম করে সে মাথা তুলে উঠে দাঁড়ায় মানুষের অপূর্ব মহিমায়। তার চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে দেখতে পাই কিভাবে অতিসাধারণ একটি মানুষ সংগ্রামের আগুনে পুড়ে বিরাট ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে। 'নাইনটি থ্রী'তে পাই ফরাসী বিপ্লবের জীবন্ত আলেখ্য, মহাকাব্যের মতই মহীয়ান। সেখানেও মহাশক্তিধর চরিত্রের দেখা পাই। বিপ্লবী বাহিনীর অধিনায়ক সিমুরদ্যাঁ এবং অন্যদিকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নায়ক কাউণ্ট লাঁতেনা। একজনের মধ্যে বিপ্লব আর অপর জনের মধ্যে প্রতিবিপ্লবের শক্তি যেন মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। কাউন্টের চরিত্রকে পছন্দ না হলেও তার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারি না। যখন তিনি একটি শিশুকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বন্দিত্ব বরণ করেন, তখন সেই মানবিকতার অভিব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানাই। আবার সিমুরদ্যাঁ যখন মানবিকতার প্রতি সম্মান দেখাতে যেয়ে বিপ্লবের সাংঘাতিক শত্রু কাউন্টকে পালাবার সুযোগ করে দেন, সে কাজকে সমর্থন করতে পারি না। তাই সব চেয়ে ভাল লাগে বিপ্লবী বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত সেই পাদ্রী বিচারকের চরিত্রটিকে। সিমুরদ্যাঁ ছিলেন বিচারকের অত্যন্ত স্নেহভাজন, পুত্রতুল্য। কিন্তু তিনি কর্তব্যচ্যুতির গুরুতর অপরাধে সিমুরদ্যাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে কুণ্ঠিত হন না! বিপ্লবীর কাছে ব্যক্তিগত জীবনের স্নেহমমতা দুঃখবেদনার চাইতে কর্তব্যের স্থান অনেক উচ্চে।

উপন্যাস নাটকের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বগুলি বড় ভাল লাগে। যে পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছি তাতে মুখচোরা ভীরু শান্ত সুবোধ ছেলে হয়ে ওঠাটাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। বাইরে থেকে সবাই আমার সম্বন্ধে সেই ধারণাই পোষণ করত। কিন্তু আমি যে নীরবে নিভৃতে নিজেকে ঐসব মহাশক্তিধর ব্যক্তিত্বগুলির ছাঁচে তিল তিল করে গড়ে তোলার সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি সে খবর ত কেউ রাখে নি। আমার আদর্শ চিত্রগুলি ত শুধু বলিষ্ঠতারই প্রতিমূর্তি নয়। তাঁরা হলেন সংযত, শান্ত, মানুষের প্রতি দরদে কোমল অথচ অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ভীষণ রুদ্র।

ভিক্টর হুগোর ঐ দুটি উপন্যাসে নামগোত্রপরিচয়হীন সাধারণ মানুষের

প্রতি সমবেদনার সঙ্গে যে অসীম মর্যাদার পরিচয় পেয়েছি তা আমার মনের বিকাশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। জঁা ভালজঁাকে দেখতে শিখেছি সেই পায়ের তলায় পড়া মানুষগুলির মধ্যে সুপ্ত মহিমা ও বীরত্বের প্রতিনিধি হিসাবে। জঁ ভালজঁার কথা ভাবতে গিয়ে আমার কল্পনায় তার চেহারা যেন লবণ ডাকাতের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি যে, শিলিগুড়ি শহরে যখন কোন না কোন উপলক্ষ্যে আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌঁছেছে তখন ঐসব নামগোত্রহীন মানুষগুলিকেই রাজপথে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। দার্জিলিং-এ অসুস্থ দেশবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার পথে মহাত্মা গান্ধী কয়েক ঘন্টার জন্য শিলিগুড়ি শহরে অবস্থান করেছিলেন। শহরের ভদ্রমানুষেরাও তাঁকে দেখতে গিয়েছেন, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কিন্তু গান্ধীজীর দর্শন লাভের জন্য অন্তরের আকুলতা লক্ষ্য করেছি এইসব সাধারণ মানুষেরই মধ্যে।

গান্ধীজীকে দেখে অবাক বিস্ময়ে ভাবি এই শান্ত ক্ষীণদেহ মৃদুভাষী মানুষটিরই আহ্বানে সারা দেশের অগণিত মানুষ ভয়ডর-দুঃখ-নির্যাতন তুচ্ছ করে প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কি সেই শক্তি যা যাদুমন্ত্রের মত মানুষগুলির হৃদয় জয় করে নিয়েছে, যা মৌন মূঢ় ছায়াভয়চকিতদের শতাব্দীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে টেনে এনেছে সংগ্রামের ময়দানে? শুনেছি যে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর শবযাত্রায় দার্জিলিং থেকে শুরু করে পাহাড়ের সমস্ত স্টেশনে শ্রদ্ধা জানাতে জনতা ভিড় করেছে। আকুল হয়ে কেঁদেছে অনেকে। শিলিগুড়ি স্টেশনেও মানুষের ভিড়ে তিলধারণের ঠাঁই হয় না। সবাই শোকে বিহ্বল, অথচ এদের অনেকেই হয়ত দেশবন্ধুর কথা ভাল করে জানে না। শুধু এইটুকু শুনেছে তারা ; যে এই মানুষটি তাদেরই কল্যাণের জন্য নিজের সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে দুঃখবরণ করেছেন, অবশেষে নিজের প্রাণটুকুকেও বিসর্জন দিয়ে গেলেন। দেশবন্ধু সম্বন্ধে শ্রদ্ধা নিবেদন করে কবিগুরু লিখেছিলেন, "এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান"। এই ছত্র দুটির সঙ্গে যখন পরিচিত হই তখন শিলিগুড়ি স্টেশনের সেই দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। দেশবন্ধু সত্যই যে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জনচিত্তে মিলিয়ে দিয়ে গিয়েছেন সে কথা বুঝতে কষ্ট হয় না।

ততদিনে শশাঙ্কর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ডাক্তারবাবু

মারা যাওয়ায় তাকে এখান থেকে চলেও যেতে হয়েছে। হারাতে হল মণি ভৌমিক মাস্টার মশাইকেও। কি একটা অজুহাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে চাকরি ছেড়ে যেতে বাধ্য করে। আমরা উপরের শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্র এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে বসি। মাস্টারমশায়কে তাড়ানো চলবে না বলার মত সাহস ও শক্তি অবশ্য আমাদের ছিল না। আমাদের বিদ্রোহের অভিব্যক্তি হয় অন্যভাবে। কর্তৃপক্ষের অমত সত্বেও আমরা স্কুলগৃহে সভা করে মাস্টারমশায়কে বিদায় অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। সহকারী প্রধান শিক্ষক তখন অস্থায়ীভাবে প্রধান শিক্ষকের কাজ করছেন। তিনি সভা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। অন্য মাস্টার মশায়দের বেশির ভাগই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। আমরা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের নিদর্শনরূপে মণি ভৌমিককে উপহার দিয়েছিলাম মেরি করেলির লেখা "ইনোসেণ্ট' নামে বইটি। বইটি কেনা হয় স্টেশনের হুইলার বুক স্টল থেকে। বইতে কি আছে পড়ে দেখি নি, শুধু নাম দেখেই নির্বাচন করেছিলাম। আমরা যে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অপবাদে বিশ্বাস করি নি তাই বোঝাতে চেয়েছিলাম ঐ উপহারের মধ্য দিয়ে।

মাস্টারমশায় চলে গেলেন। মনের অনেকখানি কিছুদিন ফাঁকা হয়ে রইল। সুখেনবাবু মারা গিয়েছেন। 'জেলার'দা অন্যত্র গিয়েছেন বদলি হয়ে। কার কাছে মনের কথা খুলে বলব, বিশেষ করে যে নতুন জগতে প্রবেশ করেছি ইংরাজী সাহিত্যের মাধ্যমে, সেখানে কে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে? সৌভাগ্যক্রমে যিনি ইংরাজীর নতুন শিক্ষক হয়ে এলেন তিনিও ছেলেদের কর্মস্পৃহাকে সস্নেহে বিভিন্ন দিকে পথনির্দেশের ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী। সদ্য আইন কলেজের পড়া শেষ করে এসেছেন। উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত শিলিগুড়িতে ওকালতি শুরু করবেন। নিজের ছাত্রজীবনের জের তখন পর্যন্ত কাটেনি। তাই ছাত্রদের সঙ্গে সহজেই মিশে যান। এঁর তত্বাবধানে হাতেলেখা পত্রিকার সঙ্গে আরো কয়েকটি কাজ যুক্ত হল। গরিব ছাত্রদের সাহায্যের জন্য 'পুওর ফাণ্ড' গড়ে তোলা, বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে আবৃত্তি ও অভিনয় ইত্যাদি। 'উষা'কে ছাপার হরফে প্রকাশের একটা ঝোঁক এসেছিল। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে, সেদিনের শিলিগুড়িতে তা আকাশ-কুসুম চয়ন ছাড়া আর কিছু নয়। নতুন মাস্টারমশায়ের স্নেহচ্ছায়ায় বসে শুরু হল কবিগুরুর রচনার সঙ্গে পরিচয়। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি কিশোর মনের উপরে যে দুর্বার

আকর্ষণ বিস্তার করে তা যেন মাস্টারমশায়ের ব্যাখ্যায় আরো প্রবল হয়ে ওঠে। পাহাড়ে বেড়াতে যেয়ে নববর্ষার জলে ফুলে-ফুঁসে-ওঠা পাগলাঝোরার দুর্দান্ত জলপ্রপাত দেখে এসেছি। কবিতাটির মধ্যে বুঝি শুনতে পাই তারই অশান্ত গর্জন। পড়ি 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'অচলায়তন'। 'রক্তকরবী'র রূপক তখন ভাল করে বুঝি না। 'মুক্তধারা'র মধ্যে সব চেয়ে ভাল লাগে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রটি। অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেমন শান্ত সংযত অথচ হিমালয়ের মত অটল হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'অচলায়তন'-এর রূপকটি স্পষ্ট উপলব্ধি করি। মনের সমস্ত জানালাগুলি যেন একসঙ্গে খুলে যায়। হৃৎপিণ্ডে জাগে বিদ্রোহের ডমরুধ্বনি। তা বে-পরোয়া বে-হিসেবী অভিযানের আহ্বান জানিয়ে বলে "দিক হারানো দুঃসাহসের সকল বাঁধন পড়ুক খসে / কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসনসীমা লঙ্ঘনে। অজানাতে করবি গাহন / ঝড় সে হবে পথের বাহন। ওরে আপনারে তুই শেষ করে দে রে / প্রলয় রাতের ক্রন্দনে।'

এমনিভাবে যখন বিঘ্নবিপদভরা জীবনের পথে দুঃসাহসী যাত্রার জন্য মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে তখন একটি যোগাযোগের ফলে সরাসরি বিপ্লববাদে দীক্ষা হল। ১৯২৭ সালের গোড়ার দিকের কথা। সবে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে এসেছি। পরীক্ষার ফল বার হতে কয়েকমাস দেরি আছে। সময়টা কিভাবে কাটানো যাবে তাই নিয়ে ভাবনায় পড়েছি। ঠিক তখনই এক ভদ্রলোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে মধু দত্তর সঙ্গে পরিচয় হল। ছোট্ট শহরে নতুন মুখ, আমাদেরই সমবয়সী। অতএব বন্ধুদের সবারই নজর পড়ে তার উপরে। আলাপ হতে সময় লাগে না। পরিচয় হতে জানি যে, মধু চট্টগ্রামের ছেলে। সেও এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে জ্যাঠামশায়ের কাছে বেড়াতে এসেছে। তার জ্যাঠামশায় তখন ওখানে সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মধুর সঙ্গে মেলামেশায় অভিভাবকদের তরফ থেকে কোন আপত্তি হবার কথা নয়। একে ত ছোট হাকিমের ভাইপো। তার উপর সে ছিল অত্যন্ত শান্ত, স্বল্পভাষী এবং বেশভূষা ও চালচলনে একেবারে নিরাড়ম্বর। আদর্শ ব্রহ্মচারী ছেলে। কাজেই বড়দের প্রশংসাপত্র পেতে তার একটুও দেরি হয় নি। এহেন মানুষটির ভিতরে যে আগুন লুকিয়ে আছে তা বাইরে থেকে কে বুঝবে? তবে আমার কাছে সে সহজেই ধরা দেয়। দুদিনেই তার সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তারপর সে বলে যে, সে চট্টগ্রামের একটি

গুপ্ত বিপ্লবীদলের কর্মী হিসাবে এখানে এসেছে সমিতিরই নির্দেশে। নিমন্ত্রণ বাড়িতে পরিচয় না হলে সে নিজেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নিত। আমি যে স্কুলের সেরা ছাত্র সে খবর সংগ্রহ করেছে এবং তাদের দলে যোগদানের উপযুক্ত বিবেচনা করেই আমার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। যা এতদিন ছিল শুধু বইয়ের পাতায় এবং কল্পলোকের কাহিনীতে তা এবার ধরা-ছোঁয়ার নাগালে এসেছে। তবু তার ডাকে একবারেই সাড়া দিই না। যাচাই করে নিতে চাই। প্রথমে বুঝতে চাই সে খাঁটি কিনা। বড়দের মুখে শুনে-ছিলাম যে, পুলিশের গুপ্তচরেরাও অনেক সময় এমনিভাবে ফাঁদ পাতে। ঠিক কিভাবে যাচাই করা যাবে তা জানি না। কয়েকদিনের আলাপের পর যদি মানুষটির আন্তরিকতা সম্বন্ধে আস্থা জাগে তবেই তার সঙ্গে অকপটে কথা বলব ঠিক করি। অবশ্য আস্থা জন্মাতে বেশি দেরি হয় না। মধু আমাকে পড়তে দেয় কয়েকটি বাজেয়াপ্ত বই 'কানাইলাল' 'ফাঁসীর সত্যেন' ইত্যাদি। 'কানাই-লাল' বইটির প্রচ্ছদপটে আঁকা রয়েছে একটি বলিষ্ঠ মুঠোয় ধরা রিভলভার। রিভলভারের নল থেকে উদ্‌গীর্ণ অগ্নিশিখা। ভিতরে ফাঁসীর দড়ি গলায় কানাইলাল দত্তের ছবি। কানাইলালের কাহিনী ত মোটামুটি মায়ের মুখে শুনেছি। এবার পাই বিস্তৃত বিবরণ। ধমনীতে রক্তের প্রবাহ উত্তাল হয়ে ওঠে। শুধু ঠিক ঐটুকুতে তখন মন ভরে না। মধুকে নানা প্রশ্ন করে জেনে নিতে চাই কিভাবে তারা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করবে! সব প্রশ্নের জবাব দিতে সে পারে না। আরো দুটি বই দিয়ে পড়তে বলে। একটি হল নলিনী কিশোর গুহের লেখা 'বাংলায় বিপ্লববাদ', অপরটি শচীন সান্যালের 'বন্দীজীবন'। 'বন্দীজীবন' বইটিতে পাই ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটিয়ে সারা ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা। সে পরিকল্পনার ভুলত্রুটি বিচারের মত মনের পরিণতি তখনও হয় নি। সেই মুহূর্তে আমার মনে বহুদিন ধরে সঞ্চিত অনেক প্রশ্নের জবাব পাই 'বাংলার বিপ্লববাদে'। সাদামাঠা বর্ণনা, অতিরঞ্জন নেই, নেই উচ্ছ্বাসের অতিশয্য। অতীতের কাহিনী নয়, আমাদেরই যুগের আমাদেরই মত সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা কিসের প্রেরণায় নিঃশব্দে লোকচক্ষুর অন্তরালে দেশজননীর সেবায় আত্মদান ও আত্মত্যাগকেই জীবনের চরম পুরস্কার রূপে বেছে নিয়েছে, সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই। শুধু আবেগ নয়, রোম্যাণ্টিক উত্তেজনা নয়। দেশভক্তির দর্শন। সে দর্শনে মানবতা আর

স্বাদেশিকতা একসঙ্গে মিলেমিশে ঐকতানের সৃষ্টি করেছে। উপলব্ধি করি যে, পরাধীন দেশে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামই হল মানবসেবা তথা মানবপ্রেমকে বাস্তবে রূপায়িত করার শ্রেষ্ঠ পথ।

পথ ত বেছে নিলাম, কিন্তু সে ত সযত্নে রচিত রাজপথ নয়। প্রতি পদক্ষেপে বহু বাধাবিপত্তির সঙ্গে সামনা-সামনি লড়াই করে পরবর্তী পদক্ষেপের ক্ষেত্র রচনা করতে হয়। পরিপ্রেক্ষিতও স্পষ্ট নয়, পথের রূপরেখাও নয় পরিষ্কার। দেশকে স্বাধীন করতে হবে, দেশের অগণিত মানুষের দুঃখদুর্দশা দূর করতে হবে — শুধু এই বোঝাটুকু পরিষ্কার। বিদেশী শাসনের অবসান হলে তবেই দেশবাসী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। তাই আগে চাই স্বাধীনতা। কিন্তু কিভাবে, কি উপায়ে, কোন কোন উপাদানের সাহায্যে ? এসব প্রশ্নের জবাব ত কেউ সুনির্দিষ্টভাবে তৈরি করে রাখে নি! মধু এত কথা নিয়ে মাথা ঘামায় না। তার জীবনে কর্মটাই প্রায় ষোল আনা স্থান দখল করে ছিল। সে শুধু জানে দেশের জন্য নিজেকে বলি দিতে হবে। কিভাবে, সেকথা চিন্তা করবেন সমিতির নেতারা। তার কাজ শুধু সৈনিকের শৃঙ্খলা নিয়ে আদেশ পালন করে যাওয়া। কবে প্রাণ দেওয়ার ডাক আসবে তারই নীরব একাগ্র সাধনায় তার দিন কাটে। তবে আমি যখন প্রশ্ন তুলি, বাধ্য হয়ে কিছু একটা জবাব দিতে হয়। বিপ্লবের পথ বা রূপ সম্বন্ধে কারুরই একটা স্পষ্ট ধারণা নেই। তবু দুজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্যের সুরটি প্রখর হয়ে ওঠে। মধুর সমস্ত চিন্তা গড়ে উঠেছে ভদ্র তরুণদের গোপন সংগঠন ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে। তার পরিকল্পনায় আমি তরাই এবং পাহাড় অঞ্চলের উপেক্ষিত মানুষদের কোন স্থান খুঁজে পাই না। সেই মানুষগুলি বিপ্লবে কি ভূমিকা নেবে তা আমার কাছেও স্পষ্ট নয়। তবে ওদের বাদ দিয়ে যে চলতে পারে না সে বিশ্বাস একরকম নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। মধু মহাত্মাজীর অহিংসা আন্দোলনের কঠোর সমালোচনা করে। অহিংসা নীতিকে আমিও মেনে নিতে পারি না। কিন্তু পায়ের তলায় পড়া বোবা মানুষগুলির মনে স্বাধীনতার চেতনা যে মহাত্মাজীর আন্দোলনের সোনার কাঠির ছোঁয়া পেয়ে জেগে উঠেছে তার নিদর্শন ত স্বচক্ষে দেখেছি। ওদের কিভাবে টেনে আনা যাবে সশস্ত্র বিপ্লবের অভিযানে ? মধুর কথায় তার সন্ধান মেলে না। তবু দুজনের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে। সেই ত' গোপন বিপ্লবী

আন্দোলনের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র। তাছাড়া মধুর মধ্যে কোন রকম অসহিষ্ণু গোঁড়ামি ছিল না। সাধারণ মানুষদের যদি টেনে আনা সম্ভব হয় তাতে তার আপত্তি নেই। সে বলে যে 'প্রথমে কাজ শুরু করতে হবে ভদ্র তরুণদেরই দিয়ে। যদি একটি গোপন কেন্দ্র এবং কর্মীদল গড়ে না ওঠে তাহলে জনতার কাছে যাব কাদের নিয়ে? তাই আশু কাজ হবে একটি গোপন কেন্দ্র গড়ে তোলা'। মধুর এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে তাদের সমিতিতে যোগদানে সম্মতি জানাই। ঐ সময়ে সমিতির সভ্য হওয়ার জন্য দীক্ষা, শপথ এই জাতীয় অনুষ্ঠানের রেওয়াজ কমে এসেছে। কিন্তু প্রথম পদক্ষেপটিকে একটি বিশেষ ধরনে চিহ্নিত না করলে তরুণ মন তৃপ্তি পাবে কি করে? যে দীক্ষা দেবে আর যে নেবে দুজনেরই প্রেরণার জন্য চাঞ্চল্যকর একটা কিছু করা চাই। নাই বা হল আনুষ্ঠানিক দীক্ষা। যেদিন আমার সম্মতির কথা মধুকে জানাই তার পরের দিন বিকেলে বেড়াবার সময় সে বলে, 'চলুন! আজ শালুগড়ার জঙ্গলের ভিতরটা ঘুরে আসি'। তখন ভেবেছি হয়ত বন দেখাটাই তার প্রধান উদ্দেশ্য। বনের গহনে প্রবেশের পর সে যখন কোমর থেকে রিভলভার বার করে আমার হাতে দেয় তখন শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। মধু দেখায় কিভাবে রিভলভার ছুঁড়তে হয়। তারপর বলে, 'এবার থেকে ধ্যান করবেন সুদর্শনধারী নয়, রিভলভারধারী মুরারী'।

বড়দা ততদিনে 'থিওজফি'র আশ্রয় নিয়েছেন, বোধ হয় সংস্কারের প্রতি আনুগত্য এবং স্বাধীন চিন্তার মধ্যে একটা আপসের উপায় হিসাবে। শুনেছি যে, এক যুগে 'থিওজফিক্যাল সোসাইটি' সারা ভারতের উচ্চশিক্ষিত উদার মতাবলম্বী ব্যক্তিদের আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সোসাইটির সভাপতি ডাঃ অ্যানি বেসান্টের ব্যক্তিত্ব ছিল তার অন্যতম কারণ। আমি যখন জানার সুযোগ পেয়েছি তখন সোসাইটি হয়ে দাঁড়িয়েছে পেন্সনপ্রাপ্ত উচ্চ সরকারী কর্মচারী, উদার মতাবলম্বী জমিদার, রায়বাহাদুর, আইনজীবী ইত্যাদির অবসর বিনোদনের সংগঠন। উচ্চশিক্ষা এবং খানিকটা দার্শনিক মনোভাবের ফলে সম্ভবত তাঁরা সুরুচিসম্মতভাবে অবসর বিনোদনের জন্য এই পন্থা বেছে নিয়েছিলেন। একবার জলপাইগুড়ি শহরে সোসাইটির প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। বড়দা আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভালই লেগেছিল। অনেক ভাল কথা যেমন বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সর্বধর্মসমন্বয়, সমস্ত ধর্মের শিক্ষার সার গ্রহণ, ইত্যাদি শুনেছি। সম্মেলনের

মধ্যমণি ছিলেন কলকাতার তদানীন্তন খ্যাতনামা অ্যাটর্নি স্বর্গত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রতিদিন সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে সমস্ত ধর্মের প্রার্থনা দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হত। প্রথমে উপনিষদের 'পুরুষসুক্ত' 'ওঁ সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ' দিয়ে আরম্ভ এবং ঐতিহাসিক পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধর্মের প্রার্থনা পরপর চলতে থাকত। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ করতেন। এই পরিবেশটি বিশেষ করে ধর্মের গোঁড়ামি থেকে মনকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছে বৈকি! তবে থিওজফির সঙ্গে সম্পর্ক বেশিদিন বজায় রাখা সম্ভব হয় নি। পরবর্তী একটি সম্মেলনে যোগ দিয়ে অনুভব করলাম যে, কথাগুলি নিছক শৌখিন বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। সেগুলিকে কাজে পরিণত করার দিকে এঁদের কোন তাগিদ নেই। উপরন্তু এঁরা রাজনীতি, বিশেষত সংগ্রামী রাজনীতির ছোঁয়াটুকু পর্যন্ত এড়িয়ে চলেন। দেশের দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ ও বেদনা সম্বন্ধে উদাসীন থেকে মানবপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা আওড়ানোকে বেশিদিন মনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি নি। তবু স্বীকার করতে হবে যে, প্রথম দিনগুলিতে 'সোসাইটি'র সংস্পর্শ মনের দিগন্তকে প্রসারিত হতে সাহায্য করেছে। আমাদের ছোট্ট শহরটির বাইরে ছড়িয়ে আছে যে ভারতবর্ষ ও পৃথিবী তার সঙ্গে সংযোগের যোগসূত্ররূপে কাজ করেছে। দাদার কাছে নানা জায়গা থেকে চিঠি এবং পত্রিকা আসত। 'সোসাইটি'র কর্তাব্যক্তিদের অনেকে দার্জিলিং বা কালিম্পং যাওয়ার পথে আমাদের বাড়িতে অতিথি হতেন। একবার এসেছিলেন 'সোসাইটি'র সহ-সভাপতি ডঃ জিনরাজ দাস। সিংহলী ভদ্রলোক, পণ্ডিত এবং অমায়িক লোক। তিনি অবশ্য ডাক বাংলোতে উঠেছিলেন। সেই বয়সে সব কিছু থেকে ভালটুকুই নিতে শিখেছি। 'সোসাইটি'র মারফৎ দুনিয়ার দিকে নতুন চোখে তাকাতে শিখেছি। জাতিবিদ্বেষ বা জাতি-শ্রেষ্ঠত্ব নয়, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের আদর্শ; ধর্মে ধর্মে হানাহানির বদলে সর্বধর্মের মিলন এবং সকলের মধ্যে যে সত্য আছে তাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণের শিক্ষা—এই নিয়েছি।

মধুর সঙ্গে যোগাযোগ যখন হয় সে সময়ে বড়দার কাছে যুব থিওজফিস্ট লীগের কিছু কাগজপত্র এসেছে। বড়দার ইচ্ছা যে, আমি লীগে যোগ দিই এবং শিলিগুড়িতে একটি শাখা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হই। আমার কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু মধু বলে যে, এই ধরণের একটা নিরীহ ভালোমানুষি সংগঠন

থাকলে তার আড়ালে আমরা কাজ করার সুযোগ পাবো। ইতিমধ্যে বিপ্লব-স্বপ্নের আরও দুজন অংশীদার জুটে গিয়েছে। একজন হল মোহন—প্রাণের আনন্দে উচ্ছল, কৌতুকপ্রিয় ছেলেটি। চলার পথে এরকম একজন সঙ্গী না থাকলে শুধু যে মুহূর্তগুলি ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তাই নয়, সহজ সরল প্রাণের উচ্ছ্বসিত হাস্যকৌতুকের ছোঁয়া না পেলে মনের বিকাশ সম্পূর্ণ হতে পারে না। ঘরের গুমোট পরিবেশে আমার স্বভাবটা বড় চাপা হয়ে গিয়েছিল। মোহনের সাহচর্যে পাথর সরে গিয়ে চপল আনন্দের বন্যামুখ খুলে যায়। আর একজন সঙ্গী হয় সীতাপতি। সে বয়সে আমাদের চাইতে কয়েক বছরের বড়। ডিউক অফ কনটের সম্মানের নিদর্শন মেডেল নিতে অস্বীকার ক'রে যে-কয়জন ছাত্র লাঞ্ছিত হয়েছিল, তাদেরই একজন। বয়েসে বড় বলে আমরা তার থেকে দূরে সরে ছিলাম। কিন্তু ঐ ঘটনার কথা শুনে মধু তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের চক্রে টেনে আনে। সংগঠন সম্বন্ধে মধুর কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। সমবয়সী বা প্রায় সমবয়সী কয়েকটি তরুণ সব সময় একত্র চলাফেরা করে—এ ব্যাপারটি দুদিন পরে নিশ্চয়ই পুলিশের চোখে পড়বে। অভিভাবকেরা হয়ত নানা রকম সন্দেহ করবেন। রাজনীতি করছি একথা তাঁদের কোনমতে বলা চলবে না। যেখানে কোন রকম রাজনীতির সংস্পর্শে যেতে সবাই আতঙ্কিত, সেখানে আমরা শুরু করেছি আগুন নিয়ে খেলা। এমনিতেই আমার অভিভাবক ছিলেন অত্যন্ত কড়া। সন্ধ্যার আঁধার নামার আগে ঘরে ফিরতে হবে এই ছিল তাঁর হুকুম। সৌভাগ্যক্রমে মাতৃসমা বৌদি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীলা। বাসায় ফিরতে দেরী হলে তিনি নানারকম কৈফিয়ৎ দিয়ে দাদাকে শান্ত করে রাখতেন। কিন্তু তাতে ত সব সময় কুলোয় না। তাই মধু পরামর্শ দেয় যে, যুব থিওজফিস্ট লীগের শাখা গড়ে তোলার আবরণে আমাদের কেন্দ্রকে সংগঠিত করতে হবে। তাহলে জলপাইগুড়ি শহরে যাতায়াতেরও একটা অজুহাত পাওয়া যাবে। এই শহরেও অন্য ছেলেদের মধ্যে আরো দুই একজনকে দলে টানতে পারবো।

বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছি সে কথা মাকে জানাই না। বুকের ভিতরে একটা বেদনাবোধ জেগে থাকে। মা আশা করে রয়েছেন যে, আদরের ছোট ছেলে লেখাপড়া শিখে প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁর শেষ জীবনের দিনগুলি শান্তিতে কাটবে। জানি, যে-পথে পা বাড়িয়েছি সেপথে মাকে অনেক ব্যথা দিতে

হবে। আর এও জানি যে, দেশমাতৃকার মুখ চেয়ে সে সব ব্যথা মানবী মা নীরবে সহ্য করে যাবেন। নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন শুরু হয়েছে বুঝতে পারি। এখন আর পার্থসারথির মূর্তি ধ্যানে শিহরণ জাগায় না। শিহরণ জাগে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কল্পনায়। ধ্যানধারণার অভ্যাস কবে কখন যে পিছনে ফেলে এসেছি টের পাই নি। যে-পথ বেছে নিয়েছি তাই ত সত্যকার কর্মযোগের পথ। নিষ্কাম কর্ম। ফলের কথা না ভেবে নিজেকে আহুতি দিতে হবে। দেশমাতৃকার পূজায় দিতে হবে "জবার বদলে ছিন্ন শির"। বালক নচিকেতা যেমন জ্ঞানের আগ্রহে মৃত্যুর ভয়াল রূপকে তুচ্ছ করেছিল—তেমনি আবেগ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

এমনি সময়ে নতুন মাস্টার মশায় ক্ষণিকের জন্য আমার মনে একটা দোটানা সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি একদিন ডেকে বলেন 'তোমার লেখার হাত আছে। সাহিত্যকেই জীবনের উপজীব্য করে নাও। অন্য কিছুতে জড়িয়ে পড়ো না'। সম্ভবত কোন কারণে তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল যে, স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়তে চলেছি। তখন ত কিছুদিন মনের অবস্থাটা ছিল যেন রূপকথার রাজ্যের গুপ্তদ্বার খুলে ভিতরে প্রবেশ করেছি। হয়ত চলনে বলনে তার কোন অভিব্যক্তি মাস্টার মশায়ের চোখে ধরা পড়ে থাকবে। সাহিত্যিক হওয়ার আকাঙ্খা আমার তখন থেকেই খুব প্রবল। তবে দোটানা কাটিয়ে উঠতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। কোথায় যেন তাঁর একটা অভিমত চোখে পড়েছিল যে বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। তাই মন স্থির করতে দেরী হয় নি। সাহিত্যও হবে আমার বিপ্লব সাধনারই অঙ্গ। সংগ্রামের প্রবাহে যে, অভিজ্ঞতা অর্জন করবো, তাকেই ফুটিয়ে তুলবো সাহিত্যে। যদি অবশ্য সুযোগ পাই। আর যদি না পাই ক্ষতি কি?

রূপকথার রাজ্যে স্বপ্নচারণ থেকে নেমে আসি কঠিন বাস্তবে আর একটি সংঘাতের মধ্য দিয়ে। বিপ্লবের পথে সহকর্মীর সঙ্গে মতান্তরের অভিজ্ঞতা লাভ করি একেবারে সেই প্রথমের দিনগুলিতে। মধুর সঙ্গে মতভেদ হলেও মনান্তর হয় না। তার আন্তরিকতা এবং সারল্য এমন নিখাদ যে, সেখানে তিক্ততা সৃষ্টির অবকাশ নেই। এই ধরনের মানুষগুলির মধ্যে কি এক সম্মোহিনী শক্তি থাকে যে, তাদের মতামত মেনে না নিলেও তাদের ডাকে নিশ্চিত বিপদের ঝুঁকি নিতে দ্বিধা হয় না। কিন্তু মধুর নবাগত সহকর্মী প্রিয়তোষের মধ্যে দেখি অত্যন্ত উগ্র

অসহিষ্ণুতা। বোধ হয় সমিতিতে তার স্থান মধুর চেয়ে একটু উচ্চে। তাই 'দাদা' ভাবটাও বেশি প্রকট। সে এসেছিল মধুরই ডাকে, এই অঞ্চলে সমিতির শাখা গড়ে তোলার সম্ভাবনা যাচাই করতে। প্রিয়তোষ নিশ্চয়ই তার আসল নাম নয়। তবু সেই নামেই তাকে জানি। সে যে কয়েকদিন শিলিগুড়িতে ছিল তার সঙ্গে প্রায়ই আমার তুমুল তর্ক হত। সে সোজাসুজি বলে যে, সাধারণ মানুষের ঘুম ভাঙ্গিয়ে তারপর সশস্ত্র অভ্যুত্থান করার মত অত দীর্ঘ সময়ের জন্য বসে থাকতে তারা রাজী নয়। সেই সময়ে সংবাদপত্রে দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের খবর প্রকাশিত হচ্ছে। সম্ভবত দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার রায় বার হয়ে গিয়েছে। কাগজে পড়ি উত্তর প্রদেশে কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণ। প্রিয়তোষ বলে যে, অন্য প্রদেশেও 'অ্যাকশন' শুরু হয়ে গিয়েছে। এখানেও আর বেশি দেরি করা চলবে না। মধুর সঙ্গেও প্রিয়তোষের মতের পুরোপুরি মিল নেই দেখতে পাই। মধু সাধারণ মানুষের ভূমিকাকে একেবারে নাকচ করে দিতে চায় না। তবে সে বলে যে, দেশবাসীকে বিপ্লবের পথে টেনে আনতে হলে চাই দুঃসাহিক আত্মদানের অনুষ্ঠান। আপনি মরে অন্যকে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করার পথ দেখাতে হবে। বিপ্লব শুরু করে দিলে পরে সবাই তাতে যোগ দেবে। প্রিয়তোষের মুখে অন্য কথা। সাধারণ মানুষের ভূমিকার উপরে তার শ্রদ্ধা নেই। সে বলে যে মধ্যবিত্ত ঘরের তরুণরাই হল বিপ্লবের প্রধান শক্তি। এদের সংগঠিত করার উপরেই সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে। আমি যে, তার মতকে নির্বিচারে মেনে নিই না এটা তার ক্ষোভের কারণ হয়ে ওঠে। বেশ বুঝি যে, দুদিন পরে ক্ষোভটা পরিণত হবে বিরক্তিতে। সুখের বিষয়, সে এসেছিল দিন কয়েকের জন্য। সপ্তাহ খানেক পরে ফিরে চলে যায়।

প্রিয়তোষ চলে গেলেও মতভেদের জেরটা মনের কোণে জমে থাকে। দৃষ্টি-ভঙ্গিতে যদি এতই গরমিল হয়, তার উপর থাকে অসহিষ্ণুতা, তবে ত প্রতিপদে সংঘাত বাধবে। কে করে দেবে তার সমাধান? এমনি মুহূর্তে হাতে এসে পড়ে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'। বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চরম রাজদ্রোহাত্মক বলে ইংরাজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। ফলে তরুণ মহলে পড়ার আগ্রহ দুর্বার হয়ে ওঠে। বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর বইটির চাহিদা বেড়ে যায়। উপন্যাসটি বঙ্গবাণী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। অনেকে

পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলি কেটে বাঁধিয়ে বই করে নেয়। এমনি একখানা কপি মধু কলকাতা থেকে সংগ্রহ করে আনে। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলি। সেদিনের চেতনায় 'পথের দাবী'তে নতুন পথের ইঙ্গিত পেয়েছিলাম। বিপ্লব প্রচেষ্টাকে ভদ্র তরুণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এগিয়ে যেতে হবে অগণিত খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে। ওদের দুঃখের সাথী হয়ে থেকে বুকে সংগ্রামের আগুন জ্বালাতে হবে! সেই আগুনের প্রেরণায় পাগল হয়ে অসংখ্য মানুষ ছুটে আসবে স্বাধীনতার যুদ্ধে আত্ম-বলিদান করতে। অমর কথাশিল্পী যেমন সব্যসাচীর মুখ দিয়ে বলেছেন "মহামানবের মুক্তিসাগরে মানুষের রক্তধারা ঢেউ তুলে ছুটে যাবে" আর সেই রক্তসমুদ্রে স্নান করে হবে স্বাধীনতার নবীন সূর্যোদয়। 'পথের দাবী'র মহানায়ক সব্যসাচীর মধ্যে দেখা পাই এমন একজন মানুষের যিনি আমাদেরই মতো সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের ছেলে। অথচ বিপ্লবের পরশমণির ছোঁয়া পেয়ে হিমালয়ের মতই এক বিরাট মহান ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। তাঁর পাশে সুদূর অতীত ইতিহাসের পার্থসারথির কল্পনা অনেক পিছনে পড়ে যায় যেন সব্যসাচীকে সংবর্ধনা জানায় কালবৈশাখীর আশীর্বাদ। সাগরের অশান্ত তরঙ্গ তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়ে। ব্রিটিশের গোয়েন্দা পুলিশের বেড়াজালকে তুচ্ছ করে তিনি এগিয়ে চলেন। তাঁর যাত্রা কোথাও বাধা মানে না। মনে মনে বলি 'সব্যসাচী তোমারই ব্যক্তিত্বকে ধ্রুবতারার মতন সামনে রেখে এগিয়ে চলবো। আমিও কথাশিল্পীর ভাষায় তোমাকে নমস্কার জানাই। তুমি যে মুক্তিপথের অগ্রদূত, পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী" !

পথের সন্ধানে

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বার হয়েছে, সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছি। তখনকার দিনে উত্তরবাংলার ছেলেদের কলেজে পড়তে যেতে হত কোচবিহারে নয়ত রংপুরে অথবা রাজশাহী বা পাবনাতে। অভিভাবকেরা আমার জন্য রাজশাহী কলেজই নির্বাচন করেন। হোস্টেলে থেকেই পড়ব। তবে ঐ শহরে আত্মীয়স্বজনেরা আছেন। তাঁরা আমার দেখাশোনা করবেন। দাদাদের ধারণা যে, তা না হলে আমার মত মুখচোরা স্বভাবের ছেলে একলা অসহায় অবস্থায় অবস্থায় পড়বে। আমি যে তাদের সেই ধারণা থেকে কতদূরে সরে এসেছি সে কথা তাঁরা জানবেন কি করে !

ঘরের পরিবেশ থেকে দূরে বাইরের জীবনে একলা পদক্ষেপ বলতে গেলে এই প্রথম। কিন্তু সেজন্য মনে উদ্বেগ সেই। অজানা অচেনার জন্য কৌতূহলই বড় হয়ে উঠেছে। পিছুটানের বেদনা যে আদৌ নেই তা নয়। মাকে ছেড়ে চলে আসি। তরাইয়ের বনপ্রান্তরকে পিছনে ফেলে চলে আসি খরস্রোতা পদ্মার তীরে। ছেলেবেলা থেকে যে হিমালয়ের পটভূমিতে মানুষ হয়েছি তার অভাবটাও কম অনুভব করি না। ছেড়ে আসি প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী মধু ও মোহনকে। কয়েকদিন যেতে না যেতে নতুন পরিবেশের মায়ায় জড়িয়ে পড়ি। এই পরিবেশের নানা দিক থেকে বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শিলিগুড়ির সেই গণ্ডিঘেরা জীবনের পর এখানে এসে যেন সীমাহীন মুক্তির স্বাদ পাই। পদে পদে অভিভাবকের শাসন মেনে চলতে হয় না। পরিচয় হয় সমবয়সী বহু অপরিচিতের সঙ্গে। প্রথম কয়েকটা দিন ত দল বেঁধে সারা শহর এবং তার আশেপাশে ঘুরে বেড়াই। জেলা শহর আয়তনে অনেক বড়। তার উপর উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শহর। বরেন্দ্রভূমির অতীত ইতিহাস যেন ক্ষীয়মাণ কুয়াশার মত সমস্ত অঞ্চলটিকে ঘিরে রেখেছে। শিলিগুড়িতে অতীত বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। এখানে পুরানো দিনের দালানবাড়ীগুলির

ইঁটের গাথুঁনিতে পর্যন্ত প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর। পর্তুগীজদের ভাঙা কুঠি, নিচের তলাটা সম্পূর্ণভাবে মাটির নিচে বসে গিয়েছে। শিয়োলের জঙ্গলে মজে যাওয়া পরিত্যাক্ত পুকুরের সিঁড়িগুলিতে রাজবাড়ির হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির চিহ্ন এখন পর্যন্ত টিকে রয়েছে। কতকালের পুরাণো ভাঙা শিব মন্দিরের সোনালী চূড়া, পুরাতন হয়েও আর একদিক থেকে আমার কাছে নতুন। বরেন্দ্রভূমির অতীত কীর্তির নিদর্শনগুলি সাজানো রয়েছে বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির মিউজিয়ামে। সুযোগ পেলেই সেখানে চলে যাই। মূর্তিগুলির উপর আমার আকর্ষণ জন্মেছিল প্রথমে মেজদার প্রভাবে। স্কুলে পড়ার সময় দুবার রাজশাহী শহরে এসেছিলাম। মেজদা তখন বদলী হয়ে এখানে এসেছেন। মা মাঝে মাঝে তাঁর কাছে এসে থাকে। স্কুলের ছুটি হলে আমিও আসি। মেজদাকে দেখেছি আবগারী দারোগার চাকুরী করেও যেটুক অবসর পান সেটুকু অধ্যয়নে ও সাহিত্যচর্চায় নিযুক্ত করেন। সাময়িক পত্রিকায় লেখা ছাড়াও বই লেখার ঝোঁক ছিল। নিজের পাণ্ডিত্যের জন্য উর্ধ্বতন রাজপুরুষ এবং অধ্যাপক মহলে বেশ কিছুটা শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। এখানে বদলী হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির সভ্য হন। দাদার সঙ্গে সোসাইটির সভায় গিয়েছি, মিউজিয়ামের কক্ষগুলি ঘুরে দেখেছি। তখন ছিল শুধু নতুনত্বের আকর্ষণ। এবার এসেছি দেশের অতীত গৌরব সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও গর্বের অনুভূতি নিয়ে যে সব কথা এতদিন পাতায় বা শুধু মাস্টারমশায়দের মুখে শুনেছি তারই খানিকটা প্রত্যক্ষ দেখছি। মূর্তিগুলির খুঁটিনাটি বুঝি বা না বুঝি, অজ্ঞাতনামা শিল্পীদের ভাস্কর্যের অপরূপ নিদর্শনগুলি তন্ময় হয়ে দেখি। দেশাত্মবোধের তন্ত্রীতে সাড়া জাগে। দেশপ্রেমের রঙে রঙীন চোখ দিয়েই দেখি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের বাসস্থানকে। বিদেশী জালিয়াতদের দ্বারা রচিত অন্ধকূপ হত্যা কাহিনীর মিথ্যাজালকে এই নির্ভীক ঐতিহাসিক ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রকেও তুলে ধরেছেন যথার্থ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে। সেদিন এই ধরণের সত্য ভাষণের ঝুঁকি কম ছিল না। তাই ত মৈত্রেয় মহাশয় দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তাঁর বাসগৃহ যেন তীর্থ। অমনি আর এক তীর্থ মনে হয় কান্তকবি রজনীকান্ত যে বাড়িটিতে কিছুদিন বাস করেছিলেন—সেটিকে।

এখানকার পথঘাট, গাছপালা, লোকজন, ঘোড়ায় টানা টমটমগুলি, সব

কিছুই নতুন। সমতল বাংলার রূপটির সঙ্গে পরিচিত হই এখানে এসে। বাঙ্গালী জীবনের ছন্দটি ধ্বনিত হয়ে ওঠে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার মধ্যে। ভাল লাগে পদ্মাকে। যে সময়ে এখানে এসেছি তখন শ্রাবণের বর্ষায় কূলে কূলে ভরে ওঠা পদ্মার বুকে ক্ষ্যাপা জলোচ্ছ্বাস নিরুদ্দেশের যাত্রারই আহ্বান জানায়। বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাই পদ্মার তীরে, উচু বাঁধের উপর দিয়ে একেবারে পশ্চিমে শহরের শেষ সীমা পর্যন্ত। বাঁ দিকে নদীর অশান্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাস। তার বুক চিরে সকালে বিকালে স্টিমার চলে। তরাইয়ের সন্তানের কাছে সে-ও এক নতুন বিস্ময়। এত বড় নদীর সঙ্গে সদ্য পরিচয়ের ভীতি কাটিয়ে উঠে বন্ধুদের সঙ্গে মিলে তার বুকে নৌকা বাইতে চলে যাই। চাঁদনী রাতে নৌকা বেয়ে ফেরার সময় কলেজের প্রিন্সিপ্যালের দোতলা বাড়িটিকে মনে হয় স্বপ্নপুরী। বাঁধের উপর থেকে ভেসে-আসা বাঁশের বাঁশির মিষ্টি সুর এক বিচিত্র মায়ার আবেশ সৃষ্টি করে।

সব চেয়ে ভাল লাগে কলেজ আর হোস্টেলে যৌবন জলতরঙ্গ। কলেজের বিস্তৃত অঙ্গনের তিন দিক ঘিরে অনেকগুলি ছাত্রাবাস। সমস্ত আবহাওয়া তারুণ্যের প্রাণবন্যায় উদ্বেল। আমি স্থান পেয়েছি নিউ হোস্টেলের এক নম্বর ব্লকের দোতালার একটি ঘরে। পাঁচিল ঘেরা প্রশস্ত হোস্টেল কম্পাউণ্ডের তিন দিকে মোট ছয়টি ব্লক রয়েছে। মুসলিম ছাত্রদের জন্য ব্লকটি অন্য পাঁচটির থেকে একটু দূরে। বিকেলে মাঠে ফুটবল খেলা হয়। সন্ধ্যায় দলে দলে ভাগ হয়ে ছেলেরা আড্ডায় বসে। আমি যেদিন প্রথম আসি ঠিক সেদিনই সন্ধ্যায় মাঠে কারা যেন সমবেত কণ্ঠে গান ধরেছে "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা; হুঁশিয়ার" সে গানের রেশ থামতে না থামতেই আর প্রান্ত থেকে কারা গেয়ে ওঠে "দেশ দেশ নন্দিত করি, মন্দ্রিত তব ভেরী, আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি"। সরকারী কলেজ, হোস্টেল তবু তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। শিলিগুড়ির বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে কত পার্থক্য! তারুণ্যের চাঞ্চল্যের মধ্য থেকে তুলছে শিকল ছেঁড়ার দুর্জয় সঙ্কল্প। ধমনীতে রক্তের প্রবাহ উত্তাল হয়ে ওঠে।

মধুর কাছে শুনে এসেছিলাম যে, রাজশাহী হল উত্তর বাংলায় গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের একটি বড় কেন্দ্র। অনুমান করি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে, বিশেষত হোস্টেলে নিশ্চয়ই সেই সংগঠনের শক্ত ঘাঁটি রয়েছে। কিন্তু কে

দেখিয়ে দেবে সেই রহস্যপুরীতে প্রবেশের গুপ্ত দ্বার? মধুর কাছেই শুনেছি এখানকার সমিতির সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই। তাহলে কার মারফৎ সেখানে প্রবেশের অধিকার লাভ করবো? যতটুকু বইতে পড়েছি ও জেনেছি তাতে বুঝি যে, সে বড় কঠিন তপস্যা। বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবেই অর্জন করা যায় সেই অধিকার। দেখতে দেখতে প্রায় বছর ঘুরে আসে। কলেজের ছুটির সময়ে শিলিগুড়ি ঘুরে এসেছি। মধু আর পড়াশুনা করবে না। জ্যাঠামহাশয়কে বলে মহকুমা আদালতে কি একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। সেটা তার শিলিগুড়িতে থেকে যাওয়ার অজুহাত। ওখানে আমাদের চক্রে আরো দুই একটি করে ছেলে জুটতে শুরু করেছে। সংখ্যা অবশ্য বেশি নয়। রাজশাহী সম্বন্ধে মধুর প্রচণ্ড কৌতূহল এবং আগ্রহ। আমি ভাবি সেখানে যদি বিপ্লবী সংগঠনের অস্তিত্ব থাকে তাহলে আলাদাভাবে নতুন চক্র গড়ে তোলার চেষ্টা করবো কেন, যে সংগঠন রয়েছে তার সভ্য হয়েই কাজ করবো। তখন পর্যন্ত বিভিন্ন বিপ্লবী দলের অস্তিত্ব এবং সেগুলির পারস্পরিক রেষারেষি সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাই মধুকে প্রশ্ন করি। সে সদুত্তর দিতে পারে না। কলেজে কয়েকমাস অতিবাহিত হওয়ার পর উপলব্ধি করেছি যে, যৌবনের দুরন্তপনা সত্ত্বেও বেশির ভাগ ছেলেদের মনের মধ্যে জড়তা আর নানা কুসংস্কারের অচলায়তন এখনও পাকাপোক্ত হয়ে রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখদুঃখের বাঁধাধরা ছকের বাইরে চিন্তা করে কয়জন? তার উপর চেপে বসে রয়েছে অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীলতা। অবশ্য আন্দোলনের এক একটা তরঙ্গ যখন আসে তখন এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সাময়িকভাবে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জোয়ারের জল নেমে গেলে আবার ফিরে যায় সেই গতানুগতিক একঘেয়েমির মন্থরস্রোত জীবনে। বিপ্লবী সংগঠনের কাজ হল এদেরই মধ্য থেকে নানাভাবে যাচাই করে পরীক্ষিত কর্মীর এক একটি দলকে গড়ে তোলা। কিন্তু সেই সব কর্মীরা ত নিজেদের ঢাকঢোল পিটিয়ে জাহির করে না। তারা মিশে থাকে সাধারণ ছেলেদেরই মাঝখানে, লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে সমিতির নির্দেশে প্রস্তুতি করে চলে। যারা কর্মী তাদের সঙ্গে সাধারণ ছেলেদের ব্যতিক্রম অবশ্য দিনের পর দিন নানা খুঁটিনাটি আচরণের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়। মেঘে-ঢাকা সূর্যের মত তাদের প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব সন্ধানীর চোখে ধরা পড়ে। তবে কর্মীদের মধ্যেও ত নানা স্তর

আছে। কাউকে সহজেই বিপ্লবী দলের সভ্য বলে মনে করে নেওয়া চলে না। আবার অনেকে দলের সভ্য হয়েও সমিতির নির্দেশে নিজের সত্য পরিচয় লুকিয়ে রাখবার জন্য নানাকৌশলের আশ্রয় নেয়। যাকে মনে হয় অত্যন্ত নিরীহ গোবেচারা ধরণের ছেলে অথবা যে তার ঠিক বিপরীত, আচরণে অত্যন্ত চপল, হালকা প্রকৃতির, এদের মধ্যে কে সমিতির সভ্য আর কে নয় তা বোঝা খুব সহজ হয় না। সব চেয়ে বড় কথা মন্ত্রগুপ্তি। সহজে কেউ ধরা দেবে না, আমিও দেবো না। কখনও কখনও হোস্টেলের দুই একজন সহপাঠি বন্ধুর কথাবার্তায় যেন গুপ্ত সমিতির অস্তিত্বের ইঙ্গিত পেয়ে সচকিত হয়ে উঠি। কয়েকজন ইতিমধ্যেই অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। কেউ কেউ স্বদেশী মনোভাবাপন্ন, খদ্দর পরে, কথাবার্তায় চাপল্য বা যৌনচেতনার লেশমাত্র নেই। এদেরই মধ্যে একজন রামকৃষ্ণ। আমি বেশির ভাগ সময় বই নিয়ে কাটাতাম বলে সে আমাকে বইয়ের পোকা নাম দিয়েছিল। আমি বলতাম 'বই না পড়ে করবো কি'? একদিন এমনি হাসি-ঠাট্টার মাঝখানে সে হঠাৎ আমার ডান হাতের কব্জি মুঠোয় ধরে বলে 'এ হাত হল রিভলভার ধরার হাত'। মুহূর্তের জন্য সচকিত হয়ে উঠি। তারপর হেসে এড়িয়ে যাই, বলি 'রিভলভার পাবোই বা কোথায় আর ধরতেই বা যাবো কেন'? রামকৃষ্ণের অভ্যাস ছিল মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করা, সেই সব কবিতা যার মধ্যে দুঃসাহসিক অভিযানের ডাক প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। আমার কথার জবাবে সে আবৃত্তি করে "ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে, নহে রে প্রেয়সীর অশ্রু চোখ। তোর তরে পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ, শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ"। তবু নিজেকে ধরা দিই না। ভাবি, হয়ত সমিতি অলক্ষ্যে আমাকে যাচাই করে নিতে শুরু করেছে। রামকৃষ্ণ খাঁটি কর্মী বলেই বিশ্বাস করি। তাহলেও দেখা যাক পরীক্ষা কতদূর পর্যন্ত চলে। তাছাড়া এও যেন এক ধরণের লুকোচুরি খেলা। সহজে ধরা দিলে তেমন জমে ওঠে না। এতদিন আমি ধরতে চেয়েছি সে আমাকে এড়িয়ে গেছে। আমিই বা একটু খেলবো না কেন?

ইতিমধ্যে দেশাত্মবোধক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। 'সমাজসেবক সঙ্ঘ' গ্রন্থাগারের সভ্য হয়ে অনেকগুলি বই পড়ে ফেলেছি। 'সমাজসেবকসঙ্ঘ'-এর কয়েকটি বিভাগ ছিল। সমাজসেবা অর্থাৎ আর্তের সেবা ছাড়াও সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত ছেলেদের জন্য একটি ব্যায়ামের

আখড়া এবং লাইব্রেরী। সঙ্ঘের সঙ্গে আমার যোগাযোগের ব্যাপারে একটু বিশেষত্ব ছিল। বিপ্লবীরা এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করে জানতাম। কিভাবে সঙ্ঘের সভ্য হওয়া যায় খোঁজ করতে গিয়ে তার লাইব্রেরীটি আমার কাছে দুর্নিবার আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সভ্য হওয়ার পদে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সঙ্ঘের একটি নিয়ম। সভ্য হত সাধারণত স্থানীয় ছেলেরা। লাইব্রেরী থেকে বই নিতে কোন চাঁদার প্রয়োজন নেই, শুধু অভিভাবকের গ্যারাণ্টি নিয়ে আসতে হত। আমি থাকি সরকারী কলেজের হোস্টেলে। আইনত আমার অভিভাবক হলেন হোস্টেলের অধ্যক্ষ। তিনি স্বদেশী গ্রন্থাগার থেকে বই এনে পড়া যদি বা মনে মনে অনুমোদন করেন, গ্যারাণ্টি পত্রে সই করতে কিছুতেই রাজী নন। শহরে যে আত্মীয়েরা আছেন তাঁদের কাছে যেতে ভরসা পাই না। তাঁরা সম্মতি ত দেবেনই না, উপরন্তু দাদাদের জানিয়ে দেবেন। হতাশ হয়ে সঙ্ঘের সম্পাদককে আমার অবস্থা জানাই। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন কালুদা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কালুদা হলেন স্বর্গত সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজশাহীতে তিনি সকলের কাছে ঐ নামেই পরিচিত ছিলেন। অল্পদিন হল জার্মানী থেকে দেশে ফিরে এসেছেন এবং জেলা কংগ্রেস কমিটির একজন বিশিষ্ট নেতা হিসাবে সংগঠনের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর নাম আগে অন্য প্রসঙ্গে শুনেছি। কালুদার পিতা ছিলেন রাজশাহী কলেজের স্বনামধন্য প্রাক্তন প্রিন্সিপাল স্বর্গত কুমুদিনী কান্ত ব্যানার্জি। নিউ হোস্টেলের ঠিক সামনেই তাঁর বাড়ী। ঐ পথে যাতায়াত করার সময় অনেকদিন কালুদাকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। সেই স্বল্পবাক্, শান্ত, সৌম্য মানুষটি যে আমাকেও লক্ষ্য করেছেন তা ছিল আমার কল্পনাতীত। ঘটনার দিন তিনি আমাকে বল্লেন 'তুমি ত নিউ হোস্টেলে থাক! কোন ইয়ারে পড়?' দু একটি প্রশ্ন করে এবং আমার নাম জেনে নিয়ে বলেন 'আমি তোমার গ্যারাণ্টি হচ্ছি। ইচ্ছামত বই নিয়ে পড়। কি কি বই পড়লে, কি বুঝলে আমাকে জানিও'।

কি কি বই পড়েছি সবগুলির নাম আজ মনেও নেই, বিস্তৃত তালিকাটাও খুব বড় কথা নয়। কি শিখেছি সেখান থেকে, বিপ্লব সাধনায় কি উপাদান পেয়েছি, সেই কথাটুকুই শুধু তুলে ধরতে চাই আজকার এই হিসেব-নিকেশের মধ্য দিয়ে। পড়েছি সখারাম গণেশ দেউস্করের "দেশের কথা", দাদাভাই

নওরোজীর "Poverty and the Un-British Rule in India," রমেশচন্দ্র দত্তের "Economic History of British India," মেজর বি ডি বসুর "Rise of Christion Power in India," ইত্যাদি। যা পড়েছি তার সবকিছুই যে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলেছি তা নয়। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রের পক্ষে অনেক কিছুই বোঝা সহজ ছিল না। তবু জানার আগ্রহ দুরন্ত। সেই আগ্রহের জোরেই মেজর বি ডি বসুর ঐ প্রকাণ্ড বইটিকে যতদূর সম্ভব খুঁটিয়েই পড়েছি। বই-গুলির মাধ্যমে বিদেশী শাসনের অর্থনৈতিক শোষণের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে দেশাত্মবোধের প্রধান উপজীব্য ছিল এতদিন ভাবাবেগ আর রোম্যাণ্টিক উন্মাদনা, তা যেন পায়ের নীচে শক্ত মাটি খুঁজে পায়। অস্পষ্টভাবে হলেও বুঝতে শিখি যে, দেশজননীর চোখের জল মোছাবার প্রকৃত অর্থ হল দেশের অগণিত মানুষের বুকের উপর থেকে শোষণের এই বোঝাকে অপসারিত করা।

আর এক ধরণের বইতে পড়ি বিভিন্ন পরাধীন বা পদানত দেশের, বিশেষ করে প্রাচ্যের নানাদেশের জাগরণের তথা মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী। নবীন তুরস্ক, জাগ্রত পারস্য, জাগ্রত এশিয়া, আয়ারলণ্ডের বিপ্লবী সংগ্রাম সম্বন্ধে লেখা "ইস্টার বিদ্রোহ ও গরিলা যুদ্ধ", ড্যান ব্রীনের "My Fight for Irish Freedom," মাইকেল কলিন্সের জীবনচরিত, ম্যাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডীর জীবনচরিত, ডাঃ সুন-ইয়াত-সেনের "Memories of a Revolutionist," এমনি আরো কত বই। সমস্ত পরাধীন বা পদানত দেশের মানুষ জেগে উঠছে। তারা বিদেশীর দাসত্বের শৃঙ্খল চূর্ণ করে ফেলার সঙ্কল্পে বলীয়ান হয়ে এগিয়ে চলেছে। কবিগুরুর গানের ছত্রগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে। সত্যই ত "দেশ দেশ নন্দিত করি" ভেরী মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে। ভৈরব প্রেরণ করেছেন তাঁর দুর্জয় আহ্বান। "দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই" ? ভারতকেও জেগে উঠে সবার সাথে মিলে "বিশ্বকর্মভার" নিতে হবে। সেই সঙ্গে আবছাভাবে হলেও আর একটি সত্যকে উপলব্ধি করতে শিখি। মুক্তি সংগ্রাম চলেছে পৃথিবীর দেশে দেশে। সকলের সাধারণ শত্রু সেই এক পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ। "পথের দাবী"তে শরৎবাবু সব্যসাচীর মুখ দিয়ে বর্ণনা করেছেন কিভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা সভ্যতা আর খৃষ্টধর্ম বিস্তারের অজুহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে ছলেবলে কৌশলে সেই সব দেশের প্রভু হয়ে বসেছে। "পথের দাবী" যখন প্রথম পড়ি তখন সেই জিনিসটির তাৎপর্য অত স্পষ্ট করে বুঝি নি। এখন যে সব বই পড়েছি তাতে "White

Man's Burden", (শ্বেতকায়দের দায়িত্ব) তত্ত্বের ভণ্ডামির স্বরূপ অনাবৃত হয়ে যায়। অন্যান্য দেশের মুক্তিসংগ্রামীদের সঙ্গে একাত্মবোধ জাগে।

অন্যান্য দেশের বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে বিপ্লবের স্বরূপ বা পথ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করার মত মনের পরিণতি তখনও হয় নি। বাংলায় লেখা বইগুলিতে প্রধানত সংগ্রাম, বীরত্ব আর আত্মত্যাগের দিকটাকেই বড় করে তুলে ধরা হত। সেই সময়টাতে আইরিশ বিপ্লবীদের কার্যকলাপই হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাংলার তরুণদের অনেকের সামনে জীবন্ত মডেল। খাস ব্রিটেনের শিয়রে ছোট একটি দেশ কি ভাবে ব্রিটিশ সিংহকে বিব্রত করে তুলেছে! আইরিশ বিপ্লবী-দের নেতা ডি. ভ্যালেরা ত তখন এদেশের বিপ্লবী তরুণদের মনে রূপকথার নায়কের মতই বিস্ময়, শ্রদ্ধা আর মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তবু দেশের ও বিদেশের বিপ্লবী সাহিত্য যতটুকু পড়েছি তাতে মনে একটা ধারণা দানা বাঁধতে শুরু করেছে। বিপ্লব মানে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। শুধু বিদেশীর গোলামি থেকেই নয়, নিজের দেশে ও সমাজে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে যে সব অন্যায়-অবিচার তার অবসান ঘটাতে হবে। মনকে মুক্তি দিতে হবে নানা কুসংস্কার, জড়তা আর মোহের নাগপাশ থেকে। নতুবা দেশের মানুষের বহু শতাব্দীর কালনিদ্রা ভাঙ্গানো সম্ভব হবে না। সম্ভব হবে না বিশ্বসভায় প্রথম সারিতে আসন নেওয়া। এদিক থেকে ডাঃ সুন-ইয়াৎ-সেনের স্মৃতিকথা আমার মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তিনি বইটির প্রথম কয়েকটি অধ্যায় জুড়ে একটি দার্শনিক তত্ত্বকে খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। তখন চীনে বহুল প্রচলিত দার্শনিক মতবাদ ছিল যে, কর্মের দ্বারা কোন পরিবর্তন ঘটানো যায় না, পাল্টানো যায় না নিয়তির বিধানকে। মানুষের কাজ হল সেই নিয়তির বিধানকে জানা—"Know-ledge is easy, Action is difficult" অর্থাৎ জ্ঞান সহজ, কর্ম কঠিন। দেশ-বাসীকে বিপ্লবের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য ডাঃ সুন-ইয়াৎ-সেন ঐ মতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে "Action is easy, Know-ldge is difficult" অর্থাৎ কর্মই সহজ, জ্ঞান কঠিন। এত দিনের ব্যবধানে সব কথা ভাল মনে নেই। বইখানিকে দ্বিতীয় বার পড়ে দেখার অবকাশ হয় নি। আজ শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, কর্মের দর্শনের সন্ধানে এগিয়ে চলার পথে ত' পাথেয় হিসাবে কাজ করেছে। এই দিক থেকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির "Nation in the Making" বইটিও আমাকে প্রভাবিত করে।

সেখানে তিনি শ্রীচৈতন্যের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করেছেন সম্পূর্ণ নতুনভাবে। অন্তত এর আগে অন্য কোন বইতে ঐ ব্যাখ্যা চোখে পড়ে নি। সুরেন্দ্রনাথ চৈতন্যকে দেখিয়েছেন সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর রূপে। সমাজ ও শাস্ত্রের নামে রচিত যে সব কৃত্রিম বেড়া মানুষকে মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে রাখে সে সব কিছুকে চৈতন্য ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিলেন। বেড়া ভেঙ্গে না ফেলতে পারলে জাতীয় ঐক্যবোধের জাগরণ হবে কি ভাবে? ছোটবেলায় স্বামী বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের শিক্ষায় কর্মযোগের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। স্বামীজীর পত্রাবলী পড়ে সেই শিক্ষাকে দেশের ও সমাজের বর্তমান পটভূমিতে নতুনভাবে উপলব্ধি করি। বিপ্লবের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে কর্মযোগ কর্মের দর্শনের রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে।

'সমাজ সেবক সঙ্ঘ' কোন বিপ্লবী সমিতির পরিচালনায় কাজ করে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলাম। কিন্তু কারুর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে ওঠে না। কালুদা কোন বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংশ্লিস্ট আছেন কিনা বুঝি না। তিনিও নিজে থেকে কিছু বলেন না। ইতিমধ্যে হোস্টেলে বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন খানিকটা স্পষ্ট-ভাবেই গুপ্ত সমিতিতে যোগদানের প্রসঙ্গ তুলেছে। আমি আমল দিই নি। তারা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। পরে সমিতিতে যোগ দিয়ে নেতার কাছে শুনেছি যে, ঐসব বন্ধুরা আমার সম্বন্ধে নিরাশাজনক রিপোর্ট দেয়। কিন্তু সবার পিছনে থেকে অলক্ষ্যে যিনি সব কিছু পরিচালনা করছিলেন, তিনি মোটেই হাল ছাড়েন নি। বরং তাঁর পরীক্ষায় বোধহয় ভাল নম্বর পেয়ে চলেছি। তাই একদিন হোস্টেলের কমনরুমে একটা অতি সাধারণ উপলক্ষ ধরে পরিচয় করে নিলেন। বীরেন দত্ত ছিলেন হোস্টেল ইউনিয়নের সম্পাদক। ছাত্রদের সমস্ত উৎসবে-অনুষ্ঠানে তাঁর অসাধারণ কর্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যেত। তেমনি ছিল তাঁর জনসেবায় অক্লান্ত উৎসাহ। কলেরা ও বসন্তের আক্রমণে শহরে যেসব দরিদ্র ও সহায়হীন মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়ত তাদের শুশ্রূষায় তিনি রাতের পর রাত কাটিয়ে দিতেন। এহেন লোকটি যে আমার চোখে সহজেই বীরের আসন দখল করে নেবেন তাতে আর আশ্চর্য কি! বীরেনদা জলপাই-গুড়ির ছেলে। তাঁর নিকট আত্মীয় ও অভিভাবক বড়দার ঘনিষ্ঠ পরিচিত। সেদিন শিলিগুড়ি আর জলপাইগুড়ি শহর ছিল দুটি শহরের বাঙ্গালী ভদ্রলোক-দের সামাজিক সংযোগের দিক থেকে পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি। বীরেনদা

আলাপ শুরু করলেন সেই সূত্র ধরেই। প্রথম পরিচয়ের পর একদিন তিনি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করবেন কিছু ভেবেছেন ? ভাল ছাত্র এবং লক্ষ্মী ছেলে হয়ে দিন কাটাবেন, না দেশের কাজ কিছু করবেন' ? কি করব প্রশ্ন করাতে জবাব দিলেন, 'আমি যা করি তাই'। ভাবি যে এইবার সেই ঈপ্সিত সুযোগ হাতের নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছে। বিনা দ্বিধায় সম্মতি জানাই। হাতেখড়ি হল সেবাব্রতেরই মাধ্যমে। কলেরা রোগীর সেবা। একলা নই একেবারে। হোস্টেলেরই আরো দুই-একজন একসঙ্গে কাজ করি। তারাও বোধহয় শিক্ষানবিসের স্তরে সদ্য প্রবেশ করেছে। ক্রমে শেষ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হই। একদিন বীরেনদা ডেকে নিয়ে বিপ্লবীদলের কার্য-কলাপ সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করে তাতে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। এজন্য ত পা বাড়িয়েই ছিলাম। তাই সাড়া দিতে দেরি হয় না।

বীরেনদার কাছে মধুর প্রসঙ্গ তুলতে জানতে পারি যে, বিপ্লবীরা সকলে এক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত নয়। দুটি প্রধান দল আছে—অনুশীলন সমিতি এবং যুগান্তর। তাছাড়া আরো কয়েকটি ছোট দল বা গ্রুপ আছে। অনুশীলন সমিতি হল শক্তিশালী কেন্দ্রের নেতৃত্বে পরিচালিত দল। বিভিন্ন জেলায় এবং বাংলার বাইরেও কয়েকটি প্রদেশে তার শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত। মধুদের সমিতি নামে যুগান্তরের সঙ্গে যুক্ত হলেও কার্যত স্বাধীনভাবে কাজ করে। তার উপর সেই সমিতির কেন্দ্র হল বাংলার সুদূর পূর্বপ্রান্তে চট্টগ্রামে অবস্থিত। বিভিন্ন দলের মতে বা কর্মসূচীতে পার্থক্য কোথায়, এই প্রশ্নের কোন স্পষ্ট জবাব বীরেনদাও দিতে পারেন না। তিনি শুধু বলেন যে, অনুশীলন এবং যুগান্তর দুই দলেরই কয়েকজন প্রবীণ সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতার চেষ্টায় সমস্ত দলগুলিকে একত্র মিলিত করার উদ্যোগ এগিয়ে চলেছে। শীগগিরই তা ফলপ্রসূ হবে আশা করা যায়। আমি একটু দোটানায় পড়ি। তবে মন স্থির করে-ফেলি যে, অনুশীলন সমিতিতেই যোগ দেব। জলপাইগুড়িতেও এই সমিতির শাখা রয়েছে। তার সঙ্গে মিলিত হলে তবেই শিলিগুড়িতে সংগঠন গড়ে তোলার কাজটি সহজ হবে। অবশ্য মধুর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলে নিতে হবে। স্থির হয় গ্রীষ্মের ছুটির সময় বীরেনদা একদিন শিলিগুড়ি যাবেন। তখনই মধুর সঙ্গে একটা ফয়সালা করা যাবে।

'বাংলায় বিপ্লববাদ' বইটিতে পড়েছিলাম গুপ্ত সমিতির সভ্য হওয়ার

আগে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি দীক্ষা এবং শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পার হতে হত। বীরেনদা বলেন প্রথম যুগে কর্মী বাছাই করার জন্য ঐ ধরনের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। তখন ধর্মের প্রভাব ছিল খুব বেশি। মন্ত্রগুপ্তি ও সঙ্কল্প সম্বন্ধে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দীক্ষিত হলে কর্মী তার মর্যাদা রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে এই ছিল ধারণা। তখন কর্মীদের বেশির ভাগের কাছে বিপ্লবের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। আবেগই ছিল প্রধান সম্বল। তাই তাঁরা স্বেচ্ছায় দুঃখকষ্ট বরণের ও মৃত্যুকে তুচ্ছ করার প্রেরণা খুঁজতেন আধ্যাত্মিকতায়। তবু সেই প্রথম যুগেও বিপ্লবীদের কাছে ধর্মের বহিরঙ্গ দিকটার কোন মূল্য ছিল না। হাঁচি-টিকটিকি, যাত্রা-অযাত্রা প্রভৃতি কুসংস্কার এবং জাত-অজাত, ছোঁয়াছুঁয়ি, বাছবিচার ইত্যাদিকে অস্বীকার করেই শুরু হত তাদের পথচলা। বিপ্লবীদের গোপন আশ্রয়ে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের ছেলে একই থালায় ভাত খেয়েছে। ফেরারী নেতা মুসলমান মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে মিশে থেকেছেন। বীরেনদা নিজের মনের বিকাশের কাহিনী বর্ণনা করে শোনান। তিনি বলেন যে, বিপ্লবীদের চোখে দেশই ঈশ্বর এবং দেশের মুক্তিসংগ্রামই ধর্ম। এখন বিপ্লবী আন্দোলন এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে তার শৈশবের আনুষঙ্গিক ঐসব বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে। ইতিহাসের ধারাকে বোঝার প্রয়োজনীয়তা ক্রমে প্রাধান্য লাভ করেছে। তাছাড়া কর্মের ক্ষেত্র বর্তমানে অনেক প্রসারিত, বহুমুখী হয়েছে। দেশের মানুষের, বিশেষত তরুণদের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উঠেছে দুর্নিবার হয়ে। এখন ছাত্র ও যুব সংগঠনের নানা কাজের মধ্য দিয়ে কর্মীদের যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে। কোন্ কর্মী কোন্ ধরনের কাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী পরীক্ষা করে তাকে সেই ধরনের ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

দৈনন্দিন যোগাযোগের জন্য বীরেনদা পাশের ব্লকের যজ্ঞেশ্বর বাবুর সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। বীরেনদা নিজে ত মার্কামারা লোক। পুলিশের খর-দৃষ্টি রয়েছে তাঁর উপরে। ছেলেদের মধ্যেও তাঁর আসল পরিচয় জানে এমন সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। তাঁর কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করলে আমিও দুদিনেই মার্কামারা হয়ে যাব। তাই এই সাবধানতা। যজ্ঞেশ্বর বাবু আমাদের চেয়ে এক ধাপ উঁচু কর্মী। প্রতিদিনের কাজে তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে হবে। এই মানুষটিকে বাইরে থেকে দেখে মনে হয় অত্যন্ত শান্ত। যাকে বলে সাতে-

পাঁচে নেই। বিজ্ঞানের ছাত্র। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, পরীক্ষায় ভাল ফল করাটাই তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। পরে বুঝি যে, সমিতি থেকে এক বিশেষ ধরনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁর উপরে। যজ্ঞেশ্বর বাবু নিজেও আমাকে পরীক্ষা করে নিতে চান। এক সন্ধ্যায়, যখন রুমে অন্য কেউ নেই তখন এসে কাগজে-মোড়া একটি টিনের বাক্স হাতে দিয়ে বলেন, 'এতে কার্টিজ আছে। সাবধানে রাখতে হবে'। খুলে দেখার কৌতূহল যে হয় নি তা নয়। কিন্তু কৌতূহল দমন করি। খুলে দেখার কথা ত বলেন নি। শৃঙ্খলা ভাঙ্গা চলবে না। বোধ হয় এটাই ছিল পরীক্ষা। কয়েকদিন পরে আবার বাক্সটি ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। এর পর বে-আইনী বই আর ইস্তাহার পড়ার পালা। এক একটি রুমে চারজন করে ছাত্র থাকার ব্যবস্থা। অন্যদের লুকিয়ে গোপনে বে-আইনী বই আর ইস্তাহার পড়ার কায়দাও শিখেয়ে দিয়ে যান। ছোট ব্যাপার, তবু তাতে রোমান্সের স্বাদ পাই। তারপর শুরু হয় সহকর্মীদের সঙ্গে পরিচয়। আমাদের ব্লকে সমিতির কর্মী আর দুজন মাত্র আছে। চেনা সাথীদের অন্যভাবে আবিষ্কার করি। রামকৃষ্ণ অনুশীলনের কর্মী। নতুন পরিচয়ের পর আগের ছোটাখাটো ঘটনার কথা নিয়ে দুজনে আমোদ করি। পরিচিতকে নতুনভাবে জানার আনন্দ চরমে পৌঁছায় যখন যজ্ঞেশ্বর বাবু নির্মলের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। নির্মলের সঙ্গে আমার আত্মার আত্মীয়তা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল, অন্য সূত্র ধরে। প্রথম আলাপ হয় কলেজের লাই-ব্রেরীতে, সম্ভবত মরিস মেটারলিঙ্কের বিশ্ববিখ্যাত নাটক 'ব্লু-বার্ড'কে উপলক্ষ্য করে। তারপর সাহিত্য-আলোচনাকে কেন্দ্র করে তা পরিণত হয় নিবিড় সখ্যে। সেই মুখচোরা লাজুক ছেলেটির বুকেও যে দেশপ্রেমের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত সে কথা কি আগে ঘুণাক্ষরে টের পেয়েছি? সেও কোনদিন সামান্য আভাসটুকুও দেয় নি, অথচ আমাকে সমিতিতে টানার পক্ষে সুপারিশটি ঠিক জায়গামত পোঁছে দিয়েছে। নির্মলকে এভাবে পেয়ে ভাবি যে, বন্ধু হবে আমার সকল সাথীদের মধ্যে অনন্য। মাতৃমুক্তি অভিযানের দুর্গম বিপদসঙ্কুল পথে তাকে সহযাত্রীরূপে পাব জেনে বুকে আরো বেশি বল পাই।

রহস্যপুরীর দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। স্বপ্নের জগৎ ছেড়ে এসে দাঁড়াতে হবে বাস্তবের সিংহদ্বারে। ভারতের রাজনৈতিক আকাশের ঈশানকোণে ঝড়ের মেঘ জমতে শুরু করেছে! ঝড়ের সূচনা হয়েছে' সাইমন কমিশন বর্জনের

আন্দোলনে। ১৯২৭ সালের শেষের দিকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট সার জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করে। ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসন লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে কিনা এবং কতটুকু করেছে তা যাচাই করার জন্যই ঐ কমিশন। ভারতের জনমত সেই ঘোষণাকে গ্রহণ করে চূড়ান্ত জাতীয় অব-মাননার রূপে। স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। সেই অধিকার লাভের জন্য যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হবে? পরীক্ষা নেবে বিদেশী শাসক? অপমানের প্রতিবাদে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে গর্জন করে ওঠে। সমস্ত রাজনৈতিক দল যে ঠিক একই কারণে বা একই যুক্তিতে প্রতিবাদ করে নি সে কথা জেনেছি আরো পরে। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেও যে দক্ষিণপন্থা ও বামপন্থার সংঘাত চলেছে সে সম্বন্ধেও অবহিত হয়েছি বছরখানেক পরে। সেদিন এইটুকুই শুনেছি যে, সারা দেশ একবাক্যে সাইমন কমিশনকে বর্জন করেছে। কালুদার সঙ্গে দেখা হতে বলেন, 'আগামীকাল টাউন হলের সভায় যাবে। তোমার বন্ধুদেরও সঙ্গে নেবে।' সভায় রাজশাহী জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি স্বর্গত সুরেন্দ্রমোহন মিত্র মহাশয় সমস্ত সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের নেতাদের স্বাক্ষরিত টেলিগ্রাম পড়ে শোনান। সভা তুমুল উল্লাসে ফেটে পড়ে। স্থির হয় পরে একদিন ভুবনমোহন পার্কে বড় করে সভা হবে। ভুবন-মোহন পার্কের সভায় বঙ্গভঙ্গ যুগের প্রখ্যাত বর্ষীয়ান নেতা কিশোরী মোহন চৌধুরী মহাশয় অসুস্থ শরীর নিয়েও এসে উপস্থিত হন। বক্তার পর বক্তার ভাষণ শুনতে শুনতে মনে হয় একটা বড় ধরনের আন্দোলন শুরু হওয়ার আর দেরি নেই।

এসে যায় ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। সাইমন কমিশন যেদিন ভারতের মাটিতে পা দেবে সেইদিনটিতে হরতাল ও বিক্ষোভ মিছিলের তুফান তোলার জন্য জাতীয় কংগ্রেস দেশবাসীকে আহ্বান জানায়। গোটা দেশ জুড়ে পিকেটিং, ধর্মঘট আর বিক্ষোভ মিছিলের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। রাজশাহীতেও পৌঁছে যায় সেই ঝটিকা সঙ্কেত। কলেজের গেটগুলিতে স্বেচ্ছাসেবকেরা পিকেটিং করে। লাল পাগড়িতে কলেজের সামনের রাস্তা ছেয়ে ফেলেছে। বিকেলে ভুবনমোহন পার্কের জনসভায় বক্তাদের কণ্ঠে আগুন ঝরে। আমি তখনও দর্শক। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও দর্শক ছিলাম। তাতে অংশগ্রহণের মত বয়েস ছিল না। কিন্তু বড় হয়ে ভেবেছি যে, আবার কবে

সেই দিনগুলি ফিরে আসবে? গণমনের উত্তেজনা কবে লাভাস্রোতে ফেটে পড়বে? সেদিন এলে আর নিছক দর্শক হয়ে রইব না। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার মুহূর্ত বুঝি সমাগত। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলন অবশ্য দুদিন পরে স্তিমিত হয়ে আসে। তা সত্ত্বেও সেই আন্দোলনকে এক ব্যাপক সংগ্রামের পূর্বাভাস বলে বুঝতে কারুরই ভুল হয় না। শুনতে পাই, ৩রা ফেব্রুয়ারি সারা বাংলা জোড়া ছাত্র ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন। কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ আর স্কটিশ চার্চ কলেজের সামনে পিকেটিং করার সময় কয়েকজন ছাত্রনেতা পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। কলকাতার ছাত্র সমিতি এক সম্মেলন করে সারা বাংলায় ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দুজন ছাত্র-নেতা প্রমোদ ঘোষাল এবং বীরেন দাশগুপ্ত প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে রাজশাহীতে এসে পৌঁছান। সভা হয় ভুবনমোহন পার্কে। প্রচুর ছাত্র সমাবেশ হয়। এই ভাবেই শুরু হল আমার গণ-আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

সমিতি থেকে তখনও আমার উপর বিশেষ কোন কাজের ভার দেওয়া হয় নি। শিক্ষানবিস হয়েই রয়েছি। বে-আইনী বই ছাড়াও নানা ধরনের বই পড়ি। বই পড়া নিয়ে রামকৃষ্ণের সঙ্গে মাঝে মাঝে মতান্তর হয়। সে কলেজের পড়ায় ভাল ছাত্র হলেও রাজনীতির তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী নয়। সাহিত্যের উপর কেমন যেন বিতৃষ্ণা পোষণ করে। তার কথা হল "অ্যাকশন" চাই। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত বইয়ের ইন্দ্রনাথ চরিত্রটি তার খুব মনোমত। রামকৃষ্ণের পাল্লায় পড়ে সাহসের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এক অমাবস্যার ঘোর সন্ধ্যায় শ্মশানে ঘুরে এসেছি। সে বলে, ইন্দ্রনাথের মতই বে-পরোয়া দুঃসাহসী হতে হবে। ইন্দ্রনাথ চরিত্রের অসীম সাহস আর হৃদয়বত্তাকে প্রশংসা করলেও আমি শুধু ঐটুকু নিয়ে তৃপ্ত হতে পারি না। এ পথে শুধুমাত্র হৃদয়াবেগ আর সাহসই যে যথেষ্ট নয় সে কথা ততদিনে ভালভাবেই বুঝেছি। তাই ইন্দ্রনাথ চরিত্রের মূল্যায়ন নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে তীব্র মতান্তর হয়। সৌভাগ্যক্রমে নির্মলের সাহচর্যে মনের খোরাক খুঁজে পাই। নির্মলের একটা ঝোঁক ছিল যে, বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্তত একখানা করে বই পড়তেই হবে। তার সঙ্গে মিলে আমিও এক এক সময় কলেজের প্রকাণ্ড গ্রন্থাগারের মধ্যে ডুবে যেতে চাই। হোস্টেলে আমাদের ব্লকে কিছু সংখ্যক

ছাত্র স্বদেশীর ঘোর বিরোধী। তাদের নেতা প্রণব বাবু ভাল ছাত্র হিসাবে এবং ব্যক্তিগত চালচলনের সারল্যের দরুণ অনেকের শ্রদ্ধাভাজন। তাঁর চেষ্টায় আমাদের ব্লকে একটা সুন্দর সাহিত্যিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে। কিন্তু সমস্ত রকম গভর্নমেন্ট-বিরোধী আন্দোলনের সম্বন্ধে তাঁর শুধু যে দারুণ বিতৃষ্ণা তাই নয়, নিতান্ত উন্নাসিক মনোভাব। ছাত্ররা যাতে এইসব "হুজুগে" না জড়িয়ে পড়ে সেজন্য তিনি জোরালো মত প্রকাশ করার সুযোগ পেলে ছাড়েন না। তাঁর মতে বীরেন দত্ত হুজুগ সৃষ্টির পাণ্ডা ছাড়া আর কিছু নয়। ঐ ব্লকে আমরা যে দুই তিন জন রাজনীতির সংস্পর্শে এসেছি তারা ক্ষুব্ধ হলেও মুখ ফুটে প্রতিবাদ করার ভরসা পাই না। একে ত তখন পর্যন্ত প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রের হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠতে পারি নি—তার উপরে ছাত্রজীবনের একেবারে গোড়া থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থক বলে চিহ্নিত হতে সমিতির নিষেধ রয়েছে। অতএব বিক্ষোভকে তখনকার মত মনেই চেপে রাখি। পরে বুঝেছিলাম, মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঐ সময়ে যে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন, তারই অতিরঞ্জিত প্রতিফলন হয়েছে প্রণব বাবুর মানসিকতায়। তবু প্রশ্ন থেকে যায়। কবিগুরুর অজস্র গানে ও কবিতায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে দেশাত্মবোধের যে বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনা, তার লেশমাত্র কেন খুঁজে পাই না রবীন্দ্র-ভক্ত প্রণব বাবুর চিন্তাধারায়?

এদিকে কলেজের বার্ষিক পরীক্ষা এসে গিয়েছে। পরীক্ষার পর ফল বার না হওয়া পর্যন্ত কয়েকদিন উৎসবের আবহাওয়া। হোস্টেলের বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন। আনন্দে উজ্জল দিনগুলি দেখতে দেখতে কেটে যায়। প্রকাশিত হয় পরীক্ষার ফল। সম্মানের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়েছি। এবার গ্রীষ্মের অবকাশে বাড়ি ফেরার পালা। একদিকে ছেলেবেলার সেই পরিচিত পরিবেশ মনকে টানে। অন্যদিকে এই এক বৎসরে পাওয়া নতুন বন্ধুদের ছেড়ে যেতে হৃদয় বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়। শিলিগুড়িতে ফিরে দেখি সমিতির কাজ বেশি এগোয় নি। সম্ভাবনাও বিশেষ নেই। সম্ভবত সেইজন্যই মধুর উপর নির্দেশ এসেছে যে, তাকে অন্যত্র যেতে হবে নতুন কোন দায়িত্ব নিয়ে। তার সঙ্গে বীরেনদার যোগাযোগ করে দিতে হবে। আমার খবর পেয়ে বীরেনদা একদিন এসে উপস্থিত হন। বিকেলের দিকে তিনজনে বেড়াতে বেড়াতে চলে যাই মহানন্দার পুল পার হয়ে জনবিরল মাটিগড়া রোড ধরে চাঁদমণি ফরেস্টের প্রান্তে।

অন্যান্য কথার পর বীরেনদা মধুকে জিজ্ঞাসা করেন "সমস্ত বিপ্লবীদলগুলিকে এক করার জন্য আলোচনা চলেছে। সেক্ষেত্রে আপনারা-আমরা একসঙ্গে মিলে কাজ করায় বাধা কোথায়?" মধুর জবাবে বুঝি যে, এই ধরনের সংযুক্তির প্রস্তাবে তারা খুব উৎসাহিত নয়। সে বলে: "তরুণেরা চায় কাজ। কিন্তু বড় বড় দলের নেতারা ত সেরকম কোন পরিকল্পনা উপস্থিত করেন নি।" বীরেনদা পাল্টা প্রশ্ন করেন: "আপনারা কি করতে চান পরিষ্কার করে বলুন না। তাহলে আমরাও ভেবে দেখতে পারি।" মধু স্পষ্ট কোন উত্তর দিতে পারে না। আমার কাছে সমস্ত আলোচনাটাই একটা হেঁয়ালি থেকে যায়। তবে কি সে বীরেনদার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে রাজী নয়? অথবা সে নিজেই ভাল করে জানে না যে, তার সমিতি ঠিক কি ধরনের কর্মপন্থা গ্রহণ করতে চলেছে? 'দাদা'রাই বা কি ভাবছেন? যাঁরা বিপ্লবী আন্দোলনের স্রষ্টা তাঁদের সম্বন্ধেই বা তরুণ মনে আজ আস্থার অভাব দেখা দিয়েছে কি কারণে? ভাবি, বীরেনদার কাছ থেকে সময়মত সব কিছু খুঁটিয়ে জেনে নেব। তখন কি জানি যে, আরো কত প্রশ্নের পর প্রশ্ন সামনে এসে হাজির হবে এই জীবনের পথ-চলার প্রতি পদক্ষেপে? আপাতত স্থির হয় এখানকার শাখাটি অনুশীলন সমিতির সঙ্গেই যুক্ত হবে। মধুও সে প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে বলে: "আমি ত চলেই যাচ্ছি। আর আমাদের সমিতির পক্ষে অতদূর থেকে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব নয়। তাই এই সিদ্ধান্তই তোমাদের কাজের পক্ষে সুবিধাজনক হবে।"

বীরেনদা জলপাইগুড়িতে ফিরে যান। মধুও কিছুদিনের মধ্যে শিলিগুড়ি ছেড়ে যায়। চিঠিপত্রে সংযোগ রাখা যাবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। হয়ত মধুর উপরে এমন ধরনের দায়িত্ব পড়বে যাতে পরিচিতদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ভিন্ন নামে একেবারে ভিন্ন মানুষটি সেজে বাস করতে হবে। আবার কবে দেখা হবে জানি না। আদৌ আর কোনদিন হবে কিনা তাই বা কে বলতে পারে? বিদায়ের সময় দুজনের মনই খুবই বিষণ্ণ। আসন্ন বন্ধু-বিচ্ছেদের ব্যথায় মোহন খুব বেশি বিচলিত। মধু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে: "সব কিছু জেনেই ত এ পথে পা বাড়িয়েছ। যার যখন ডাক আসবে, পিছনের দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে চলতে হবে।" মধু চলে যাওয়ার পর দিনগুলি বড় ফাঁকা ঠেকে। শিলিগুড়ির জীবনকে মনে হয় বড়ই নিস্তরঙ্গ। কাজও তেমন

কিছু নেই। এদিকে আবার সেই অভিভাবকের কড়া শাসন। সৌভাগ্যক্রমে বড়দা বলেন: "কয়েক দিনের জন্য মাথাভাঙ্গা ঘুরে এস। পৈতৃক বাড়িটা কি অবস্থায় আছে তা দেখে আসবে, বেড়ানোও হবে।" প্রস্তাবটা মন্দ লাগে না। বড় হওয়ার পর এই প্রথম সেখানে যাব, একলা। আর একটা সম্ভাবনার কথা ভেবে উৎসাহ বোধ করি। ছেলেবেলার বন্ধুদের ভিতর থেকে কয়েকজনকে যদি 'রিক্রুট' করা যায় তাহলে সমিতির একটা শাখা প্রতিষ্ঠা করা যাবে। যদি সফল হই, সেটা হবে একেবারে আমার নিজস্ব উদ্যোগে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে প্রথম সাফল্য।

মাথাভাঙ্গায় এসে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়ি। এখানকার মানুষের মানসিক পরিমণ্ডল শিলিগুড়ির চেয়েও অ-রাজনৈতিক। তার উপর মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর কোচবিহার রাজ্যের জীবনে মস্ত বড় পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। Benevolent despotism-এর despotism-টুকুই অবশিষ্ট আছে। প্রজাদের মাথার উপরে চেপেছে নানা রকম করের বোঝা। গ্রামাঞ্চলের মানুষদের উপর শোষণ তীব্রতর হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতির ভাঙনের প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। তারই প্রতিক্রিয়া রূপেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে 'ভাটিয়া' বিদ্বেষ। মহারানী বহিরাগতা। তাঁর প্রধান উপদেষ্টা এবং বড় বড় কর্মচারীরা নিম্নবঙ্গ থেকে আগত। তার উপর তারা ব্রিটিশ রাজমুকুটের উপর আনুগত্য দেখাবার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব। স্বাধীনতা আন্দোলনের একটু ছোঁয়াচও যাতে রাজ্যের মধ্যে এসে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য কর্তৃপক্ষের সাবধানতার অন্ত নেই। আর রাজপরিষদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের লেশমাত্র দেখা গেলে তাকে দমন করার জন্য তাঁরা অত্যন্ত তৎপর।

মাথাভাঙ্গায় সমিতির জন্য 'রিক্রুট' সংগ্রহের আশা ছেড়ে দিয়ে শিলিগুড়ি ফেরার জন্য তৈরী হই। প্রায় শেষ মুহূর্তে একজনকে পেয়ে যাই। পরেশ ছিল মাথাভাঙ্গা স্কুলে আমার সহপাঠি। সেও গতবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কোচবিহার কলেজে ভাত হয়েছে। সুন্দর চেহারা, শান্ত-লাজুক ছেলে। তার কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। একদিন দেখা হয়ে গেল নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল লাইব্রেরীতে। সেও আমারই মত বইয়ের পোকা। অতএব ছেলেবেলার প্রীতির সম্পর্ক দুদিনেই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। পরেশও এক বৎসরের কলেজ-জীবনের পর বাড়ি ফিরে উপযুক্ত সঙ্গী না পেয়ে হাঁপিয়ে

উঠেছিল। আমাকে পেয়ে মনের দুয়ার উন্মুক্ত করে ধরে। কথার সূত্রে এক দিন বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। যে দুই-একখানা বই সঙ্গে নিয়ে এসেছি পড়তে দিই। পরেশ অবশ্য তখনই সমিতিতে যোগ দিতে রাজী হয় না—পরে জানাবে বলে। চিঠিপত্রে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রতিশ্রুতির পিছনে কতটা নতুন বন্ধুত্বের আকর্ষণ আর কতটা বিপ্লবী আন্দোলন সম্বন্ধে আগ্রহ ঠিক বুঝে উঠি না। তবু সে কাজ করতে সম্মত হবে ধরে নিই। আবরণ হিসাবে য়ুব থিওজফিস্ট লীগের দুই-একখানা বই দিয়ে আসি। সেটা যে কতখানি বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল তা বুঝি শিলিগুড়ি ফেরার মাসখানেকের মধ্যে। ফিরে সঙ্গে সঙ্গেই পরেশকে চিঠি দিই। চিঠিতে খোলাখুলি সমিতি সম্বন্ধে কোন কথা লেখা না থাকলেও দেশপ্রেমের রোম্যান্টিক অভিব্যক্তি কিছুটা ছিল। চিঠি যে পরেশের বাবার হাতে পড়তে পারে স্বপ্নেও ভাবি নি। ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। রাজশাহীতে ফিরতে হবে। যাত্রার দুই-একদিন বাকী আছে। এমন সময় একদিন পরেশের বাবা আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত। বড়দার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে তাঁর কি সব কথাবার্তা হল। দুপুরে আমাদের বাড়িতেই স্নানাহার করে ভদ্রলোক সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে গেলেন। বড়দা তখন আমাকে ডেকে বলেন ভদ্রলোক অভিযোগ করতে এসেছিলেন যে, আমি তাঁর ছেলেকে স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছি। আমার চিঠি আর য়ুব থিওজফিস্ট লীগের বইগুলি তিনি বড়দাকে দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন। আমি যে বিপ্লবী দল দূরে থাকুক, অহিংস স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখতে পারি তা তখন পর্যন্ত বড়দার ধারণার বাইরে। তাই প্রথমটা তিনি একটু হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন। পরে থিওজফির বইগুলি দেখে একটু আশ্বস্ত হন এবং পরেশের বাবাকেও আশ্বাস দিতে সমর্থ হন। তবু আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বড়দা বলেন: "মনে দেশপ্রেম থাকা ভাল কিন্তু কোন কিছুর সঙ্গে যেন জড়িয়ে না পড়। লেখাপড়া করছ, একাগ্রমনে তাই করে যাও।" আমার ভাবী জীবন সম্বন্ধে তিনি কল্পনায় যে ছক এঁকে রেখেছেন সে সম্বন্ধে আভাসও দিলেন। উচ্চ সম্মানের সঙ্গে কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বি-সি-এস প্রতি-যোগিতা পরীক্ষা দিতে হবে। তাঁর নিজের হাকিম হওয়ার যে স্বপ্ন ছিল সেটা যেন ছোট ভাইয়ের মধ্য দিয়ে সার্থক হয়। আমরা দরিদ্র পিতার সন্তান সে

কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, বড় দু'ভাই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁদের কলেজে পড়ার খরচ চলেছে স্কলারশিপ আর টিউশনির টাকায়। অনেক কষ্ট করে শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। ওকালতী ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভের আগে পর্যন্ত দীর্ঘকাল কৃচ্ছ্র সাধন করতে হয়েছে। সেই তুলনায় ছোড়দাকে এবং আমাকে কোন কষ্টই ভোগ করতে হয় নি। কলেজে পড়ার জন্য কারুর সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় নি। অতএব এই সুযোগের যেন সদ্ব্যবহার করি। দাদার উপদেশ নীরবে শুনে যাই। একদিন হয়ত তাঁদের স্বপ্নভঙ্গ হবে কঠিন আঘাতে। আজ সেই সুদূর সম্ভাবনার কথা তুলে তাদের মনে ব্যথা দিয়ে কি হবে? নিজের জন্য ভৎর্সনা আর অশান্তিই বা ডেকে আনি কেন?

রাজশাহীতে ফিরে আসার কিছুদিন পরে বীরেনদা ডেকে বলেন যে, কলেজ ইউনিয়নের আসন্ন নির্বাচনে আমাকে আমাদের ক্লাসের প্রতিনিধিপদের জন্য প্রার্থী হতে হবে। সমিতি থেকে যে কয়েকজনকে কলেজ ইউনিয়নে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাবার জন্য বাছাই করা হয়েছে সে তালিকায় আমার নাম আছে। আমাকে মনোনয়ন দেওয়ার কারণও আছে যথেষ্ট। ততদিনে ভাল ছাত্র হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছি। প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছি আন্তঃহোস্টেল ইংরাজী বিতর্ক প্রতিযোগিতায়। ইংরাজী ও বাংলার অধ্যাপকদের স্নেহধন্য হয়েছি। ভর্তি হয়েছিলাম বিজ্ঞান শাখায়। কিন্তু বার্ষিক তথা সাপ্তাহিক পরীক্ষাগুলিতে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে সমর্থ হয়েছি ঐ দুটি বিষয়ে। অধ্যাপকেরা জোর দিয়ে বলেন যে, আই-এস-সি পাশ করার পর যেন অতি অবশ্য বি-এ পড়ার সিদ্ধান্ত করি। তাহলেই আমার প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত সুযোগ পাবে। অধ্যাপকদের উৎসাহ ও সহায়তায় তখন থেকেই বি-এ ক্লাসের ইংরাজী এবং বাংলা পাঠ্যক্রম পড়া শুরু করে দিয়েছি। সহপাঠিদের চোখেও সম্মানের আসন দখল করেছি। সমিতি থেকে অন্য যে কয়েকজন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে তারাও বেশ জনপ্রিয়। মোটের উপর সবাই সাফল্য অর্জন করে। বীরেনদা হল কলেজ ইউনিয়নের সম্পাদক। এই সময় থেকে আমার জীবনে শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। হীনমন্যতার ভাবটা কাটিয়ে উঠেছি। মুখচোরা লাজুক ছেলের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতে হয় সকলের সামনে। নাম-ভূমিকা অর্জন করতে অনেক দেরি। তবু ত এসে দাঁড়িয়েছি বহু ছেলের চোখের সম্মুখে, একেবারে প্রথম সারিতে। কলেজ ইউনিয়নের কাজের মধ্যে

রাজনীতির নামগন্ধ থাকার অবকাশ নেই। কিন্তু নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বহু ছেলের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ অনেক বেশি। যাদের সমিতির সম্ভাব্য 'রিক্রুট' বলে বাছাই করা হয় তাদের সঙ্গে সংযোগস্থাপনের অজুহাত এখন সহজেই মেলে। কোন না কোন কাজের ভার দিয়ে তাদের দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলাজ্ঞান ও কর্মনিষ্ঠা যাচাই করা সহজ হয়। সমিতি থেকে এতদিন পরে আমার উপর বিশেষ ভার দিয়েছে বলে গর্ব বোধ করি। সহকর্মীদের সঙ্গে পরিচয়ের গণ্ডি প্রসারিত হয়। শহরের যেসব ছাত্র সমিতির সভ্য তাদের কয়েকজনের সঙ্গে পরিচিত হই। দিনগুলির চলার ছন্দে সঞ্চারিত হয় গতি-বেগ। সেই সঙ্গেই দেখা দিতে থাকে নানা ধরনের সংঘাত, বাইরে এবং মনের জগতে।

প্রথম সংঘাত শুরু হয় প্রণববাবুদের সঙ্গে, নিউ হোস্টেল ইউনিয়নের প্রতিনিধি এবং সম্পাদক নির্বাচন উপলক্ষ্যে। প্রণববাবুরা চান যে, হোস্টেল ইউনিয়ন হুজুগ-প্রিয় অর্থাৎ স্বদেশী মনোভাবাপন্ন ছেলেদের প্রভাব-মুক্ত হোক। আমি হোস্টেল ইউনিয়নে ব্লকের অন্যতম প্রতিনিধি। সম্পাদক নির্বাচনের সময় প্রণববাবুর মনোনীত প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে দিই সমিতির নির্দিষ্ট প্রার্থীকে। ফলে প্রণব বাবু এবং তাঁর ভক্তরা আমার উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। কার্যত, ব্লকে যেন একঘরে হয়ে পড়ি।

এর পরে আরো কত সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সে তুলনায় একেবারে গোড়ার ঘটনাটিকে আজ মনে হয় কত তুচ্ছ। তবু সেটাই ছিল প্রথম আঘাত। আশেপাশের মানুষগুলির যুক্তিহীন অসহিষ্ণুতা আর সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে সংঘর্ষের সেই ত প্রথম অভিজ্ঞতা। তার উপর একেবারে একলা মোকাবিলা করতে হয়েছে। শুনেছিলাম যে, অতীত যুগের বিপ্লবীরা ঘর ছেড়ে পথে বার হওয়ার সময় মন্ত্র হিসাবে নিতেন কবিগুরুর সেই গানটিকে "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে"। যাকে সত্য বলে বুঝেছি তার জন্য প্রয়োজন হলে একলা চলার ঝুঁকি ত নিতে হয়েছে অনেককেই। হয়ত আমার বেলায় প্রথম পরীক্ষা হয়ে গেল এইভাবে। অবশ্য অল্পকালের জন্য। কিছু-দিনের মধ্যেই প্রতীক্ষিত সহকর্মী এসে পৌঁছায়। সুরেন দাশগুপ্ত তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। বয়েসে আরো একটু বড়। সমিতির নেতারাই তাকে এখানে পাঠিয়েছেন। বীরেনদা এই বৎসর কলেজের পড়া শেষ করে চলে যাবেন।

হোস্টেলে ও কলেজে সুরেনকেই তাঁর স্থান গ্রহণ করতে হবে। সে পূর্ববঙ্গে দুই একটি জেলায় ছাত্রদের মধ্যে সংগঠন-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। তাই তাকে এখানে পাঠানো। সংগঠক হিসাবে আমার মধ্যে যেসব গুণের অভাব ছিল সেগুলি সুরেনের মধ্যে রয়েছে অনেক বেশি পরিমাণে। সে শুধু ভাল ছাত্র এবং সুবক্তাই নয়—খুব মিশুক, চটপটে, খেলাধূলায় তৎপর। তার দিল-খোলা হাসির আওয়াজ সারা নিউ হোস্টেলকে সরগরম করে তোলে। তাই অল্পদিনের মধ্যেই সে ছেলেদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে আমার যথার্থ অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতে অবশ্য কিছুদিন সময় নিয়েছে। তবু তার প্রকৃত পরিচয় জেনে এবং এইরকম একজন সহকর্মী পাশে থাকায় বুকে বল পাই। পরে যখন ধীরে ধীরে পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়েছি তখন সুরেন দাশগুপ্তর সাহচর্য আমার চিন্তার বিকাশে দিকচিহ্ন হিসাবে কাজ করেছে। সমিতির কাজে তার অভিজ্ঞতাই যে বেশি শুধু তাই নয়। সেই অধ্যায়ে বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীদের মন তোলপাড় করে দেখা দিতে শুরু করেছে যেসব প্রশ্ন আর মতদ্বন্দ্ব—সেগুলির সঙ্গেও সে পরিচিত। তখন বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে দেখা দিয়েছে এক নতুন যুগসন্ধির সঙ্কট। উত্তরণকালীন অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য-গুলি পরিস্ফুট। চিন্তায়, সংগঠনের কায়দায়, কাজের ধরনে, ভাবী কর্মপন্থা সম্বন্ধে ভাবনায় অতীতের জেরগুলি প্রবলভাবে বিদ্যমান। অন্যদিকে নবযুগ-চেতনার প্রভাবে দেখা দিয়েছে নতুন মত ও পথের সন্ধান। নতুন সম্বন্ধে পরি-প্রেক্ষিত স্পষ্ট নয়। অতীত সম্বন্ধেও ধারণা পরিষ্কার বলা চলে না। কিছু কিছু প্রশ্ন নিয়ে সুরেন আসার আগেই আমার সহকর্মীচক্রের মধ্যে মাঝে মাঝে আলোচনা উঠতে শুরু করেছিল। বীরেনদার কাছে শুনেছি যে, আমাদের আগের যুগের কর্মীদের এসব প্রশ্ন করার কোন অধিকার ছিল না। তারা জানত, নেতাদের কাছ থেকে যে নির্দেশ আসবে তাকে নির্বিচারে পালন করতে হবে। সেই প্রথম যুগে এই রকম কঠোর সামরিক শৃঙ্খলার প্রয়োজন ছিল বুঝি। কিন্তু এখন যে নানা প্রশ্ন অনাহুতভাবে সামনে এসে উপস্থিত হচ্ছে—নিছক শৃঙ্খলার কথা বলে ত সেগুলিকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। সুখের বিষয় বীরেনদা ছিলেন অন্য ধরনের। যখন যা জিজ্ঞাসা করেছি, যথাসম্ভব তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তর্ক বাধত বিশেষ করে বন্ধু রামকৃষ্ণের সঙ্গে। সে নেতাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের মনোভাবকে আঁকড়ে ধরে

রয়েছে। সুরেন ঠিক বিপরীত। সে নেতাদের তীব্র সমালোচনা করে : রামকৃষ্ণের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই তাকে ভালবাসি। কিন্তু তার মধ্যে যখন অসহিষ্ণু গোঁড়ামি অত্যন্ত উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে তখন এক এক সময় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

সুরেন আসার আগে পর্যন্ত সহকর্মীদের মধ্যে যে সব বিতর্ক হত তা প্রধানত রাজনৈতিক ডাকাতি আর ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। নির্মল এবং আরো দুই একজনের মতে ঐ ধরনের কার্যকলাপ যে শুধু নিস্ফল তাই নয়—আন্দোলনের বর্তমান অধ্যায়ে সেগুলি ক্ষতিকর। নিজেদের মধ্যে যখন মীমাংসা হয় না, তখন বীরেনদার দরবারে হাজির হই। অন্ধকারে কলেজের মাঠের নিভৃত কোণে বসে কথা হয়। বীরেনদা নিজেও এগুলির পক্ষপাতী নন। 'তিনি বাঙলায় বিপ্লববাদ' বইটির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, বিপ্লবীরা কখনই ডাকাতিকে খুব পছন্দ করে নি। তবে অনেক সময় অর্থ-সংগ্রহের জন্য নিরুপায় হয়ে ঐ পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ডাকাতির পথ নিতে হয়েছে, কর্মীদের বিরুদ্ধে সরকার যে সব ষড়যন্ত্র-মামলা দায়ের করেছে, তাতে উকিল-ব্যারিস্টারের খরচ যোগাবার জন্য। তিনি বলেন পরবর্তীকালে এইরকম একটা মত গড়ে উঠতে শুরু করেছিল যে, ডাকাতি যদি করতেই হয় তবে লক্ষ্য হওয়া উচিত সরকারী ট্রেজারি ইত্যাদি। তাতে দেশের মানুষের সমর্থন পাওয়া যাবে, আবার সরকারের বিরুদ্ধে আঘাত হানাও হবে। ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের প্রশ্ন নিয়েই মতান্তর প্রবলভাবে দেখা দেয়। বীরেনদা বলেন ওটা হল আন্দোলনের শৈশবের ধর্ম। যখন দেশবাসী মোহনিদ্রায় অভিভূত ছিল তখন 'আপনি মরে' মরার দেশে বরাভয় আনার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল ঐসব দুঃসাহসিক অনুষ্ঠানের। আজ যখন গণমনের জাগরণ অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে তখন ঐ পদ্ধতি অনুসরণ নিরর্থক।

রামকৃষ্ণ একথা মানতে চায় না। সে স্বীকার করে না যে, ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। সে বলে, 'বিদেশী শাসকের অত্যাচার যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তার মোক্ষম এবং আশু জবাব দেওয়ার এটাই একমাত্র উপায়। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলনের সময় বহু কর্মী বর্বর পুলিশ জুলুমের শিকার হয়েছে। দেশবরেণ্য নেতারাও রেহাই পান নি। পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু হয়েছে পুলিশের নির্মম লাঠির আঘাতেরই

পরিণতি হিসাবে। ব্যক্তিগত সন্ত্রাস ছাড়া এ সবের প্রতিশোধ নেওয়ার আর কি উপায় আছে' ? বিতর্কের কোন পরিষ্কার মীমাংসা হয় না। বীরেনদা শুধু বলেন যে, আমাদের সমিতি বহুদিন হল ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের নীতি বর্জন করেছে। দাদাদের পরিকল্পনা—উপযুক্ত সুযোগ এলে সারা দেশে একসঙ্গে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানো হবে। সম্ভবত আবার যখন মহাযুদ্ধ শুরু হবে সেই সময়ে। এখন চালিয়ে যেতে হবে তার জন্য একাগ্র প্রস্তুতি। আমাদের সবারই মনে প্রশ্ন জাগে। মহাযুদ্ধ আবার কবে শুরু হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় দিন কাটানোই কি হবে আমাদের কাজ? তরুণ মন কি সেই ভরসায় শান্ত হয়ে থাকতে পারে? আমি বিশেষভাবে জানতে চাই যে, গণ-আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব কি হবে? আমরা অহিংস মন্ত্রে বিশ্বাসী নই। কিন্তু দেশজোড়া যে গণবিক্ষোভের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠার লক্ষণ দেখা যায় তাতে আমাদের ভূমিকা কি হবে? আমরা কি শুধু সেই অশান্ত সাগরের কূলে দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখব? বীরেনদা বলেন, 'আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন এমন একজনের সঙ্গে খুব শীগগিরই দেখা করিয়ে দেব'।

বীরেনদাকে বিভিন্ন সময়ে আরো নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেছি। আমার অন্য বন্ধুরা সে সব প্রশ্ন সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। তাই যখন আমি একলা তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম তখনই ঐ প্রসঙ্গগুলি উত্থাপন করতাম। এমনি দুই একটি বিষয়ের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি। "বাঙলায় বিপ্লববাদ" বইটিতে পড়েছিলাম গুপ্ত সমিতির সভ্য হওয়ার জন্য পর্যায়ক্রমে কয়েকটি দীক্ষা এবং শপথ-গ্রহণ ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পার হতে হত। আমাকে সেসব কিছুই করতে হয় নি। বীরেনদাকে জিজ্ঞাসা করতে বলেন যে, আন্দোলনের গোড়ার যুগে ঐসব নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু এখন সে রেওয়াজ উঠে গিয়েছে। কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন তখনকার আবহাওয়ায় ধর্মের প্রভাব ছিল খুব বেশি। তাই মনে করা হত যে মন্ত্রগুপ্তি ও বিপ্লবীদলের শপথ সম্বন্ধে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দীক্ষিত হলে কর্মী তার মর্যাদা রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। সে-যুগে বিপ্লব সম্বন্ধে ধারণা অনেকের কাছেই ছিল অস্পষ্ট। আবেগই ছিল প্রধান সম্বল। যাঁরা স্বেচ্ছায় দুঃখকষ্ট বরণের ও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ধরার সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে চলতেন দুর্গম পথে,

তাঁরা প্রেরণা সন্ধান করতেন আধ্যাত্মিকতার মাঝে। তবু সেই প্রথম যুগেও বিপ্লবীদের কাছে ধর্মের বহিরঙ্গ দিকটার কোন মূল্য ছিল না। বরং যে সব ধর্মীয় ধারণা মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই তাঁরা এগিয়ে আসতেন। যাত্রা-অযাত্রা, মঙ্গল-অমঙ্গল, জাত-অজাত, ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার প্রভৃতি কুসংস্কারকে অস্বীকার করে শুরু হত তাঁদের পথচলা। গুপ্ত আশ্রয়ে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের ছেলে একই থালায় ভাত খেয়েছে। ফেরারী বিপ্লবী নেতা মুসলমান মাঝিমাল্লাদের মধ্য থেকে তাদের একজন হয়ে জীবনযাপন করেছেন।

বীরেনদার কথা থেকে বুঝি বিপ্লবী নেতারা আধ্যাত্মিক ছিলেন এই অর্থে যে, নিজের জন্য কিছুই না চেয়ে, নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়ার শিক্ষা পেয়েছিলেন নিষ্কাম কর্মযোগে। বিপ্লবীদের চোখে দেশই ঈশ্বর আর দেশসেবাই ছিল সব চেয়ে বড় ধর্ম। তাঁরা ত পুণ্য-অর্জনের জন্য গীতাপাঠ করতেন না। গীতায় মাত্র ধর্মের কর্তব্য পালনের জন্য যে আহ্বান রয়েছে সেটাকেই সেদিনের বিপ্লবীরা বড় করে দেখেছিলেন। অনেকে ধর্মীয় শিক্ষাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন, দেশবাসীর ভীরুতা আর জড়তা দূর করে সংগ্রামের পথে টেনে আনার উদ্দেশ্যে। বালগঙ্গাধর তিলক মান্দালয় জেলে বসে গীতার নতুন ভাষ্য রচনা করেন এবং তার নামকরণ করেন "কর্মযোগরহস্য"। অনুশীলনের প্রথম সারির নেতা মহারাজ অর্থাৎ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীও জেলে বসে লিখেছিলেন "গীতায় স্বরাজ্য"। তাতে তিনি গীতার উক্তিকে ব্যাখ্যা করেছেন স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের সমর্থনে। এইসব কারণেই সেদিন পুলিশ কোন বাড়ি খানাতল্লাসের সময় উপরোক্ত বইগুলি—এমনকি গীতা পর্যন্ত—হাতে পড়লে বাজেয়াপ্ত করত।

আমার মনের উপর তখন যে ধরনের আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ছিল তাতে এই বক্তব্যে আমি সন্তুষ্ট হয়েছিলাম।

বীরেনদা আরো বলেন যে, বিপ্লবী আন্দোলন এখন শৈশব ছাড়িয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে এসেছে। এখন আমরা দেশবিদেশের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস পড়ে বিপ্লব সম্বন্ধে জানার ও বোঝার চেষ্টা করছি। তাছাড়া, বর্তমানে কাজের ক্ষেত্র অনেক প্রসারিত হয়েছে, বহুমুখী হয়েছে। আগের দিনের তুলনায় দেশের মানুষের মনে, বিশেষত তরুণদের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা

দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। এখন কংগ্রেস থেকে শুরু করে নানা ধরনের প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। ঐসব কাজের মাধ্যমে এখন কর্মীদের যাচাই করে নেওয়া সম্ভব হয়।

৩৩ দিনে বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীদের সবাই মুক্তিলাভ করেছেন। স্বদেশীভাবাপন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। ব্রিটিশ রাজ কেন জানিনা সাময়িকভাবে দমননীতির বজ্রমুষ্টি খানিকটা শিথিল করে দিয়েছে। খবরের কাগজে চোখে পড়ে স্থানে স্থানে মুক্ত বন্দীদের সংবর্ধনার সংবাদ। অনুশীলন সমিতির প্রথম সারির অন্যতম নেতা প্রতুল গাঙ্গুলী রাজশাহী সফরে আসবেন। জেলা কংগ্রেস ও যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর সাদর অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছে। যুগান্তর দলের স্থানীয় কর্মীরাও প্রস্তুতি কমিটিতে যোগ দিয়েছে। ততদিনে জেনেছি যে, কালুদা যুগান্তর দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু রাজশাহী জেলা কংগ্রেস কমিটিতে উভয় দলই তাঁর নেতৃত্বে একত্রে কাজ করে। প্রতুল গাঙ্গুলী এসে তাঁরই অতিথি হবেন।

বিপ্লবী নায়ক এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ইউনিফর্ম পরা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সামরিক কায়দায় নেতাকে অভিবাদন জানায়। বিকেলে ভুবনমোহন পার্কে সংবর্ধনা সভা। আমার উপর পড়েছিল অভিনন্দন-পত্র রচনার ভার। কি লিখেছিলাম আজ স্মরণ নেই। তবে এই ভার পেয়ে গর্বে বুক ভরে উঠেছিল। মনের আবেগ লেখনীর মুখে উৎসারিত হয়েছিল নির্ঝরধারার মতই স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দে। সভায় মানপত্রটি পাঠ করেছিল অন্য একজন। তবু শুনতে শুনতে আনন্দের সীমা থাকে না। আমারই রচনা আজ সর্বজনসমক্ষে পড়া হচ্ছে। উদ্দীপ্ত করে তুলছে শত শত মানুষকে। সভায় প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে জিতেশ লাহিড়ীকেও অভিনন্দন জানানো হয়। জিতেশদা রাজশাহী জেলারই সন্তান। অগ্নিযুগে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছেন। দুজন নেতার কারুরই বাইরের চেহারা দেখে বোঝা যায় না যে, এদের কার্যকলাপে প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সদাসন্ত্রস্ত। শান্ত, সৌম্য মূর্তি। বাহিরে শান্ত, ভিতরে রুদ্র। নেতাদের কেউই অগ্নিবর্ষণ করেন না বক্তৃতার মাধ্যমে। তাঁরা বলেন, "বক্তৃতা করার অভ্যাস ত আমাদের নেই। তাই শুধু দুই একটা কাজের কথাই বলি। সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। ছাত্র ও যুবকদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে সামরিক শৃঙ্খলায়।" নাই বা হল অগ্নিবর্ষণ। তাঁদের কথা শুনতে শুনতে মন

চলে যায় বহুদূরে। এঁরাই ত অগ্নিমন্ত্রের উদগাতা, মুক্তিপথের অগ্রণী সৈনিক. এঁদের মতন অনেকের জীবনের উপাদান নিয়েই ত শরৎবাবু সৃষ্টি করেছেন সব্যসাচীর মতন মহাশক্তিধর চরিত্র। তখনও ভাবতে পারি নি যে, আমার জন্য কি বিস্ময় আর আনন্দ অপেক্ষা করে রয়েছে। গভীর রাতে নির্মল এসে ঘুম ভাঙিয়ে বলে বীরেনদা ডেকে পাঠিয়েছেন। ভাবি এত রাতে হঠাৎ কি দরকারে জরুরী তলব। নতুন কোন পরীক্ষা? বীরেনদার রুদ্ধদ্বার কক্ষের ভিতরে ঢুকেই থমকে যাই। পা যেন সরতে চায় না। নির্মলেরও সেই অবস্থা। প্রতুলদা আর জিতেশদা বসে রয়েছেন। বীরেনদা আমাদের পরিচয় দিয়ে বলেন, 'যা কিছু জানার আছে এবার অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করুন'। কিন্তু বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়ে ওঠে না। এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চকর অনুভূতি সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। রাতের অন্ধকারে সবার নজর এড়িয়ে দুজন মার্কামারা রাজবিদ্রোহীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। এ এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। যাঁরা এতদিন বিরাজমান ছিলেন শুধু বই বা পত্রিকার পৃষ্ঠায়, অথবা বন্ধুদের মুখে শোনা কাহিনীতে, এখন তাঁদের সঙ্গে একাসনে বসে কথা বলছি। পুণ্যলোভীরা তীর্থদর্শনে যে আনন্দলাভ করে তার চাইতে অনেক বেশি কিছু পেয়ে গিয়েছি। তবু সসঙ্কোচে দুই একটা প্রশ্ন উত্থাপন করি। প্রতুলদা খুব সহজভাবে উত্তর দিলে আড়ষ্টতা কেটে যায়। আলোচনা অবশ্য বেশিক্ষণ চলে না। রাত অনেক হয়ে চলেছে। প্রতুলদা বলেন, "জিতেশ এখন থেকে রাজশাহী শহরেই বেশির ভাগ সময় থাকবে। তার কাছেই পাবে তোমাদের সব কথার উত্তর।" আমি শিলিগুড়ির ছেলে শুনে তিনি বলেন পরের দিন রাতে একলা দেখা করতে। এটাকে আমার বিশেষ সৌভাগ্য বলেই মনে করি। পরের রাতে যা কিছু কথা হয় নেতারই দিক থেকে। পার্বত্য অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে তিনি যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে জানতে চান। অনুমান করে নিই যে, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কোন পরিকল্পনায় আমাদের ঐ অঞ্চল একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করবে।

প্রতুলদা চলে যাওয়ার কিছুদিন পরে সুরেনের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়। সুরেন দাদাদের ভক্ত নয় মোটেই। তার কাছেই প্রথম শুনি যে, বিভিন্ন বিপ্লবী-দলের তরুণ কর্মীদের মধ্যে দাদাদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠছে। তরুণেরা বলে কবে আবার মহাযুদ্ধ শুরু হবে তার জন্য অনিশ্চিত অপেক্ষায়

বসে থাকা মানে আসলে কিছু না করা। দাদারা এখন আর কোন ঝুঁকি নিতে চান না, তাই কর্মীদের ঐসব কথা বলে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা। জিজ্ঞাসা করি, 'কি করতে চায় এই বিদ্রোহীরা'? সুরেন বলে, তাদের ধারণাও খুব স্পষ্ট নয়। নানা ধরনের ঝোঁক রয়েছে তাদের মধ্যে। বেশির ভাগ আয়র্লণ্ডের ইস্টার বিদ্রোহের ধরনে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখছে। দুই একদিনের জন্য হলেও যদি কয়েকটি শহরে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে সরকারের ঘাঁটিগুলি দখল করা যায় তাহলে সেটা হবে আমাদের দেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। সরকারী ভবনগুলির উপর জাতীয় পতাকা উড়িয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হবে। তারপর হয়ত সম্মুখসমরে মৃত্যুবরণ করতে হবে সবাইকে। তবু ত দেশবাসীকে দেওয়া যাবে নতুন পথের সন্ধান। ছোট ছোট দুই একটি দল বা গ্রুপ ভাবছে অন্য কথা। তারা অত বড় পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামায় না। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে আর একটা আন্দোলন আসন্ন হয়ে উঠেছে। আন্দোলন দমনের জন্য ব্রিটিশ সরকার জনসাধারণের উপর দমননীতির রথচক্র চালিয়ে দেবে। তার জবাব দিতে হবে যথোচিত উপায়ে অর্থাৎ সরকারী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের পাল্টা সন্ত্রাসে।

সুরেন নিজে ঐগুলির কোনটারই পক্ষপাতী নয়। সে বলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে অস্ত্র আসবে কোথা থেকে? প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানি থেকে অস্ত্র আমদানির প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটাবার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। সব দেশের ইতিহাসে দেখা যায় যে, সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে গণ-বিপ্লবী আন্দোলন বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরে। গণ-বিপ্লবের ধারণা অবশ্য তারও যে তখন খুব পরিষ্কার তা নয়। সে "ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজাণ্টস পার্টি'র দুই একটি ইস্তাহার পড়ার সুযোগ পেয়েছে। আর তারই ভিত্তিতে একটা ধারণা গড়ে তুলেছে। 'ওয়ার্কাস' পার্টি'র নাম প্রথম শুনি তারই মুখে।

রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের কথা সবে কানে এসেছে। গোপন পথে কয়েকখানা বইও হাতে পেয়েছি "Illustated History of the Russian Revolution", "Through the Russian Revolution", "Ten Days That Shook World" ইত্যাদি। মাকসিম গোর্কির 'Mother' বইটিও মনের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ভাসাভাসাভাবে বুঝি যে, রাশিয়াতে যা হয়েছে তা

এক নতুন ধরনের বিপ্লব। বঞ্চিত মানুষেরা নিজেরাই করেছে এই বিপ্লব আর রাষ্ট্রক্ষমতা এসেছে তাদেরই হাতে।

বলশেভিক বিপ্লবের একটি বৈশিষ্ট্য সেদিন আমাদের মনকে সবচেয়ে বেশি দোলা দিয়েছিল। নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্র তার জন্মলগ্নেই ঘোষণা করেছে, সমস্ত পরাধীন জাতির স্বাধীনতার অধিকার। তারা গায়ের রংয়ের বাছবিচার না করে সমস্ত মানুষকে দিয়েছে সমান মর্যাদা। এর আগে নবীন তুরস্ক, চীন, পারস্য, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে যে সব বই পড়েছি, তার মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার উল্লেখ পেয়েছি। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ঐ সব দেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রাশিয়া। তখন সেই ঘটনার তাৎপর্য নিয়ে মাথা ঘামাই নি। এখন রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পড়ে এই ধারণাটা মনে দানা বাঁধতে শুরু করে যে, বলশেভিক রাশিয়া হল পরাধীন দেশগুলির মুক্তি-সংগ্রামের বন্ধু।

যা পড়েছি তা নিয়ে দুজনে চিন্তা-বিনিময় করি। যেটুকু বুঝেছি তাকে তখনকার মানসিকতার রঙে রঙীন করে নিই। এতদিন অস্পষ্টভাবে হলেও বুঝেছিলাম যে, স্বাধীনতা মানে শুধু বিদেশী শাসনের অবসান নয়—দেশের কোটি কোটি বঞ্চিত মানুষের দুঃখমোচন করতে পারলে তবেই স্বাধীনতার সার্থকতা। এখন বুঝতে শুরু করি যে, সেই মানুষগুলির একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে। কি সে ভুমিকা, কি ভাবে তারা তা পালন করবে, সে সব কথা তখনও পরিষ্কার নয়। তবু সুরেন বলে যে, শুধু এই বিশ্বাসের জন্যই আমাদের সহকর্মীদের সঙ্গে বহু মত-সংঘাতের সম্মুখীন হতে হবে। দাদারা ত এসব ধারণাকে সুনজরে দেখেনই না। এমন কি যারা দাদাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তাদেরও অনেকে পছন্দ করে না। তাদের মতে যারা বিপ্লবের বিপদসঙ্কুল পথ থেকে দূরে সরে যেতে চায় তারাই নাকি গণ-বিপ্লবের ধুয়া তুলছে।

সুরেনের কাছেই জানতে পারি যে, পূর্ববঙ্গে গোপেন চক্রবর্তী, ধরনী গোস্বামী প্রভৃতি অনুশীলনের কয়েকজন অগ্রণী কর্মী সমিতির সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করে ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। একথা শুনে কমিউনিস্ট মতবাদ এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে জানার কৌতূহল জাগ্রত হয়। কোন্ নতুন মত ও পথের সন্ধান দেয় সেটা, যার জন্য

সমিতির মধ্যে থেকে কাজ করা সম্ভব হয় না? দাদারাই বা এত বিরূপ কেন? রুশ বিপ্লবের বিরাট সাফল্যের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া হবে নাই বা কি কারণে? রুশের নিহিলিস্টদের কথাই এতদিন শুনেছিলাম। কিন্তু যে-বিপ্লব সমাজ ও রাষ্ট্রের খোল-নলচে শুদ্ধ বদলে যুগান্তরের সূচনা করেছে তার সম্বন্ধে অনীহা হবে কেন? বিদ্রোহীদের মনোভাবের কথা আরো অদ্ভুত মনে হয়। তারা ত পুরাতন নেতৃত্বকে অস্বীকার করছে। তবে নতুনের এই মহান দিগন্তের দিকে মুখ তুলে চাইতে বাধা কোথায়? সুরেন বলে: 'দাদারা শ্রমিক ও কৃষকের বিপ্লবী ভূমিকার কথা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন যে, মধ্যবিত্ত ভদ্র তরুণেরাই নব চেতনার ধারক, তারাই সংগ্রামের অগ্রবাহিনী। এদের নিয়ে বিপ্লব শুরু করে দিলে তখন জনসাধারণ এগিয়ে আসবে। উপরন্তু তাঁরা সাম্যবাদী আন্দোলনকে দেখেন নিজেদের নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে।' শুনে মনে আঘাত পাই। কথাটা পুরোপুরি মেনে নিতেও পারি না। দাদাদের সবাই কি অনুরূপ মত পোষণ করেন? ভাবি, জিতেশদার সঙ্গে দেখা হলে হয়ত একটা সন্তোষজনক উত্তর পাব নিশ্চয়ই। বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে সুরেন বলে: "তারা এই মুহূর্তে মত ও পথের আলোচনা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। তারা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। কথা শুনেছে অনেক, বলেছে অনেক। এখন আর কথা নয়। দাদারা নিষ্ক্রিয়। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। আবার যদি আন্দোলন শুরু হয় তবে তারও ঐ পরিণতি ঘটবে, নতুবা পরিসমাপ্তি হবে গভর্ণমেন্টের সঙ্গে আপস মীমাংসায়। তাই এখন প্রয়োজন সমস্ত শক্তি সংহত করে বিদেশী শাসককে প্রচণ্ড আঘাত হানা। তারপর যারা বেঁচে থাকবে তারা পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য নতুন মত ও পথের চিন্তা করবে।"

সেই সময়টাতে তরুণদের মধ্যে রোমান্টিক আবেগটাই প্রবল। বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে ত বটেই। যারা সাধারণভাবে স্বদেশী ভাবাপন্ন তাদের মধ্যেও দেখি অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই প্রবণতা। সভা ও সমাবেশে বক্তাদের কেউ হয়ত ভাষণ শুরু করেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে—"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই ওরে ভয় নাই। নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।" যুবশক্তিকে জাগ্রত করার জন্য তারুণ্যের প্রতিনিধিরা তুলে ধরেন জার্মান দার্শনিক নীটশের উক্তি "Live dangerously"। সংগঠিত

ছাত্র আন্দোলন কণ্ঠে তুলে নিয়েছে বিদ্রোহী কবি নজরুলের গান—"দারুণ রাতে আমরা তরুণ রক্তে করি পথ পিছল—মোরা তাজা খুনে লাল করেছি সরস্বতীর শ্বেতকমল" উদ্ধত যৌবন শক্তি সব বাঁধন ভেঙ্গে চুরমার করে এগিয়ে চলার আগ্রহে উন্মাদ। কিন্তু সেই চলার পথের মোড়ে মোড়ে দেখা দেয় যে সব প্রশ্ন আর সমস্যা, সেগুলি নিয়ে তলিয়ে চিন্তা করে কজন? করতে চায়ই বা কতজনে? অধিকাংশকেই দেখি স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে চলাটাই পছন্দ করে। অথচ আন্দোলনে জোয়ার-ভাঁটা রয়েছে। ভাঁটার সময়ে শুধু আবেগ আর উন্মাদনা কর্মের প্রেরণা যোগাতে পারে না। সমস্যাগুলির উত্তর খুঁজে না পেলে সম্ভব হয় না পরবর্তী পদক্ষেপ। যারা সব কিছু বুঝে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে তাদের দাম দিতে হয় অনেক। বিপ্লবী কর্ম আর বিপ্লবী মননের মধ্যে সমন্বয় করতে যেয়ে অন্তরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্তাল হয়ে ওঠে। ঘটে বন্ধুর সঙ্গে মতান্তর কখনও বা বন্ধুবিচ্ছেদ। যারা পথ দেখাবে বলে ভরসা করি, তাদের নিজেদের কাছেও সব কিছু স্পষ্ট নয়। যুগের তাগিদে যে সব প্রশ্ন সামনে এসে হাজির হয়, সেগুলিকে সবাই এড়িয়ে যেতে পারে না। নতুনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা সম্ভব হয় না সকলের পক্ষে। কিন্তু চিন্তা ও ভাবনার মধ্যে প্রবল হয়ে হয়ে রয়েছে অতীতের পিছুটান।

আশেপাশের মানুষের চেতনার মধ্যে যে প্রবণতাটা প্রবল তার প্রভাবকে একেবারে কাটিয়ে ওঠাও সম্ভব হয় না। কৈশোরে ভেবেছি যে, আমি একলাই বুঝি হাতড়ে হাতড়ে পথের সন্ধান করে চলেছি। এখন দেখছি যুগটাই পথ হাতড়ে অগ্রসর হচ্ছে। এমনি ভাবেই বুঝি হয় নতুনের অগ্রগতি। পুরাতনের খোলসের মাঝ থেকে নবীনের অঙ্কুর মাথা তুলছে। অথচ তাকে বেশ কিছুকাল পুরাতনের ছায়ায় কাটাতে হয়। এগোতে হয় পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে। আজ এত বছর পরে যখন পিছনের দিকে ফিরে তাকাই তখন '২০-এর দশকের যুগসন্ধির সঙ্কটের চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সেদিন তা অত সহজ মনে হয় নি। সহজ ছিলও না। মত ও পথ নিয়ে বিতর্কের নানা উপাদান যেন হঠাৎ একসঙ্গে সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। কোনটিকে বেছে নেব তাই নিয়ে যেন শুরু হয়েছে তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা। স্বাধীনতা আন্দোলনে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির অভিজ্ঞতা থেকে সব কিছুর জবাব মেলে না। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে নতুন করে দক্ষিণ ও বামপন্থার দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। আমি

ভেবেছি দ্বন্দ্ব বুঝি শুধু ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস ও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বনাম পূর্ণ-স্বাধীনতার লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে। বিপ্লবীরা ত তাদের আন্দোলনের সেই আদি যুগেই পূর্ণ স্বাধীনতার পতাকা ঊর্ধে তুলে ধরেছে। তাই ডমিনিয়ন স্টাটাসের প্রশ্নটাকে আমল দেওয়ার প্রয়োজন দেখি না। সুরেন বলে দক্ষিণ ও বামপন্থার বিরোধের মূল আরও গভীরে নিহিত। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে আপস বা তার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম এই দুই মতবাদের পিছনে রয়েছে স্বাধীনতার স্বরূপ সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী ধারণা। স্বাধীনতার পর দেশের জীবনে কি কি মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে সে সম্বন্ধে দক্ষিণপন্থী নেতারা এখন স্পষ্ট করে কিছু বলতে রাজী নন। মহাত্মাজী ত সমস্ত প্রশ্নটাকেই ঢেকে রেখেছেন আধ্যাত্মিকতার কুয়াশার আবরণে। অন্যদিকে যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের শপথ নিয়েছেন তাঁদের মধ্য থেকে দাবী উঠেছে স্বরাজের সামাজিক প্রকৃতির রূপরেখা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে। জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসুর যুগ্ম সম্পাদকত্বে গঠিত হয়েছে 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ'। লীগের ঘোষণাপত্রে স্বাধীন ভারতে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কর্মসূচীর একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া দেওয়া হয়েছে। জহরলাল ও সুভাষচন্দ্র তখন তারুণ্যের প্রতিনিধি। 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' হয়ে উঠেছে বামপন্থী মনোভাবাপন্নদের মিলিত মঞ্চ। সে কর্মসূচী কতখানি যুগোপযোগী হয়েছে তা যাচাই করার মত বিচারশক্তি আমাদের দুজনের কারুরই হয়নি। তবু সেই খসড়াটি চিন্তার বিকাশে একটি দিকচিহ্নরূপে কাজ করে বৈকি। আজ আর সামাজিক মুক্তির কথাটা ধোঁয়াটে রেখে দেওয়া যে চলবে না এইটুকু অন্তত উপলব্ধি করি। শুনেছি যে প্রথম যুগে বিপ্লবী দলগুলির দ্বারা প্রকাশিত প্রকাশ্য বা গোপন ইস্তাহারে ভাসা-ভাসা ভাবে হলেও বিপ্লবের সামাজিক লক্ষ্যের কথা বলার চেষ্টা হত। অনুশীলন সমিতির পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হত ইংরাজীতে "লিবার্টি" আর বাংলায় "স্বাধীন ভারত" নামে বে-আইনী ইস্তাহার। বিপ্লবীরা কি চায় সে কথা দেশবাসীকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা হত ঐগুলির মাধ্যমে। শুনেছি, চোখে দেখার সুযোগ হয়নি। উত্তরকালে ইতিহাস রচনার কাজে লাগবে ভেবে কেউ ত সেগুলিকে রাখেনি সংগ্রহ করে। রাখাটাও ছিল বিপজ্জনক। সে যুগের বক্তব্য হয় হারিয়ে গিয়েছে নয়ত বন্দী হয়ে রয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ

বিভাগের ফাইলপত্রের মহাফেজখানায়। জানিনা কি বক্তব্য রেখেছিলেন সেদিনের বিপ্লব পথের পথিকেরা! কিন্তু বর্তমানে গণজাগরণের এই পটভূমিতে নতুন ভাবে চিন্তা করার বা বলার কিছুই কি নেই? লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ এসে প্রবেশ করেছে রাজনীতির ময়দানে। তাদের বুকের ভাষাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা কি বিপ্লবীরা করবে না? বিদ্রোহী কবির গানে শুনেছি—

"যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া ওঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে দিতে হবে অধিকার।"

কবি ত যুগের নির্দেশকেই ফুটিয়ে তুলেছেন সুরের মূর্চ্ছনায়। গত কয়েক বৎসর ধরে দেশের নানা শিল্পকেন্দ্রে বড় বড় শ্রমিক ধর্মঘট হয়ে গিয়েছে। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলনে শ্রমিকরা সংগঠিতভাবে যোগ দিয়েছে। বিদেশী রাজশক্তির দমনযন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করেছে তারা। শ্রমিক আন্দোলন বহন করে এনেছে এক নতুন শক্তির আবির্ভাবের ইঙ্গিত। এরা ত কারুর অনুকম্পার মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকবে না। তাদের অধিকার আদায় করে নেবে। এই শক্তির সঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলনের কি সম্বন্ধ হবে?

এমনি কত প্রশ্ন এসে হাজির হয় সামনে। আবার যারা বলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে এখনই একটা প্রচণ্ড আঘাত হানা দরকার তাদের কথাকেও ত একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না। যারা কোনরকম রাজনীতির সংশ্রব থেকে দূরে সরে রয়েছে তাদের মনে দেখেছি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের শক্তিমত্তার উপরে অটল বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। বড়দের কথা ছেড়েই দিলাম। ছাত্রদের মধ্যেও দেখি কিছু সংখ্যক স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে কিন্তু রাজরোষের ভয়ে ছায়া মাড়াতে চায় না। বাকি যারা, তারা নিজেদের ব্যক্তিগত বা পারিবারগত জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে মুখ গুঁজে থেকেই সন্তুষ্ট। জাতির জীবনে ঘটে চলেছে কত মর্মন্তুদ ঘটনা। সে সব বুঝি এতটুকু ছায়াপাত করে না এদের হৃদয়ে। আবার অতি-বিজ্ঞ সবজান্তার দলও আছে। বিপ্লবী আন্দোলন, কংগ্রেস আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন সব কিছুই তাদের চোখে উপহাসের বিষয়। তারা বৈঠকে বসে মুরুব্বি চালে মন্তব্য করে 'চরকা কেটে খদ্দর পরে পিকেটিং করে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ভিত্তি এতটুকু টলানো যাবে না।' আর বিপ্লবী আন্দোলন? 'সে ত নিছক

পাগলামি, দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরা। দুটো ভাঙা পিস্তল দিয়ে কি দেশোদ্ধার হয়?' শ্রমিক আন্দোলন ত এদের মতে কতকগুলি অশিক্ষিত কুলিমজুরকে ক্ষ্যাপানো ছাড়া আর কিছু নয়। একদিকে ভীরুতা অন্যদিকে বিদেশী শাসকের ছিটেফোঁটা দাক্ষিণ্য লাভের আশায় গোলামির মোহ এদের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে। দেখে শুনে এক এক সময় অসহ্য হয়ে ওঠে। ব্যঙ্গ বিদ্রূপে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। এইসব আধমরাদের ত ঘা মেরেই জাগাতে হবে। কবিগুরু ত তাই বলেছেন। শত দমন পীড়ন নির্যাতনও যে মুক্তিকামী বিপ্লবী-দের প্রতিরোধ চূর্ণ করতে পারে নি সেটা যদি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো যায় একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে, তবেই হয়ত এরা মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস পাবে।

গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা আর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ—দুটো যে একই সঙ্গে চলতে পারে না সে কথা সেদিন বুঝি নি। বুঝেছি বেশ কয়েক বৎসরের ব্যবধানে, কঠিন অভিজ্ঞতার মাসুল দেওয়ার পরে। দুই ধরনের কাজের মধ্যে কি ভাবে সমন্বয় করা যায় তারই উপায় খুঁজেছি সেদিন। ঠিক এই সময়ে হাতে এসে পড়ে উত্তর ভারতের "হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন" নামে পরিচিত গুপ্ত বিপ্লবীদলের গঠনতন্ত্র এবং "দি রেভোলিউশনারি" নামে ইস্তাহার। এই দুটিকে কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় আসামীদের বিরুদ্ধে দলিল রূপে সরকার পক্ষ উপস্থিত করে। বলা বাহুল্য দুটি দলিলই ছিল সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ। আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছে মুদ্রিত ইস্তাহারের হাতে-নকল করা কপি। তাও এসেছে কত গোপন সুড়ঙ্গ পথ পরিক্রমা করে। ঐ দুইটি প্রচারপত্রের মধ্যে যেন শুনি আমাদেরই তখনকার চিন্তার প্রতিধ্বনি। এক হিসাবে প্রশ্নের উত্তরও বটে।

গঠনতন্ত্রের সঙ্গে রয়েছে কর্মসূচী। সেখানে এ্যাসোসিয়েশানের কাজকর্মকে দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিভাগ হিসাবে সংগঠিত করার কথা বলা হয়েছে। একটি প্রকাশ্য, অপরটি গোপন। প্রকাশ্য বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ হবে বিভিন্ন কারখানায়, রেলওয়ে এবং কয়লাখনিতে শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলা। অনুরূপভাবে সংগঠিত করতে হবে কিষাণদেরও। শ্রমিক এবং কৃষকদের বোঝাতে হবে যে, বিপ্লব তাদেরই জন্য, তারা বিপ্লবের জন্য নয়। গোপন বিভাগের কাজ হবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি : বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ, যতদূর সম্ভব দেশে অস্ত্র নির্মাণের ব্যবস্থা, সেনাবাহিনীর মধ্যে নিজেদের লোক ভর্তির চেষ্টা ;

আর সেই সঙ্গে চলবে সরকারী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা; নতুবা সাধারণ মানুষের ভয় ভাঙ্গবে না। সম্প্রতি প্রকাশিত একজন খ্যাতনামা বিপ্লবীর স্মৃতিকথায় ঐ দুটি দলিলের বিস্তৃত বয়ান খুঁজে পেয়েছি।* কিন্তু থাক সে কথা। সেদিন যা বুঝেছিলাম আর সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যতটুকু স্মরণ ছিল তাই শুধু বলি। এ্যাসোসিয়েশনের মূল লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, সর্বজনীন ভোটাধিকারের এবং মানুষের উপর মানুষের শোষণের সমস্ত রূপের অবসানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ভারতীয় প্রজাতন্ত্র। এইটুকুই তখন আমাদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগামী পদক্ষেপ বলে সূচিত হয়েছিল। 'দি রেভোলিউশানারি' ইস্তাহারটি শুরু করা হয়েছে "Chaos is necessary for the birth of a new star" জার্মান দার্শনিকের এই বিখ্যাত উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে। মায়াবাদকে খণ্ডন করে বৈপ্লবিক কর্মের একটা দার্শনিক ভিত্তি রচনার প্রয়াসও হয়েছে। দেশবাসীকে ডাক দিয়ে বলা হয়েছে ভারতে এক নতুন শক্তির অভ্যুদয়ের কথা। সে শক্তি হল তরুণদের বিপ্লবী আন্দোলন, বিশ বৎসরের নিদারুণ অত্যাচারেও গভর্নমেণ্ট যার শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিতে পারে নি। সে আন্দোলন আজ এগিয়ে চলেছে অপ্রতিহত গতিতে। ভারতের যৌবন শক্তির কাছে আবেদন জানানো হয়েছে তারা যেন মোহনিদ্রা ভেঙ্গে জেগে ওঠে। স্বাধীনতা আসবে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পথে, বৈধ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে নয়। রুশের বলশেভিক বিপ্লবের আদর্শের প্রতিও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ইস্তাহারটির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অপপ্রচারের জবাব দেওয়া।

গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে সব সময় বিপ্লবীদের অভিহিত করা হত 'অ্যানর্কিস্ট', 'টেরোরিস্ট' ইত্যাদি বিশেষণে। দুঃখের বিষয় যে, শিক্ষিত দেশবাসীদের অনেকেই বিদেশী শাসকের অপপ্রচারকে নির্বিচারে মেনে নিয়েছিলেন। যারা বিপ্লবদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন তাঁদের মধ্যেই বা কজন জানবার চেষ্টা করেছেন যে, এরা সত্যি সত্যি কি চায়? কেউ বিপ্লবীদের দেশপ্রেম আর মৃত্যুহীন আত্মদানকে শ্রদ্ধা করেছেন। কেউ বা মুরুব্বির মত বলেছেন যে, এই সব ছন্নছাড়া সৃষ্টিছাড়া পাগল ছেলেরা শুধুই কঠিন পাষাণে মাথা কুটে

জীবনটাকে শেষ করছে। 'দি রেভোলিউশানারি' এইসব মিথ্যা প্রচার আর ভ্রান্ত ধারণার উত্তর দিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে: "সন্ত্রাসবাদ বা নৈরাজ্যবাদ আমাদের লক্ষ্য কখনই নয়। আমাদের উদ্দেশ্য সংগঠিত ও সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।"

সন্ত্রাসবাদ তাদের কর্মসূচীর লক্ষ্য বা প্রধান অঙ্গ না হওয়া সত্ত্বেও যে বিপ্লবীরা মাঝে মাঝে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করে সেটা নিতান্ত বাধ্য হয়ে। ব্রিটিশ প্রভু ও বশংবদ তাদের অনুচররা দেশবাসীর উপর বিনা প্রতিবাদে, বিনা বাধায় বলগাহীন অত্যাচার চালিয়ে যাবে তা কখনও হতে দেওয়া যায় না। ইস্তাহারটির পরিসমাপ্তিতে বলা হয়েছে যে, বিপ্লবী পার্টি গভর্নমেণ্টের সমস্ত প্ররোচনা সত্ত্বেও বর্তমানে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ থেকে বিরত রয়েছে। কারণ পার্টি এখন প্রস্তুত হচ্ছে শেষ আঘাত হানার জন্য। কিন্তু গভর্নমেণ্ট যদি তার দমননীতিকে সংযত না করে তাহলে পার্টি সন্ত্রাসের বে-পরোয়া অভিযান শুরু করতে বাধ্য হবে। অত্যাচারী অফিসার—ইউরোপীয় বা ভারতীয়—কেউ তার হাত থেকে নিস্তার পাবে না।

'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন'-এর সঙ্গে অনুশীলন সমিতির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক। অনুশীলন সমিতিই তার অন্যতম প্রথম সারির কর্মী যোগেশ চ্যাটার্জীকে উত্তরপ্রদেশে সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিল। তিনি স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করে ভিন্ন নামে দল গড়ে তোলেন। প্রচারপত্র দুটি সেদিন আমাদের মনের সামনে এক নতুন দিগন্তের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করেছিল। তাকে নবযুগচেতনার স্বীকৃতি রূপেই গ্রহণ করেছিলাম। যোগেশদার মত একজন প্রবীণ নেতা যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চান জেনে বুকে বল পাই। তাহলে দাদাদের কারুর কারুর মনে নিশ্চয়ই পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। কিন্তু দুই বিপরীতমুখী ধারার ভিতরে সমন্বয় যে কঠিন হবে তার কিছুটা আভাস সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাই। আমাদের সীমিত চক্রটির মধ্যেই ঐ দুটি প্রচারপত্র সম্বন্ধে একেবারে উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুর মতন উল্টো মনোভাব আত্মপ্রকাশ করে। সুরেন আর আমি একদিকে। নির্মলও আমাদের মতেই সায় দেয়। কিন্তু রামকৃষ্ণের জিদ অটুট রয়েছে। 'দি রেভোলিউশানারি'র শেষের বক্তব্যটুকুকেই সে আঁকড়ে ধরে। আমাদের মতামতকে আক্রমণ করে অত্যন্ত তীব্রভাবে। রামকৃষ্ণের সঙ্গে গোড়া থেকেই

একটা সংঘাত সত্ত্বেও এতদিন পর্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। এবার তাতে ফাটল ধরে। তার গোঁড়ামি এবং উগ্র অসহিষ্ণুতার জন্য তিক্ততার সৃষ্টি হয়। সুরেন বা নির্মলের সঙ্গে রামকৃষ্ণের তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। আমি বেশ আঘাত পাই। ব্যথাকে ভোলার জন্য স্মরণ করি কবিগুরুর গানের সেই ছত্রটিকে "আপন জনে ছাড়বে তোরে, তা বলে ভাবনা করা চলবে না।" কবি কি ভেবে লিখেছিলেন জানি না। আমাদের পূর্বসূরীরা ছত্রটিকে কণ্ঠে নিতেন আত্মীয়স্বজনের কোল ছেড়ে ঘরের মায়া কাটিয়ে অ-যাত্রা পথে যাত্রার মুহূর্তে। আমি কাজে লাগাই বন্ধু-বিচ্ছেদের বেদনা উপশমের মন্ত্র হিসাবে। পথ এগিয়ে চলবে। কারুর জন্য থেমে রইবে না। বিপ্লবের সাধনায় লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হবে সমস্ত পিছুটান অতিক্রম করে। কত পুরানো বন্ধু হারিয়ে যাবে। নতুন করে পাব আরো কয়েকজনকে।

ঘটনার গতি দ্রুততালে এগিয়ে চলে। বিস্তৃত হয় কর্মের ক্ষেত্র। জানার গণ্ডি প্রসারিত হয়। পরিচয় হয় কত অচেনার সঙ্গে। স্মৃতির পটে অঙ্কিত হয়ে যায় কত নতুন মুখের রেখা। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ভরে উঠতে থাকে। এই অধ্যায়ে প্রথম পদক্ষেপ হয় সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির প্রথম অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষ্যে। বীরেনদার নেতৃত্বে দল বেঁধে এসেছি। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্র প্রতিনিধিরা এসেছে সম্মেলনে যোগ দিতে। উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ডঃ আরকোহার্ট। সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু এবং অনেক খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ। মঞ্চের উপরে দেশবরেণ্য নেতাদের সঙ্গে প্রথম সারির ছাত্রনেতারা, প্রমোদ ঘোষাল, বীরেন দাশগুপ্ত, শচীন মিত্র প্রভৃতি। একটা উদ্দীপনাময় দেশাত্মবোধক সঙ্গীত দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। কোন গানটি গাওয়া হয়েছিল আজ ঠিক মনে নেই। গানটির সুরের রেশ আর সমগ্র পরিমণ্ডল অনুভূতির গভীরে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার প্রতিধ্বনি এত বছর পরে ক্ষীণ হয়ে এলেও একেবারে মিলিয়ে যায় নি। মনে হয়েছিল হিমালয়ের পাদদেশের সেই ছোট্ট শহরটির জীবন থেকে কতদূরে চলে এসেছি! মহানন্দা এসে মিশেছে সাগরে।

জওহরলাল নেহরুর অভিভাষণে বিশ্বরাজনীতির রূপরেখা চোখের সামনে

স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুনি প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর দুনিয়ার দেশে দেশে যুব বিদ্রোহের কথা। জীর্ণ পুরাতনকে ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়ে তোলার কাজে অগ্রণী হতে হবে তরুণদেরই। মহাযুদ্ধের নির্মম আঘাতে পুরাতন সম্বন্ধে তাদের মোহভঙ্গ হয়েছে। পৃথিবীকে আর একবার ধ্বংসযজ্ঞে টেনে নামাবার ষড়যন্ত্র তারা সফল হতে দেবে না। সাম্রাজ্যবাদের অবসান, সামাজিক ন্যায় ও সামাজিক মুক্তি, সমাজতন্ত্র এবং আন্তর্জাতিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলে তবেই যুবকেরা নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে।

শুনি সোভিয়েত রাশিয়ার কথা, কিভাবে বিপ্লবের তীর্থভূমি সেই দেশ প্রাচ্যের পদানত দেশগুলির মুক্তিসংগ্রামের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে দেখতে শিখি বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পটভূমিতে। পরাধীন দেশে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ বাস্তব হয়ে উঠবে শুধুমাত্র জাতীয় মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে। দেশজোড়া শ্রমিক ধর্মঘটের তরঙ্গের উল্লেখ শুনি পণ্ডিতজীর কণ্ঠে। সামাজিক অবিচারের অবসান না হলে দেশে শান্তি আসবে না। তরুণেরা যদি সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের আদর্শকে গ্রহণ করে থাকে তবে স্বাধীন ভারতকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার শপথ নিতে হবে। প্রবীণেরা হয়ত সমাজতন্ত্রের কথা শুনে ভয় পাবেন। তাঁরা বলেন, শোষক ও শোষিত—উভয়ের প্রতি সুবিচার করার কথা, যার একমাত্র অর্থ সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। কিন্তু মুক্তি আসবে না স্থিতাবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখে মন্থর সংস্কারের পথে। কামালের তুর্কী, আমানুল্লার আফগানিস্থান যেমন এক আঘাতে মধ্যযুগীয় অচলায়তন ভেঙ্গে চুরমার করে আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে, তেমনি দুঃসাহসিক ব্রত অনুষ্ঠানের ডাক এসেছে আজ ভারতের যুবকদের সামনে।

জওহরলালের বক্তৃতা সেদিন আমাদের মত অনেকের চিন্তা-প্রবাহকে একটা সুস্পষ্ট মোড় নিতে সাহায্য করেছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বইতে পড়া যেসব ধারণা মাথার মধ্যে এলোপাথাড়িভাবে পথ খুঁজে ফিরছিল, সেগুলিকে যেন তিনি সাজিয়ে গুছিয়ে একটা সুস্পষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। মনের অনেকগুলি জানালা যেন একসঙ্গে খুলে যায়। আর সেই গবাক্ষপথে বৃহৎ বিশ্বের দিকে মুখ তুলে তাকাতে শিখি।

...ছাত্রসমিতির অধিবেশন শেষে রাজশাহীতে ফেরার অল্পদিনের ভিতরেই

অনুষ্ঠিত হয় জেলা যুব সম্মেলন। সভাপতি হয়ে আসেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। নাম ত অনেকদিন ধরেই শুনে এসেছি। এবার মানুষটিকে চাক্ষুষ দেখার এবং ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসার সুযোগ হয়। ডঃ দত্তের সাহচর্য পরবর্তী কালে আমার মনের বিকাশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। যুক্তিনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণের প্রবণতা উৎসাহিত হয়েছে। প্রথম সাক্ষাতে কিন্তু মনের উপর হয়েছিল মিশ্র প্রতিক্রিয়া। খানিকটা হতাশার ভাব মিশেছিল তার সাথে। তাঁর অভিভাষণে রোম্যান্টিসিজম দূরে থাকুক, আবেগের লেশমাত্র ছিল না। তখনকার আব-হাওয়ায় সে বক্তৃতা যেন একেবারে বেসুরো, খাপছাড়া। তাতে ছিল, একদিকে জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের এবং অন্যদিকে গুপ্ত বিপ্লবী দলগুলির দাদাদের বিরুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ সমালোচনা। তিনি সমাজতন্ত্রের আদর্শকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যের সেইদিকটিতে যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করি। অথচ একেবারে রোমান্টিসিজম-বর্জিত বিশুদ্ধ যুক্তিনিষ্ঠ মতামত আমাদের মত ছেলেদের রাজনৈতিক ধারণার ভিতটাকেই যেন নাড়া দিয়ে যায়। আঘাত হানে এতদিনের সঞ্চিত সংস্কারের মূলদেশে।

শ্রোতাদের অনেকেই অধৈর্য হয়ে ওঠার উপক্রম। তাদের কাছে ডঃ দত্তের বক্তব্য পুরোপুরি নেতিবাচক বলেই মনে হয়েছিল। কারণ যে একেবারেই ছিল না তা নয়। যে সব আশু প্রশ্ন তখন কর্মীদের মন তোলপাড় করে তুলেছে তার সমাধানের কোন হদিস নেই—নেই সংগ্রামের আহ্বান। জাতীয় নেতৃত্ব এবং দাদাদের সমালোচনাটাও নেহাতই একপেশে বলে ঠেকে। অথচ তাঁর কথাগুলিকে সরাসরি উড়িয়ে দিতেও পারি না। একে ত তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ভাই, তার উপরে নিজে সুদীর্ঘ বিপ্লবী ঐতিহ্যের অধিকারী। সেই সঙ্গে আছে অগাধ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি। এদেশে যাঁরা বিপ্লবী আন্দোলনের পথিকৃৎ তাঁদের তিনি অন্যতম। আমেরিকা ও জার্মানীতে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের চাঞ্চল্যকর কার্যকলাপের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় থেকে স্বয়ং লেনিনের সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছেন বলে শুনেছি। পরে অবশ্য জেনেছি যে, লেনিনের সঙ্গে তাঁর পত্রবিনিময় হয়েছিল, কিন্তু সাক্ষাৎ হয়নি। আমাদের দৃষ্টিতে এমন একজন মানুষ জীবন্ত বিস্ময়, রূপকথার নায়ক। তাঁর কথা শুনে রঙীন চশমাটা ভেঙ্গে গেলেও কৌতূহল ত মেটে না!

সুরেন দাশগুপ্ত প্রস্তাব করে যে, তাঁর সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করে আমাদের প্রশ্নগুলি তুলে ধরি। তিনি কালুদার অতিথি হয়েছেন। কালুদাকে জিজ্ঞাসা করতে জানতে পারি যে, ডঃ দত্তের কাছে যাওয়াটা অত্যন্তই সোজা, যাকে বলে অবারিত দ্বার। এত সহজ যে ধারণার অতীত। সে যাওয়ায় রোমান্টিক আমেজ নেই, নেই রহস্যের পরিবেশ।

কাছে গেলে তিনি সরল অনাড়ম্বর ব্যক্তিত্বের দ্বারা অতি সহজে সকলকে আপনার করে নিলেন। তবে প্রথমটা থমকে যেতে হয়েছিল বৈকি! চিরাচরিত অভ্যাসের বশে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গিয়েছি। অমনি এক ধমক। কালুদা উপস্থিত না থাকলে হয়ত ওখান থেকেই ফিরে আসতাম। তিনি পরিবেশটাকে সহজ করে দেওয়ার জন্য বলেন, "ডঃ দত্ত! ওরা ত এখনও আপনার শিষ্য হয় নি। হলে তখন আর পায়ে হাত দেবে না।" ডঃ দত্ত প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়েন। তার পরেও আর একবার ধমক খেতে হয়েছে, যদিও প্রথমবারের তুলনায় অনেক মৃদুভাবে। ভূপেনদা বলে সম্বোধন করা চলবে না। বলতে হবে ডঃ দত্ত। তিনি 'দাদা'-বাদের বিরুদ্ধে প্রায় সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তাই বলে আমরা ত বয়স্কদের সঙ্গে আলাপ-আচরণে এতটা সহজ হওয়ায় অভ্যস্ত নই। শেষরক্ষা করে সুরেন। আলোচনা সুরেনই শুরু করে। আমি আর নির্মল প্রথমটায় চুপ করে শুনি। পরে এক সময় নিজেদের অজানতে আড়ষ্টতা কেটে যায়।

ডঃ দত্ত আমাদের ঠিক যেন সমবয়সীর মর্যাদা দিয়ে আলাপ করেন। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যান সহিষ্ণুভাবে। তিনি বলেন যে, সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী হলে শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। কথার ফাঁকে এক সময় জিজ্ঞাসা করে বসেন: "তোমরা কেউ দাদাদের দলের সঙ্গে যুক্ত নেই ত"? আচমকা এমন প্রশ্ন করে বসবেন তাও ভাবি নি। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের যথার্থ পরিচয় দেওয়া সঙ্গত মনে করি না। নিতান্ত অন্তরঙ্গ দুই-একজন সহকর্মী আর স্থানীয় নেতারা ছাড়া কেউ জানে না যে, আমরা গুপ্ত সমিতির সভ্য। তাই সরাসরি বলতে হয়: "না, নেই।" ডঃ দত্ত তখন বলেন যে, সাম্প্রতিককালে সন্ত্রাসবাদ এবং গণ-আন্দোলনের কর্মসূচী দুইয়ের মধ্যে জোড়াতালি দেওয়ার একটা চেষ্টা চলেছে। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হতে পারে না। গণ-সংগঠন তথা আন্দোলনের পথ বেছে

নিলে ষড়যন্ত্রমূলক কাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। এ নিয়ে তাঁকে বেশি প্রশ্ন করি নি। তবে কথাটাকে গুরুত্ব না দিয়েও পারি না। মনে ভাবি যে, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার যথেষ্ট অবকাশ পাওয়া যাবে। আমরা প্রশ্ন করি : "স্বাধীনতা-আন্দোলনে আসন্ন যে জোয়ারের গর্জন শোনা যাচ্ছে সে সম্বন্ধে কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট-মতবাদের উপর সহানুভূতিশীল কর্মীরা কি মনোভাব গ্রহণ করবে ?" ডঃ দত্ত কোন স্পষ্ট জবাব দিতে পারেন না। তিনি বলেন : "মহাত্মাজী আদৌ আন্দোলন শুরু করবেন কিনা, আর যদি বা করেন, তাতে গণ-মানুষের সত্যকার ভূমিকা কি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।" একথা শুনে খুব সন্তুষ্ট হতে পারি নি। ডঃ দত্তের সঙ্গে আলোচনার প্রভাবটা আমার উপরে কার্যকরী হতে থাকে ধীরে ধীরে, যেন নিঃশব্দচরণে। হিসাব কষতে বসলে আজ বুঝি যে, তা থেকে সেদিন চিন্তা অনেক খোরাক পেয়েছে। যুক্তি আর বিচার-বিশ্লেষণের প্রবণতা উৎসাহ লাভ করেছে। অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কিন্তু হৃদয় পরিতৃপ্ত হতে পারে নি।

যুব সম্মেলন শেষ হওয়ার পরই বোধহয় কলেজের মুসলিম ছাত্রাবাস ফুলার হোস্টেলের প্রীতিসম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন বিদ্রোহী কবি নজরুল। গোটা কলেজের ছেলেরা সেখানে ভিড় করে। কবির নিজের কণ্ঠে শুনি সেই বহুবার শোনা গানটি—"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার"। বজ্রনির্ঘোষে আবৃত্তি করেন—"বল বীর, চির উন্নত মম শির"। কবিকণ্ঠে শুনি "কারার ঐ লৌহকপাট, ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট। রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী"। তিনি যেন তরুণ মনেরই সঙ্কল্পকে ভাষায় রূপ দিয়ে বলেন, "সময় হয়েছে নিকট এবার, বাঁধন ছিঁড়িতে হবে"। উপস্থিত সমস্ত ছেলেরা উল্লাসে ফেটে পড়ে। যারা কোনদিন রাজনীতির ছায়া মাড়ায় না তাদের রক্তেও বুঝি জাগে চাঞ্চল্যের উদ্দামতা। যদিও জানি যে, বেশির ভাগ ছেলের ক্ষেত্রেই তা হবে ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদের মতন। তবু ত কবি ক্ষণিকের জন্য হলেও সবাইকে বিদ্রোহের নেশায় মাতাল করে তোলেন।

যুক্তি আর আবেগ। স্বপ্ন আর বাস্তবের বিশ্লেষণ। দুয়ের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় হবে ? খুঁজি এমন এক জীবনদর্শন যার আলোকে চলার পথের প্রতিটি পদক্ষেপ দিনের আলোর মত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। চিন্তা এবং যুক্তি দিয়ে যাকে

সত্য বলে জানব তা যেন অনুভূতির সমস্ত তন্ত্রীগুলিতে গভীর প্রতিধ্বনি তুলতে পারে। এমনি করে সচেতনভাবে নিজেকে গড়ে তুলব। সেই সংকল্পে সাহায্য পাবার আশায় দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের দিকে হাত বাড়াই। বাণীর রত্নভাণ্ডার থেকে পরশমণি সংগ্রহ করে আনতে হবে। ইংরাজীর তরুণ অধ্যাপকের সস্নেহ সহায়তায় সন্ধান এগিয়ে চলে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের বর্ণনায় খুঁজে পাই হৃদয়াবেগ এবং সংযমের অপূর্ব সমন্বয়। মহাকাব্যের মহামানব চরিত্রগুলি কর্তব্যে কঠোর অথচ স্নেহ-মমতায় কুসুমকোমল। একাধারে রুদ্র ও শিব। ইংরাজী সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় 'ক্লাসিসিজম' এবং 'রোম্যাণ্টি-সিজম' এই দুই ধারার সঙ্গে পরিচয় হয়। অধ্যাপক বুঝিয়ে বলেন যে, ক্লাসিসিজমের মননভঙ্গি নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার মত প্রশান্ত, আত্মসচেতন। তার মধ্যে উচ্ছ্বাসের আতিশয্য নেই, আছে অতলস্পর্শী গভীরতা। তা ধীর-স্থিরভাবে জ্ঞানের সন্ধান করে। বিষয়বস্তুর প্রতিটি খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করে দেখে। যাকে জানবে তাকে জানতে চায় দিবালোকের মতন স্পষ্ট, উজ্জ্বল-ভাবে। রোম্যাণ্টিসিজম এর ঠিক বিপরীত। তা ছুটে চলতে চায় এক অজ্ঞাত দেশে অজানার সন্ধানে। পথে তার তর সয় না। আশেপাশের সবকিছুর দিকে তাকিয়ে দেখার অবসর নেই। আবছায়া আঁধারেই যাত্রা তার। কোথায় সেই অনাবিষ্কৃত দেশ? কে বা কি সে অজানা? এসব হিসাবনিকাশের অপেক্ষা রাখে না। ছুটে চলতে হবে এইটুকুই যেন তার কাছে সবচেয়ে বড় সত্য হয়ে উঠেছে। এই বর্ণনার মধ্যে যেন বাংলার তখনকার যুগমানসের প্রতিচ্ছবিকে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখি। অধ্যাপক বুঝিয়ে বলেন যে, রোম্যাণ্টি-সিজমের মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র ধারা আছে। একটি অজানার সন্ধানের নামে ছায়ালোকে পলায়নের পথ খুঁজে ফেরে। তার দৃষ্টি প্রসারিত বিস্মৃত বা মৃত অতীতের দিকে, নতুবা সময় কাটায় শুধু অলস আকাশকুসুম চয়নে। অন্য ধারাটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। তা বর্তমানের বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে উন্মাদনা নিয়ে সামনের দিকে ছুটে চলে, চায় নবসৃষ্টির সম্ভাবনাকে বরণ করে আনতে। তাই ত তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ক্ষমাহীন সংগ্রামের আহ্বান। সংগ্রাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্য ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে। এরই প্রেরণা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের কাছে। এই আহ্বানেরই মেঘমন্দ্র ধ্বনিত হয়েছে "অচলায়তন", "মুক্তধারা," "তাসের দেশ" প্রভৃতি নাটকে। শেলীর "প্রমেথিউস আনবাউণ্ড"-এ শুনেছি

তারই ডমরুধ্বনি। শুনেছি "ওড টু ওয়েস্ট উইণ্ড"-এ। আমার সঙ্গীসাথীরা কেবল ডমরুর গুরুগুরু শুনেই পাগল হয়ে উঠেছে। আমি ত শুধু রোমান্টিসিজমকেই সম্বল করে তৃপ্ত হতে পারি না। সেই সঙ্গে খুঁজি জ্ঞানের আলোক। কবি কীটসের "এ্যাপোলো"ত জ্ঞানের সাহায্যেই দেবত্বলাভ করেছিল। একদিকে "এ্যাপোলো" এবং অন্যদিকে "ওয়েস্ট উইণ্ড," দুইয়ের মধ্যে মিলন ঘটাতে হবে নিজের জীবনে ও কর্মে। ছুটে চলব কালবৈশাখীর ঝড়ের মতন মাথায় করে সাগরের অশান্ত তরঙ্গভঙ্গের শিখরে শিখরে। অথচ হৃদয় থাকবে প্রশান্ত, সমাহিত, সঙ্কল্পে লৌহকঠিন। লক্ষ্য হবে—ধ্রুবতারার মত অচঞ্চল, চিরঅম্লান।

জীবনবেদের সন্ধানের জন্য যে কি মূল্য দিতে হবে তা কি তখন বুঝেছি? এ ত বই পড়ে পাবার বস্তু নয়! বাইরের আর মনের জগতে কত অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবে সে জিনিস রূপ পরিগ্রহ করে। অঙ্গে বহন করে কত দ্বন্দ্বের, কত আত্মজিজ্ঞাসার, কত না বেদনার স্বাক্ষর আর কত সংগ্রামের ক্ষতচিহ্ন। এমনি এক সংগ্রামী কাহিনীর অপরূপ চিত্রণ দেখতে পাই মনীষী রোম্যাঁ রোলাঁর "জঁা ক্রিস্তোফ" উপন্যাসটিতে। সঙ্গে সঙ্গে ক্রিস্তোফ আমার মনের অনেক-খানি অংশ জুড়ে স্থায়ী আসন দখল করে নেয়। রোলাঁ ক্রিস্তোফকে বাল্যকাল থেকে ধাপে ধাপে রূপায়িত করে তুলেছেন। সে সব্যসাচীর মতন প্রথম থেকেই মহামানব রূপে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় নি। আর দশটি ছেলের একজন হিসাবেই তার যাত্রা শুরু হয়েছে। প্রতিদিনের দুঃখ-বেদনা, হাসি-কান্না, আশা-নিরাশা, বঞ্চনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে পথ করে সে এগিয়ে চলেছে। বাইরে ও ভিতরে কত সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছে। সেই আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনা হয়ে গড়ে উঠেছে তার প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব।

ক্রিস্তোফ অবশ্য কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক লক্ষ্য সামনে রেখে জীবনের পথচলা শুরু করেনি। সে চেয়েছিল শিল্পের সাধনায় মগ্ন হয়ে থাকতে। শিল্পেরই মাধ্যমে নিজের অন্তরে Harmonyর সন্ধান করেছে। কিন্তু রূঢ় বাস্তব তাকে বারবার টেনে এনেছে প্রচলিত সামাজিক পরিবেশের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের ময়দানে। ক্রিস্তোফ পরিচালিত হয়েছে হৃদয়ের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা ততটা নয়। সে মানুষকে ভালবাসে। তাই লোভী স্বার্থান্ধ মানুষদের তৈরি সমস্ত গণ্ডি আর বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ। সে সত্যকে পূজা করে। অতএব অসত্য এবং ভণ্ডামির প্রতি ক্ষমাহীন। নিজেরই অজানিতে

সমগ্র মানবতার উপর ভালবাসায় তার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ক্রিস্তোফের গভীর সংবেদনশীল অনুভূতি আর অত্যন্ত সজীব অন্তর-জীবনের বিকাশের কাহিনী আমার সামনে যেন মনের জগতের বৈচিত্র্যের দ্বার উন্মুক্ত করে ধরেছে। সন্ধান দিয়েছে সেখানে লুকোনো বিপুল ঐশ্বর্যের। ধর্ম, অধ্যাত্ম, দিব্যোন্মাদনা ইত্যাদির সংস্রব না থাকা সত্ত্বেও সেই জগৎ যে কত সমৃদ্ধ হতে পারে সে কথা উপলব্ধি করতে শিখি। বাস্তবের সঙ্গে সংগ্রামী পরিচয় ঘুমন্ত মনকে সোনার কাঠির ছোঁয়া দিয়ে জাগিয়ে তোলে। তখন থেকে জঁা ক্রিস্তোফ হয়ে দাঁড়ায় আমার মনের অনুক্ষণের সঙ্গী। দুর্বল মুহূর্তগুলিতে যেন পাশে তার উপস্থিতি অনুভব করি।

বইটির প্রথম খণ্ডের পরিসমাপ্তিতে রোলঁা যে কথাগুলি বলেছেন সেগুলি আমার কাছে মন্ত্রে পরিণত হয়। "Life is a battle without armistice—" জীবন এক বিরতিহীন যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের দেবতা অন্তরে বসে বলেন "Go, go, and never rest" —বিশ্রামের অবকাশ নেই এখানে। "Go and suffer, you who must suffer ! You do not live to be happy. You live to fulfil my Law. Suffer ; die. But be what you must be—a man. এমনি ভাবেই ত ক্রিস্তোভ সুদীর্ঘ পথ অতিবাহন করে চলেছে। আঘাতে, দুঃখের বেদনায় অন্তর ক্ষতবিক্ষত হলেও চলা তার থেমে থাকে নি। তাই ত মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তার স্বপ্নদৃষ্টিতে সুন্দর দেব-শিশুর বেশে এসে দেখা দিয়েছে অনাগত দিন 'the day soon to be born ।"

আমি ত জেনেশুনেই বঞ্চিত দেশবাসীর দুঃখবেদনাকে আপন করে নিয়েছি। তাদের মুক্তির সংগ্রামে সৈনিক হিসাবেই পাব জীবনে সার্থকতার অনুভূতি। রোম্যাঁ রোলাঁর কাছে নতুন করে দীক্ষা নিই—'হার মানব না।' বাইরেও নয়, মনের জগতেও নয়।

সংগ্রামের দেবতা বুঝি অলক্ষ্যে বসে হাসেন। সঙ্কল্পের জন্য প্রতিপদে যে কঠিন মূল্য দিতে হবে তার যাচাই শুরু হয়ে যায় অনতিকাল বিলম্বে। জঁা ক্রিস্তোফ় প্রথম খণ্ডটি পড়ি পূজার ছুটির অবকাশে। ছুটির পর কলেজে ফেরার কিছুদিনের মধ্যে সংঘাত শুরু হয় সেই বন্ধুর সঙ্গে যে সকল বন্ধুর মধ্যে অদ্বিতীয়। এবার আঘাত লাগে হৃদয়ের একেবারে কোমলতম স্থানে, যেখানে যুক্তির চেয়ে আবেগেরই প্রাধান্য। প্রথম যৌবনের কোন কোন বন্ধুত্বে প্রথম প্রেমের মতই

মাদকতা থাকে। আমি চেয়েছিলাম নির্মলকে ঠিক সেইভাবে প্রীতি ও ভালবাসার পাত্র উজাড় করে ঢেলে দিতে। তাকে অন্তরের কল্পনার সমস্ত ভাগ দিতে চেয়েছি। হৃদয়ের গোপন মণিকোঠার যে দ্বার অন্য সবার কাছে রুদ্ধ করে রাখি তা উন্মুক্ত করে দিই। কিন্তু দুটি স্বতন্ত্র সত্তা কখনও সম্পূর্ণ এক হতে পারে না। তফাত থাকে দৃষ্টিভঙ্গিতে। মনোবৃত্তিতে পার্থক্য থাকে। পার্থক্যকে অস্বীকার করে মিলতে গেলে দ্বন্দ্ব ওঠে অনিবার্য হয়ে। এসব কথা ত অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে উপলব্ধি করতে হয়। তার আগে কেই বোঝে না। আমরাও বুঝি নি। আমি চেয়েছি বন্ধুর সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করে নিতে।

নির্মলের দিক থেকেও প্রথমে কোন বাধা আসে নি। সে নিজেকে আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে ক্রমে ক্রমে তার ব্যক্তিত্ব চাপা পড়ে যায়। সে যেন হয়ে দাঁড়ায় আমার ছায়া। যখন সে বোঝে তখন দেরি হয়ে গিয়েছে। তাই নিজের ব্যক্তিত্ব উদ্ধারের চেষ্টায় এক এক সময় রূঢ়ভাবে তুচ্ছ জিনিস নিয়ে বিদ্রোহ করে বসে। হয়ত অকারণেই মতপার্থক্য জাহির করে বা পার্থক্য যেখানে অকিঞ্চিৎকর সেটাকে অত্যন্ত বাড়িয়ে তোলে। নির্মলের দৃষ্টি বর্তমান আর নাকের ডগার বাস্তবকে ছাড়িয়ে বেশিদূর এগোতে অনিচ্ছুক। সে আমার কল্পনাপ্রবণতাকে স্বপ্নবিলাস বলে বিদ্রূপ করে। আরো একটা বিষয় নিয়ে মতভেদ হয়। ভারতের অতীত ইতিহাসের উপর আমার বরাবর একটা আকর্ষণ ছিল। সেই উত্তরাধিকার থেকে যা কিছু ভাল তা বেছে নেবো। বিস্মৃত যুগগুলির মহানায়কদের চরিত্রকে যখন কেউ নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন তখন সে সম্বন্ধে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়। সুভাষচন্দ্র তখন কোন একটি বক্তৃতায় কৃষ্ণ-চরিত্রের বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ হলেন অমর যৌবনের বাণী।" কথাটি আমার বড় ভাল লেগেছিল। অথচ নির্মলকে বলতে যেয়ে ঘা খাই। সে অত্যন্ত হালকাভাবে উড়িয়ে দিয়ে বিদ্রূপের কশাঘাত করে। আমিও প্রতিশোধ নিই বন্ধুর দুর্বল স্থানে পাল্টা আঘাত হেনে।

তখন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পথের পাঁচালী" বইটি সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। বইটি আমারও খুব ভাল লাগে। তার মধ্যে খুঁজে পাই প্রকৃতি এবং জীবনকে জানার অদম্য কৌতূহল। দেখি পরিচিতের গণ্ডি ছাড়িয়ে অপরিচিত অজানা পরিবেশের দিকে যাত্রার অজেয় আগ্রহ। শিশুমনের বিকাশের কাব্যময় চিত্ররূপে আমারই যেন মানস প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।

কিন্তু নির্মলের ভাল লাগাটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, পৌঁছেছে মেয়েলি উচ্ছ্বাসে। তার কাছে "অপু" প্রায় আদর্শ। সে বলে : "মরার সময়ে পথের পাঁচালী বুকে নিয়ে মরব"। আমি বলি : "অপু বড় দুর্বল। তার চরিত্রে জঁ। ক্রিস্তোফের সংগ্রামশীলতার লেশমাত্র নেই।"

নির্মলকে প্রতি-আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে অপুর সমালোচনায় বড় বেশি কঠোর হয়ে পড়ি। ফলে কিছুদিনের জন্য বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। যে ছিল অনুক্ষণের সঙ্গী তার সঙ্গে পথে দেখা হলে দুজনেই মুখ ফিরিয়ে চলে যাই। অবশ্য প্রণয় কলহের মত এই কলহও বেশি দিন স্থায়ী হয় না। তবে অনুভব করি যে, আগেকার সেই নিটোল প্রীতির সম্পর্কে একটা চিড় ধরেছে। চিড়টা অলক্ষ্যে দিনের পর দিন বেড়ে চলে। কোন না কোন অছিলায় সাময়িক ভাবে হলেও তিক্ততার সৃষ্টি হয়। সেই বিষণ্ণ মুহূর্তগুলিতে যেন জঁ। ক্রিস্তোফ জীবন্ত হয়ে পাশে এসে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় খণ্ডটি পড়তে শুরু করেছি। শিরোনাম "Storm and Stress" আমার তখনকার মনের অবস্থাকে প্রতিফলিত করে। ভাবি, এইভাবেই ত এগিয়ে যেতে হবে সারা জীবন ধরে! যে শুনেছে রুদ্রের আহ্বান, সে কি ব্যক্তিগত ব্যথাবেদনার ভারে অবসন্ন হয়ে পিছনে পড়ে থাকতে পারে? দেশের মানুষের দুঃখকে আপন করে নিয়েছি পুড়ে খাঁটি সোনা হব বলে। ব্রতের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে। একান্ত নিজস্ব ব্যথাকে অতিক্রম করতে হবে তারই প্রেরণায়। ব্যর্থতাবোধের কাছে হার মানা চলবে না।

বাইরে তখন মহাঝড়ের ঝাপটা আত্মপ্রকাশ করেছে। দেখতে দেখতে ১৯২৮ সাল শেষ হয়ে যায়। কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। বামপন্থীরা পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। প্রস্তাব গৃহীত হয়নি বটে, কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে এক বৎসরের মেয়াদে চরমপত্র দেওয়া হয়েছে। যদি এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষকে ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিতে গভর্নমেন্ট রাজী না হয় তাহলে আগামী অধিবেশনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা করা হবে। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় ছাত্র ও তরুণেরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। বামপন্থী নেতারা তাদের বুঝিয়ে বলেন যে, এই এক বৎসরকে আসন্ন শক্তিপরীক্ষার প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। জনমতকে তুলতে হবে শিক্ষিত করে।

প্রত্যেকটি সভা ও সমাবেশ থেকে আওয়াজ তুলতে হবে যে, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছু দেশবাসী মেনে নেবে না। বামপন্থীদের রণধ্বনি হল আপসহীন সংগ্রাম। সেজন্য সংগঠনকে প্রসারিত করতে হবে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, প্রতিটি শহরে ও গ্রামে।

কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন দেখতে আমি যেতে পারিনি। সামনে আই. এস-সি পরীক্ষা। সারা বছর যা পড়েছি তা হল রাজনীতি আর সাহিত্যের বই। সামনের কয়েক মাসে বিজ্ঞানের বিষয়গুলির প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে হবে। তাই সংবাদপত্রের বিবরণ পড়েই মনের কৌতূহল মিটাই। সুরেন দাশগুপ্ত কলকাতা গিয়েছিল। সে ফিরে এলে তার মুখে শোনা বর্ণনা খবরের কাগজের রিপোর্টগুলিকে জীবন্ত করে তোলে। কি বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনার মধ্যেই না অধিবেশন শুরু হয়েছে। হাওড়া স্টেশন থেকে কংগ্রেস সভাপতিকে নিয়ে শোভাযাত্রায় উদ্বেলিত জনসমুদ্র। সুভাষচন্দ্রের অধিনায়কত্বে সম্পূর্ণ সামরিক কায়দায় যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে উঠেছিল তা তরুণ মনে উন্মাদনার আলোড়ন সৃষ্টি করে। নাই বা থাকুক তাদের হাতে হাতিয়ার! তবু ত এ রণসজ্জা! আর সেই সংগঠনের পিছনে প্রাণশক্তিরূপে কাজ করছে বিপ্লবী দলগুলি। বিদ্রোহী কবির ভাষায় যারা ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গিয়েছে তারাই ত এসে দাঁড়িয়েছে আজ নতুন রূপ নিয়ে। দেশের যৌবন-শক্তিকে সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠিত করে তুলেছে তারা। পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আপসহীন মৃত্যুভয়হীন সংগ্রামের মানসিক প্রস্তুতির পিছনে এদের অবদানই ত সব চেয়ে বেশি। স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে তারই জ্বলন্ত প্রতীক। এমনি বাহিনী গড়ে তুলতে হবে মফঃস্বলের শহরগুলিতে। সব চেয়ে বেশি আনন্দ পাই একথা শুনে যে, অনুশীলন সমিতি আর যুগান্তরের মধ্যে মিলনের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। এবার কি তবে সমস্ত শক্তি সংহত করে শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানা সম্ভব হবে? আবার বহু প্রশ্ন তোলপাড় করে মনের ভিতরে। বিদ্রোহী কর্মীরা কি এই মিলন মেনে নিয়েছে? দাদারা কী সত্যি সংগ্রামের কোন পরিকল্পনা রচনা করেছেন? যদি করে থাকেন তবে কী সে পরিকল্পনার রূপরেখা? আসন্ন গণ-আন্দোলনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি হবে? সাধারণ সৈনিক আমরা, কিন্তু আগে থেকে কোন আভাসই কি আমাদের দেওয়া হবে না?

সুরেনের কাছে শুনি যে, কংগ্রেসের অধিবেশন চলাকালে একদিন ওয়ার্কার্স এ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত শ্রমিকদের এক বিরাট মিছিল এসে জোর করে সভামণ্ডপে ঢুকে পড়ে। স্বেচ্ছাসেবকেরা তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। অবশেষে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এসে শ্রমিক মিছিলের সামনে বক্তৃতা দিলে তারা শান্ত হয়ে ফিরে যায়। এই মিছিল সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি কি বলতে চেয়েছিল? তাই নিয়ে মনে কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্নও জাগে। সহকর্মীদের অনেকেই এই ঘটনাকে ভাল চোখে দেখে নি। কেউ কেউ বলেছে যে, ওয়ার্কার্স এ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করছে।

সব প্রশ্নকে ছাপিয়ে ওঠে একটা দুরন্ত অনুভূতি। ঝড় আসছে। মহাঝড়ের সঙ্কেত বয়ে নিয়ে আসে ১৯২৯ সালের অগ্নিগর্ভ দিনগুলি। কেন্দ্রীয় আইন সভা ভবনে ভগৎ সিংহ এবং বটুকেশ্বর দত্তের বোমা নিক্ষেপের ঘটনা দেশ-বাসীকে সচকিত করে তোলে। জননিরাপত্তা আইনের প্রতিবাদ জানাতে তাঁরা এই দুঃসাহসিক অনুষ্ঠানে ব্রতী হয়েছেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকেও প্রতি-আক্রমণ শুরু হয়ে যায় দেশব্যাপী ধরপাকড়ের মধ্য দিয়ে। একদিকে লাহোর এবং অন্যদিকে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা সারা দেশে উত্তেজনা আর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। যে ঝড়ের পথ চেয়ে রয়েছি এতদিন ধরে, তার বজ্র-নির্ঘোষ ঐ শোনা যায়। তাকেই বাহন করে এবার উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হবে।

ঝড়ের প্রতীক্ষায়

যে মহাঝড়ের ইঙ্গিত বহন করে শুরু হয়েছিল নতুন বৎসরের দিনগুলি, তার প্রথম ঝাপটায় দেখতে দেখতে গোটা দেশে উত্তেজনার জোয়ার অশান্ত ক্ষ্যাপা উচ্ছ্বাসে আত্মপ্রকাশ করে। আর ঠিক সেই ক্ষণটিতে আমাকে সমিতির নির্দেশে রাজনীতির প্রকাশ্য ময়দানে অবতীর্ণ হতে হয়।

১৯২৯ সালের মাঝামাঝি সময়ের কথা। আই. এস-সি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার পর বি.এ. পড়ার জন্য রাজশাহী কলেজে ফিরে এসেছি। যথারীতি কলেজ ইউনিয়নে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর কলা বিভাগের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হয়েছি। সুরেন দাশগুপ্ত চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে ইউনিয়নের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে। সমিতির পক্ষ থেকেও আমাদের দুজনের উপরে দেওয়া হয়েছে বৃহত্তর দায়িত্ব। হোস্টেলের বাইরে শহরে সমিতির বহু কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। জিতেশদা এখন শহরে থেকে সমিতির কাজ পরিচালনা করছেন। নেতৃস্থানীয় আরো কয়েক-জনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।

জিতেশদার ডাকে একদিন গোপন বৈঠকে তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়। এঁদের মধ্যে টুনুদা, চেরুদা আর বীরুমামার কথাই বিশেষভাবে মনে পড়ে। টুনুদা তখন রাজশাহী শহরে ছাত্র ও তরুণদের প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। তিনি এই কলেজেরই প্রাক্তন মেধাবী ছাত্র। সম্প্রতি এম-এস-সি পাস করে ফিরে এসেছেন। ভাল খেলোয়াড় এবং দক্ষ সংগঠক। চেরুদা ও বীরুমামার জন-প্রিয়তা ভাল খেলোয়াড় আর একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে। এঁরা যে শহরে অনুশীলন সমিতির প্রধান স্তম্ভ তা বুঝতে পেরেছিলাম প্রতুলদার সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে। এঁদের সঙ্গে একত্রে বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছি দেখে মনে বেশ গর্ব অনুভব করি। তাহলে সমিতি আমাকে এখানকার নেতৃত্বের প্রথম ধাপে ওঠার উপযুক্ত বলে বিচার করেছে। সুরেন দাশগুপ্ত ত আগেই অন্য জেলায়

যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে এসেছে। ছাত্র কর্মীদের মধ্য থেকে শুধু আমরা দুজনই আমন্ত্রিত হয়েছি। বৈঠক ডাকার কারণ ব্যক্ত করেন জিতেশদা। অনুশীলন এবং যুগান্তরের 'অ্যামালগ্যামেশান' স্থায়ী হয়নি। কয়েক মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই ভেঙ্গে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নাকি নীচের তলায় মিলন হয়ই নি। যার ফলে সংগঠন আলাদা রয়ে গিয়েছিল। এখন শুধু মিলনপর্বের সমাপ্তিটা প্রকাশ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এর মূলে কি কি কারণ রয়েছে জানি না, তবে ভাঙ্গনের আশু উপলক্ষ্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্মকর্তা নির্বাচন।

প্রাদেশিক কংগ্রেসের মধ্যে দুটো গ্রুপ দানা বেঁধে উঠেছে। একদিকের নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। অন্যপক্ষের নেতা সুভাষ বসু। সেনগুপ্তকে সমর্থন করছে আমাদের সমিতি। সেই সঙ্গে আছে খাদি দল এবং সাম্যবাদী ও শ্রমিক নেতা বলে পরিচিত কয়েকজন। সুভাষবাবুর পিছনে আছে যুগান্তর দল এবং অন্য কয়েকজন খ্যাতনামা নেতা। জিতেশদার ইচ্ছা, রাজশাহীর জেলা কংগ্রেস কমিটির আসন্ন নির্বাচন অনুশীলন ও যুগান্তরের কর্মীদের পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হোক। তিনি এ সম্বন্ধে কালুদার সঙ্গে কথাও বলেছেন এবং একটা সর্বসম্মত মীমাংসার সূত্র স্থির হয়েছে। জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হবেন সুরেন মৈত্র, সম্পাদক কালুদা। সহকারী সম্পাদক তিনজনের মধ্যে অনুশীলনের প্রতিনিধি হবেন টুনুদা। একজন থাকবে যুগান্তরের পক্ষ থেকে। তৃতীয় জন হবে কালুদার মনোনীত একজন নির্দলীয় কর্মী, আর সেই সূত্রেই উঠেছে আমার নাম। কালুদা নিজে থেকে আমার নাম প্রস্তাব করেছেন। আমি হঠাৎ এতবড় দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু সমিতির নির্দেশ মানতেই হবে। টুনুদা ভরসা দিয়ে বলেন : "আমরা ত রয়েছি আপনার সঙ্গে।" যথাসময়ে টাউন হলের সভায় জেলা কংগ্রেস কমিটির কর্মকর্তা নির্বাচন নির্বিবাদে অনুষ্ঠিত হয়। তখন পর্যন্ত আমি ছিলাম কলেজের ছাত্রদের বাইরে অখ্যাত, অপরিচিত। কালুদাই আমাকে টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন একেবারে পাদপ্রদীপের সামনে, জেলার কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে প্রথম সারিতে।

জীবনের চলার পথে আর এক অধ্যায় শুরু হল। প্রথম পদক্ষেপের মুহূর্তটিতে যথেষ্ট উৎসাহিত বোধ করেছিলাম। অভিজ্ঞতার পরিধি আরো প্রসারিত হবে। দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে কাজ করার এই ত সবে হাতেখড়ি। তবু

উৎসাহটা অবিমিশ্র নয়। গুপ্ত সমিতিগুলির মধ্যে ঐক্যের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াটা আমার কাছে অত্যন্ত বে-সুরো ঠেকে। বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম যে, পূর্ববাংলার জেলাগুলিতে বিভিন্ন দলের কর্মীদের মধ্যে ঝগড়া এবং বিসংবাদ অতীতে বহুবার আত্মঘাতী কলহের রূপ নিয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন দলের অনেক অ-চিহ্নিত কর্মী পুলিসের চোখে মার্কামারা হয়ে যায়। রাজশাহীর আবহাওয়া এদিক থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক সুস্থ ছিল। বীরেনদাকে দেখেছি হোস্টেল ইউনিয়নের এবং কলেজ ইউনিয়নের সমস্ত কাজে সকল দলের কর্মীদের নিয়ে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে। কালুদা এবং জিতেশদা দুজনেরই এই সম্পর্কে মনোভাব যথেষ্ট উদার। তাহলেও দলাদলির যেটুকু অভিব্যক্তি হয় তাতে ক্ষুব্ধ না হয়ে পারি না। সমিতিগুলি গুপ্ত হলেও কংগ্রেস ও ছাত্র আন্দোলনের মারফত প্রধান প্রধান কর্মীরা পরস্পরের বেশ পরিচিত। রাজনৈতিক কর্মীদের পক্ষেও তাঁদের মধ্যে কে কোন দলের চিনে নেওয়া কঠিন হয় না। সকলের মনেইত রয়েছে দেশপ্রেমের প্রেরণা, আত্মত্যাগ, কর্মের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা। চারিপাশের অ-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের পটভূমিতে বিচার করলে দেখি এঁদের মধ্যে অ-মিলের চাইতে মিলের পরিমাণটাই অনেক বেশি। তাহলে তাঁরা একসঙ্গে মিশে কাজ করতে পারবেন না কেন? অনুশীলন এবং যুগান্তরের বিরোধের মূলে যে খুব বড় একটা রাজনৈতিক মত-পার্থক্য আছে তাও ত মনে হয় না। বরং প্রত্যেক দলের মধ্যেই প্রবীণ ও তরুণদের তীব্র মতদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে বলেই ত জানি। তবে কি এই বিরোধ শুধু প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে ক্ষমতা কার করায়ত্ত হবে সেই প্রশ্ন নিয়ে? যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে আমাদের জেলা কংগ্রেস কমিটিতে যে মিল রয়েছে তাই বা কদিন স্থায়ী হবে? আর ছাত্র আন্দোলনেও কি এই বিবাদের জের এসে পৌঁছাবে না?

সুখের বিষয় ছাত্র আন্দোলনে দলাদলি অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠার আগেই আমাদের জেলা ছাত্র-সমিতির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দুই দলের কর্মীরা একত্র মিলেই প্রস্তুতি কমিটি গঠন করে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় যুগান্তরের প্রথম সারির নেতা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষকে। প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন সুভাষচন্দ্র বসু। প্রকাশ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ টি, টি, উইলিয়ামস্। তিনি ছিলেন

একজন উদার মনোভাবাপন্ন শিক্ষাব্রতী। ইতিপূর্বে কলেজ ইউনিয়নের সভাগুলিতে ছাত্রদের সম্বন্ধে তাঁর স্নেহশীল উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়েছিলাম। সম্মেলনের মঞ্চ থেকে আমরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করি। একটিতে বলা হয় যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, ডমিনিয়ন স্ট্যাটাসকে ছাত্রসমাজ কিছুতেই মেনে নেবে না। অপরটিতে লাহোর এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের অবিলম্বে মুক্তি এবং সমস্ত দমনমূলক আইন প্রত্যাহারের দাবি করা হয়। পূর্ণ স্বাধীনতা সংক্রান্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করে সুরেন দাশগুপ্ত। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করার জন্য সভাপতি আমাকে আহ্বান করেন। রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে সেই আমার প্রথম বক্তৃতা।

বক্তৃতা দিতে উঠে দুরু দুরু বক্ষে কি কি বলেছিলাম সব কথা আজ মনে নেই। ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস জনগণের জীবনে সত্যকার মুক্তি আনতে পারে না—এই কথাটি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই সুভাষ বাবুর প্রশংসাধন্য হয়ে আনন্দের পরিসীমা ছিল না। জীবনের প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতার পক্ষে তা ছিল শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

জেলা ছাত্র-সমিতির কর্মকর্তা নির্বাচনও বিনা বিসংবাদে সম্পন্ন হয়। সুরেন দাশগুপ্ত সভাপতি এবং সম্পাদক শৈলেন চক্রবর্তী। সহসভাপতি ও সহ-সম্পাদকের পদগুলি দুই দলের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়। অন্যতম সহকারী সম্পাদকরূপে নির্বাচিত হই আমি। ছাত্র সম্মেলন চলাকালেই আমার একজন অতি-সাহসী সহপাঠী আমাকে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলেছিল। সুরেশ ছিল যুগান্তরের সভ্য। সে এবারই এখানে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। আমি তখনও কোন দলের সভ্য হিসাবে মার্কমারা হয়ে উঠি নি বলে সে আমাকে একজন সম্ভাব্য 'রিক্রুট' হিসাবে ধরে নিয়েছিল। সুযোগ পেলেই 'বিপ্লব', 'আত্মদান' প্রভৃতি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। বেশ বুঝতে পারি, আমার মনে তখন যে সব প্রশ্ন উঠেছে সেসব সুরেশের চিন্তার ত্রিসীমানার মধ্যে ঠাঁই পায় না। সুতরাং আমিও তার প্রসঙ্গগুলিকে এড়িয়ে যাই। অবশেষে সুরেশ একদিন খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করে বসে আমি কোন দলের সঙ্গে জড়িত আছি কিনা। এই প্রশ্নের যা স্বাভাবিক জবাব তাই দিয়ে বলি আমার মতে সমস্ত দলেরই উচিত একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা। আমি ভেবেছি এরপর সে হয়ত আমাকে

আর বিরক্ত করবে না। ভুল করেছিলাম। সুরেশ লাহিড়ী অত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয় সেটা টের পাই সম্মেলন চলার সময়ে।

সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের সঙ্গী হয়ে এসেছিলেন অরুণচন্দ্র গুহ। তাঁর লেখা দু'একখানা বই পড়েছি। অন্য দলের হলেও প্রবীণ নেতা হিসাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করি। সুরেশ একদিন বলে: "অরুণদা তোমার বক্তৃতা শুনে খুব প্রশংসা করেছেন। তোমার সঙ্গে তিনি আলাপ করতে চান।" এ ত আমার সৌভাগ্য। সুরেশ অরুণদার কাছে পোঁছে দিয়ে একলা আলাপের সুযোগ দেওয়ার জন্য চলে যায়। অরুণদার কথায় বেশ বুঝি যে, সুরেশ আমাকে যুগান্তর দলে টানার সম্ভাবনা সম্বন্ধে বাড়িয়ে বলেছে। অগত্যা নিরুপায় হয়ে তাঁকে নিজের সত্য পরিচয় দিই। এই অভিজ্ঞতার পর স্থির করে ফেলি কালুদার সঙ্গেও আর লুকোচুরি করাটা সঙ্গত হবে না। সুযোগমত তাঁকে একদিন সব কথা খুলে বলি। কালুদা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রসন্ন স্মিতহাস্যে বলেন: "তাতে কি হয়েছে! তুমি খাঁটি দেশকর্মী। যে দলেই থাকো না কেন দেশ তোমার কাছে অনেক কিছু আশা করে। আর আমার কাছে বরাবর তুমি ছোট হয়েই থাকবে।" আমি যখন জিজ্ঞাসা করি যে, সব দল একত্র কাজ করতে পারে না কেন, তখন তিনি বলেন: "চেষ্টা ত হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব ভেঙ্গে গেল।" এই ব্যর্থতার জন্য কালুদা কোন একটি দলের উপর দোষারোপ করেন না, শুধু বলেন: "তোমার রাজনৈতিক জীবন ত সবে শুরু! মস্তবড় আদর্শ সামনে রেখে এ পথে পা বাড়িয়েছ। এখন শুধু ভাল দিকটাই দেখছ। কিন্তু অভিজ্ঞতা যত বাড়বে—ততই রাজনীতির কুৎসিত কুশ্রী দিকগুলিও চোখে পড়বে। তার জন্যও তৈরি থেকো। নতুবা বারবার ঘা খেতে হবে।" আমি বলি: "যারা দেশের জন্য সব কিছু ছেড়ে, নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দানের সঙ্কল্প নিয়ে কাজে নেমেছে তাদের মধ্যে ঐ কুশ্রী দিকগুলি প্রশ্রয় পায় কি করে?" কালুদা বলেন: "জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ সাদায়-কালোয় আলোয়-আঁধারে মেশানো। সেই অন্ধকারকে এড়িয়ে আলোর সন্ধান পাওয়া যায় না।" তিনি আর কথা বাড়ান না, বলেন: "এসব জিনিস অন্যের মুখে শুনে বোঝা যায় না। নিজেকেই অভিজ্ঞতা দিয়ে শিখে নিয়ে পথ বেছে এগিয়ে চলতে হবে।"

জলপাইগুড়ি থেকে বীরেনদার ডাক আসে। জেলা যুব সম্মেলনের

আয়োজন করেছেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আসবেন সভাপতি হয়ে। আমাকে অবশ্যই যেতে হবে। সেদিন এই ধরনের সম্মেলনকে উপলক্ষ্য করে বিপ্লবী কর্মীদের গোপন বৈঠক বসত। অনুমান করি, বীরেনদা চান জলপাইগুড়ি শহরের সহকর্মীদের সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিতে। বীরেনদা ডেকে পাঠিয়েছেন, যেতেই হবে। তাছাড়া যতীন্দ্রমোহনকে চাক্ষুষ দেখার জন্য প্রবল আগ্রহ আছে। এই শ্রদ্ধাভাজন নেতার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি। এখনও চোখে দেখি নি। আর একটা কৌতূহলও রয়েছে মনে। তিনি ত কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের সমর্থক তবু প্রদেশ কংগ্রেসে আমাদের দাদারা তাঁকে সমর্থন করছেন কেন? এই নিয়ে যুগান্তর দলের মুখপত্র সাপ্তাহিক "স্বাধীনতা" বহু বিদ্রূপ সমালোচনা করেছে। আমাদের সমিতির মুখপত্র সাপ্তাহিক "শঙ্খ" বা "বাংলার বাণী" সমালোচনার উত্তরে সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছে, ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস নয়, পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আপসহীন সংগ্রামই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু সেখানে সেনগুপ্তকে সমর্থনের কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি। জলপাইগুড়ি যাওয়ার অনুমতি নেওয়ার জন্য জিতেশদার সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে প্রশ্ন করি। জিতেশদা বলেন: "সেনগুপ্তর রাজনৈতিক মতকে ত আমরা সমর্থন করি নি। তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মকর্তা নির্বাচনের ব্যাপারে একটা উদার মনোভাব নিয়েছেন তাই আমরা বিভিন্ন গ্রুপ তাঁকে মুখপাত্ররূপে সামনে রেখে কাজ করছি। এই সব গ্রুপের মধ্যেও রাজনৈতিক মতপার্থক্য রয়েছে।" সেনগুপ্ত কেন ডমিনিয়ন স্ট্যাটাসের প্রস্তাবের পক্ষে মত দিয়েছিলেন তার ব্যাখ্যা শুনতে পাই তাঁরই নিজের মুখ থেকে। সভাপতির অভিভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "মহাত্মা গান্ধী আমাদের প্রতিনিধি হয়ে গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আলোচনা করবেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভেদনীতির সুযোগ নেওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়েছে মডারেট প্রভৃতি দলের সাহায্যে। সুতরাং এই মুহূর্তে আমাদের দেখানো উচিত যে, গোটা জাতীয় কংগ্রেস মহাত্মাজীর পেছনে এক হয়ে দাঁড়িয়েছে।" এই ব্যাখ্যা অবশ্য আমাদের খুব মনঃপূত হয় নি। যাহোক যুব সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ হয়েছে।

উত্তর বাংলার অন্যতম প্রধান শহরে সমিতির প্রভাবের পরিধি প্রসারিত হয়েছে। কর্মী-সমাবেশের মাধ্যমে রচিত হল সংগঠনের একটা সুদৃঢ় ভিত্তি। সম্মেলনে শ্রোতা হয়েই ছিলাম। তবু ছোটখাটো নানা নতুন অভিজ্ঞতায় জমার

ঘর ভরে ওঠে। খুঁটিনাটি কাজের মধ্য দিয়ে বীরেনদার সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় পাই। সেটাও শিক্ষার একটা বিষয় বৈকি! সেনগুপ্তের মত অত বড় নেতাকে দেখি আর্য নাট্য সমাজ হলে প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে একান্ত ঘরোয়া-ভাবে আলোচনা করতে। আমার মত কর্মীর কাছে সে ঘটনা যুগপৎ বিস্ময় এবং উৎসাহের কারণ হয়। বীরেনদা যে কেন ডেকে পাঠিয়েছেন তা জানতে পারি গভীর রাত্রে। অনুশীলনের দুজন প্রথম সারির নেতা রমেশ আচার্য এবং কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত এসেছেন এই অঞ্চলে সমিতির নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে। বৈঠকে উপস্থিত আছি—নেতারা ছাড়া—শুধু বীরেনদা আর আমি। সংগঠন সম্বন্ধেই কথা হয়। রাজনৈতিক আলোচনা বিশেষ হয় নি। দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চল সম্বন্ধে তাঁরা বিস্তৃতভাবে জানতে চান। মনে কৌতূহলের উদ্রেক হলেও তা চেপে রেখে শুধু নেতারা যেটুকু জিজ্ঞাসা করেন তার উত্তর দিই। শুনেছি যে, সমিতির গোপন সংগঠনের হাল ধরে রয়েছেন রমেশদা আর কেদারদা। তাঁরা কেবল বাছা বাছা কর্মীদের সঙ্গেই দেখা করেন। নেতাদের যাচাইয়ের মাপকাঠিতে আরো এক ধাপ উপরে উঠতে পেরেছি অনুমান করে যথেষ্ট পুলকিত হই। দু'বছর আগেও যে রহস্যপুরীর দরজা খুঁজে ফিরেছি তার অভ্যন্তরেই শুধু প্রবেশ করি নি! স্বাধীনতার মহাযজ্ঞে একজন দায়িত্বশীল সৈনিকের ভূমিকা নিতে চলেছি! আসল পরীক্ষা ত হবে সেইখানে, সংগ্রামের ময়দানে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

ওদিকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা প্রতিদিনের অগ্নিপরীক্ষায় নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে। বিদ্রোহী যৌবনশক্তি শৃঙ্খলিত হয়েও অমানুষিক নির্যাতনের সামনে মাথা নোয়ায় নি। বন্দিশালার অন্ধকার কক্ষেও তারা সংগ্রামের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে রেখেছে। রাজনৈতিক বন্দীদের মর্যাদার দাবিতে তাদের আমরণ অনশনধর্মঘট চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। দেশজননীর বীর সন্তানদের তিলে তিলে মৃত্যুবরণের সঙ্কল্প সারা দেশে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভগৎসিং আর বটুকেশ্বর দত্ত, দুটি নাম যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে বিপ্লবী তরুণদের জপের মন্ত্র। দেশবরেণ্য নেতাদের আলেখ্যের সঙ্গে ঐ দু'জনের আলেখ্য একাসনে স্থান লাভ করেছে। অনশনব্রতী যতীন দাসের মৃত্যুর সংবাদে দেশবাসীর উত্তেজনা যেন ঝড়ের হুঙ্কারে ফেটে পড়ে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে শেষ পর্যন্ত মাথা নোয়াতে হয় জনমতের প্রচণ্ড অভিব্যক্তির সামনে। গভর্নমেণ্ট

রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে একটি কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করে; শহীদের শবদেহ কলকাতায় আনার অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। সংবাদপত্রে পড়ি, লাহোর থেকে কলকাতা পর্যন্ত প্রতিটি স্টেশনে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য লোকে-লোকারণ্য। পাঞ্জাবের খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতারা ঘোষণা করেন: "শহীদের শবাধার স্কন্ধে বহন করে ধন্য হয়েছি।" আমরাও সেই ঐতিহাসিক শবযাত্রায় যোগদানের জন্য দল বেঁধে কলকাতায় ছুটে আসি। হাওড়া স্টেশন থেকে কেওড়াতলা মহাশ্মশান পর্যন্ত উদ্বেলিত জনসমুদ্র। অগণিত মানুষের পদধ্বনির সঙ্গে তাল রেখে আকাশে ওঠে বজ্রনির্ঘোষ—'বন্দেমাতরম্', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক'। ইনকিলাব জিন্দাবাদ এই রণধ্বনিটিকে ত লাহোর বন্দীরাই জনপ্রিয় করে দিয়েছে। মিছিল ত শুধু বিষণ্ণ শোকের নয়। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা সকলের চোখেমুখে প্রতিফলিত। লক্ষপ্রাণে ধ্বনিত হয় স্বতঃস্ফূর্ত শপথ "স্বাধীনতার জন্য হৃৎপিণ্ডের শেষ রক্তবিন্দু অকাতরে উৎসর্গ করতে হবে"। মায়ের পূজায় দিতে হবে "জবার বদলে ছিন্নশির"।

বেশ বুঝতে পারি দেশবাসীর মনে উত্তেজনার জোয়ার এসেছে। সমস্ত দল, মত ও পথের স্বাধীনতা-সৈনিকেরা উঠেছে অধৈর্য হয়ে। তাদের সহিষ্ণুতার বাঁধ বুঝি ভেঙ্গে পড়ে। কেউ বলে, 'মহাপ্লাবনের গর্জন ঐ শোনা যায়। মহাত্মাজী কি এখনও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের জবাবের প্রতীক্ষায় বসে রইবেন'? কানাঘুষা শুনি, বিভিন্ন বিপ্লবী দলের বিদ্রোহী তরুণেরা সরকারের নির্মম নৃশংস অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প। কিন্তু কিভাবে নেওয়া হবে প্রতিশোধ? এই প্রশ্নটা তখন আমাদের মতন কিছু কর্মীর মনে আবার নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। উন্মাদনার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দেওয়াটাই কি শেষ কথা? কোন্ পথে সত্যি সত্যি বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ সম্ভব হবে তা নিয়ে কি বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন নেই? ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সে হাওয়াটা ঠিক ধীর স্থির ভাবে সব কিছু তলিয়ে ভেবে দেখার অনুকূল নয়। শুনতে পাই যে, কমিউনিস্টরাই শুধু উন্মাদনার স্রোতে গা ভাসায় নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা মোটামুটি পরিষ্কার পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে তাদের সামনে। অথচ কি অহিংসপন্থী, কি সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী, সমস্ত ধরনের কর্মীর মধ্যেই দেখি সাধারণভাবে কমিউনিস্টদের

সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব। কংগ্রেসের বামপন্থী নেতারাও তাদের উপরে সন্তুষ্ট নন। বিপ্লবী সমিতির দাদারা ত মহাত্মাজীর অহিংস আন্দোলন এবং কমিউনিস্টদের পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলন কোনটাকেই আমল দিতে চান না। সবারই মুখে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ: "তারা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মোটেই উৎসাহী নয়।" এতদিন সেই অভিযোগ শুনে এসেছি। মেনে নিতে মন চায় নি, জবাব দিতেও পারি নি। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হওয়ার পর আর নির্বিচারে মেনে নিতে পারি না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রের অপরাধেই ত তাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলেছে। পুলিস বেড়াজাল ফেলে কমিউনিজমে বিশ্বাসী বা সহানুভূতিসম্পন্ন কর্মীদের গ্রেপ্তার করেছে। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতেও ত কমিউনিস্ট বলে পরিচিত কর্মীরা পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। বামপন্থীদের প্রস্তাবের প্রতিও তাঁরা সমর্থন জানিয়েছেন। হয়ত তাদের কর্মপদ্ধতি ভিন্ন। তাই বলে কি তাদের অবদানকে অবজ্ঞা করা চলে? আবার এও শুনি যে, কমিউনিস্টদের ভিতরেও নাকি অনেক গ্রুপ আছে, রয়েছে যথেষ্ট মতপার্থক্য। শুনে আমার মনে খুঁটিয়ে জানার জন্য কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়। রইলই বা মত-পার্থক্য! একই সমিতির ভিতরেও ত দেখছি মতভেদ কত তীব্র হতে পারে। তবু শত্রুর বিরুদ্ধে সমস্ত মত ও পথের সৈনিকরা একত্র হয়ে আঘাত হানতে পারবে না কেন?

বিপ্লবের সাধনাকে আমি সত্যের সাধনা হিসাবেই নিয়েছি। মত ও পথ নিয়ে দ্বন্দ্ব সত্যের সাধনারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সে কথাটা এতদিনে একটু একটু করে হলেও দৃঢ়ভাবে বুঝতে শিখেছি। বিপ্লবের পথ পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর, শুধু বিঘ্ন-বিপদ-দুঃখ-দাহনই সে পথের একমাত্র সঙ্গী নয়। বন্ধুরা ভুল বোঝে, যাদের হাত ধরে এগিয়ে চলব ভেবেছি তাদের সঙ্গে সংঘাত দেখা দেয়। এ সবের জন্যও এতদিনে তৈরি হয়ে উঠেছি। মতদ্বন্দ্বে মনের জগতে ঝড় ওঠে, টানাপোড়েনের খেলা চলে। তবু তাতে ছন্দপতন ঘটে না। পথের রেখা যেখানে স্পষ্ট নয় সেখানেই মানুষ পথ খোঁজে, পথ রচনা করে। অন্ধকারের মধ্যে বসেই মন্ত্র উচ্চারণ করে 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'। কিন্তু মুক্তি-সৈনিকদের ভিতরে যখন দলাদলি অত্যন্ত বীভৎস আকারে আত্মপ্রকাশ করে তখনই ঘটে ছন্দপতন।

যতীন দাসের অমর আত্মদানের ঠিক অব্যবহিত পরেই এমনি এক কুশ্রী রূঢ় ছন্দোভঙ্গের ঘটনা প্রত্যক্ষ করি নিখিল বঙ্গ ছাত্র-সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে। আগেই স্থির হয়েছিল দ্বিতীয় অধিবেশন হবে ময়মনসিংহে। ঐ শহরটি যুগান্তর দলের শক্তিশালী ঘাঁটি বলে জানতাম। এবারকার সম্মেলন প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে তাও ওখানে যাওয়ার আগে শুনেছিলাম। বেশির ভাগ জেলা ছাত্র-সমিতি মত প্রকাশ করেছিল যে, এবার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য বাংলার বাইরের কোন জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হোক। মুসলিম ছাত্রেরা সাধারণভাবে আন্দোলন এবং নিখিল বঙ্গ ছাত্র-সমিতি থেকে দূরে সরে ছিল। তাদের যাতে টেনে আনা যায় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে ঐ প্রস্তাব করা হয়। হঠাৎ শুনি অভ্যর্থনা সমিতি সুভাষচন্দ্রকে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এতে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুভাষবাবু নিখিল বঙ্গ ছাত্র-সমিতির একজন শুভাকাঙ্ক্ষী এবং প্রথম থেকেই সমিতি তাঁর সমর্থন লাভ করেছে। প্রদেশ কংগ্রেসের দলাদলি সত্ত্বেও তরুণদের উপর তাঁর বিরাট প্রভাব। তাঁর নামকে এভাবে বিতর্কের সঙ্গে জড়িত করাটা অনেকেই পছন্দ করেনি।

সমস্যার সমাধান করে দিলেন সুভাষবাবু নিজে, সভাপতি হতে অসম্মতি জানিয়ে। তখন আগের প্রস্তাব অনুসারে পাঞ্জাবের প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা ডাঃ আলমকে সভাপতি করা স্থির হয়। ডাঃ আলমও সম্মতি জ্ঞাপন করেন। নিখিল বঙ্গ ছাত্র-সমিতির মধ্যে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের কর্মীরা ছাড়াও ছিল বহু নির্দলীয় ছাত্রকর্মী এবং নেতা। কার্যকরী কমিটির অধিকাংশই কোন দলের সঙ্গে যুক্ত নয় এবং তাদের কোন বিশেষ দলের সমর্থক বলা চলে না। উপরন্তু সমিতি প্রথম থেকেই চেষ্টা করেছে ছাত্রদের নিজস্ব স্বাধীন সংগঠন হিসাবে কাজ করতে। ছাত্র আন্দোলন কোন দলের লেজুড় হওয়া দূরে থাকুক নিজেকে জাতীয় কংগ্রেসের লেজুড়েও পরিণত করবে না, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবে নিজের বিচার বিবেচনা এবং সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। এই নীতি অনুসরণের ফলেই মাত্র এক বৎসরের মধ্যে নিখিল বঙ্গ ছাত্র-সমিতি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদের সমস্ত অংশেরই আস্থাভাজন হয়ে উঠেছিল। তাই অনেকের মনেই আশা ছিল অনুশীলন-যুগান্তরের ঝগড়া বা প্রদেশ কংগ্রেসের দলাদলির জেরটা হয়ত এড়ানো সম্ভব হবে। অধিবেশনের

প্রথম দিনটি অতিবাহিত হয় শান্তিপূর্ণভাবে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন রেবতী বর্মণ। তাঁর পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার খ্যাতি আমরা উত্তরবঙ্গে বসেও শুনেছি। তিনি যে সাম্যবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন এমন কথাও কানে এসেছে। তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বলিষ্ঠ উল্লেখ ছিল। সভাপতির ভাষণে ডাঃ আলম যতীন দাসের উদ্দেশ্যে এক আবেগদীপ্ত বক্তৃতায় শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাংলার ছাত্রদের আগামী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তৃতায় প্রতিধ্বনিত হয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত। তিনি বলেন যে, তরুণদের মন বহুল পরিমাণে অতীত সংস্কারের প্রভাবমুক্ত। তাই "সাম্প্রদায়িকতা ধ্বংস হোক" এই আওয়াজ ধ্বনিত হয়ে উঠুক তাদের কণ্ঠে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং মূল সভাপতির ভাষণের পর সেদিন রাজনৈতিক প্রস্তাবগুলি গৃহীত হল সর্বসম্মতভাবে। কিন্তু বিরোধ অত্যন্ত তিক্তভাবে আত্মপ্রকাশ করল দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে। দেখা দেয় তুমুল বিশৃঙ্খলা। কি নিয়ে বিরোধ সেকথাও সেই মুহূর্তে ভাল করে বোঝার সুযোগ পাই নি। অনেকে অভিযোগ করে যে, প্রতিনিধি নয় এমন বহু ব্যক্তিকে সভাকক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছে। সভাপতি ডাঃ আলম অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উপস্থিত প্রতিনিধিদের বেশির ভাগের সঙ্গে মিলে আমরা অভ্যর্থনা সমিতির প্রতি ধিক্কার জানিয়ে সভামণ্ডপ ছেড়ে চলে আসি।

দ্বিধাবিভক্ত হল ছাত্র সংগঠন। একদিকে নিখিল বঙ্গ ছাত্র-সমিতি (এ-বি-এস-এ) অন্যদিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র-সমিতি (বি-পি-এস-এ)। নির্দলীয় ছাত্রনেতাদের প্রায় সকলেই রয়েছেন এ-বি-এস-এ-তে। সাধারণ ছাত্রদের উপর আমাদের সংগঠনের প্রভাবই বেশি। বিশেষত রাজশাহীতে বি-পি-এস-এর কর্মী সংখ্যা খুব নগণ্য। তবু এই ভাঙ্গনকে সহজভাবে মেনে নিতে পারি না। এ যে শক্তির নিছক অপচয়! তবে সাময়িক অবসাদ ঝেড়ে ফেলে সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করি। মুসলিম ছাত্রদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার প্রশ্নটা রাজশাহীতেও সামনে এসে যায়। এতদিন তারা ছিল মোটের উপর নিষ্ক্রিয় হয়ে। ক্লাসের বাইরে তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ খুবই সামান্য। মাঝে মাঝে ফুলার হোস্টেলে বা নিউ হোস্টেলের মুসলিম ছাত্রবন্ধুকে দুই একজন সহপাঠীর ঘরে আড্ডা দিতে গিয়েছি বটে।

তা কখনও নিতান্ত ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যের গণ্ডী ছাড়িয়ে যায় নি। সুরেন দাশগুপ্তের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু নুরুদ্দীন থাকে ফুলার হোস্টেলে। সে মনে-প্রাণে খাঁটি জাতীয়তাবাদী। ছাত্র-সমিতির সভাতেও যোগদান করে, কিন্তু তারই কাছে শুনি যে, অন্য মুসলিম ছাত্ররা সেটা খুব ভাল চোখে দেখে না। তারা নাকি ছাত্র আন্দোলনকে হিন্দুদের আন্দোলন বলেই মনে করে। এতদিন তারা কলেজ ইউনিয়ন সম্বন্ধেও উদাসীন ছিল। প্রীতি-সম্মেলনে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে শুধু দর্শকের ভূমিকাই নিয়ে এসেছে। সম্প্রতি তাদের মধ্যে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কলেজ ইউনিয়নে দুজন মুসলিম ছাত্র নির্বাচিত হয়েছে। এদের মধ্যে ওয়াজুল চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। আবদুল হামাদ আমার সহপাঠী। হামাদ খুব শান্ত প্রকৃতির, স্বল্পভাষী ছেলে। ওয়াজুল তার বিপরীত। সব সময় মুখে যেন খৈ ফোটে। তার একজন নিকট আত্মীয় তখন রাজশাহীর জেলা ও সেসনস্ জজের পদে অধিষ্ঠিত। কলেজ ইউনিয়নের সভাতে ওয়াজুল একটু সুযোগ পেলেই সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বলে "আমার আঙ্কল এই কথা বলেছেন", এমনি ধরনের আরো কত কি! আমরা সেটাকে হাসির খোরাক হিসাবেই নিয়েছি। এবার কলেজের বার্ষিক প্রীতি-সম্মেলন উপলক্ষে মুসলিম ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাদের স্বতন্ত্র সত্তার সক্রিয় অভিব্যক্তি হয়। কলেজ ইউনিয়নের সভায় প্রস্তাব উঠেছে যে, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে বিশিষ্ট অতিথিরূপে আমন্ত্রণ করা হোক। ওয়াজুল দাবি করে যে, একজন মুসলিম শিক্ষাবিদ্‌কেও আমন্ত্রণ জানাতে হবে। ছাত্র প্রতিনিধিদের দুই একজন বিরোধিতা করে। তাদের যুক্তি, সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন এখানে তোলা সঙ্গত নয়। সে যুক্তি আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়। সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন তোলা উচিত নয় বল্লেই কি তাকে চাপা দেওয়া যায়? তিক্ততা সৃষ্টির সম্ভাবনাকে এড়ানো সম্ভব হয় সুরেন দাশগুপ্তের বিচক্ষণতার ফলে। সে ওয়াজুলকে জিজ্ঞাসা করে যে, তারা কার নাম প্রস্তাব করতে চায়? ওয়াজুল ডঃ শহীদুল্লার নাম করতে সুরেন সম্পাদক হিসাবে তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানায়, বলে যে "তাঁর মতন একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে আমাদের মধ্যে পেলে সেটা হবে সৌভাগ্যের বিষয়।"

সেবারকার সম্মেলনে দুজন বিশিষ্ট অতিথির মধ্যে ডঃ শহীদুল্লার বক্তৃতাই আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছিল। সেই ক্ষুদ্রকায় জ্ঞানতাপসের প্রশান্ত

ব্যক্তিত্ব এবং উদার মানবতাবাদী মনোভাবের দ্বারা তিনি শ্রোতাদের মনে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে সুরেনের সঙ্গে এই সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা হয়। সে বলে, একদিকে যেমন বিদেশী গভর্ণমেন্ট ভেদনীতির অস্ত্র হিসাবে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, তেমনি হিন্দুদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি রয়েছে সে কথাও অস্বীকার করা চলে না। বিপ্লবী সমিতিগুলির মধ্যে মুসলিমদের সম্বন্ধে রয়েছে অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব। বিশেষত পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে।

এই ঘটনার পর থেকে আমি মাঝে মাঝে হামাদের সঙ্গে আলোচনা করি। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তার একটা প্রতিষ্ঠা আছে। তাকে যদি আমাদের ছাত্র সমিতিতে টানা যায় তাহলে মুসলিম ছাত্রদের মনের দুয়ারে পৌঁছবার সেতু রচিত হবে। আমি জিজ্ঞাসা করি: "আপনারা ছাত্র-সমিতি থেকে দূরে সরে রয়েছেন কেন? ছাত্র-সমিতি ত জাতীয় কংগ্রেসের বা কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড় নয়। আপনারা ভিতরে এসে সমান অধিকার নিয়ে অংশগ্রহণ করুন। স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করায় ত এখানে কোন বাধা নেই।" হামাদ আমার বক্তব্যকে উড়িয়ে দিতে পারে না, শুধু বলে: "আমি যদি আপনাদের সঙ্গে যোগ দিই তাহলে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা ভুল বুঝবে।"

দুর্ভাগ্যক্রমে নিউ হোস্টেলের জনকয়েক মাথাগরম ছাত্রের অবিবেচনা-প্রসূত কাজের ফলে রাজশাহী শহরে সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ অশান্ত হয়ে ওঠে। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, হোস্টেলের অধ্যক্ষ, শহরের হিন্দু মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নেতৃবৃন্দ এবং ছাত্র নেতাদের মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যাপারটা অবশ্য বেশি দূর পর্যন্ত গড়াতে পারে না। রাজশাহী জেলা তথা শহরের জনসংখ্যা মুসলিম প্রধান হওয়া সত্ত্বেও এখানে এতদিন সাম্প্রদায়িক অসদ্ভাবের কথা শুনি নি। কিন্তু এই ঘটনায় সেই সদ্ভাবে যে চিড় ধরে, কারা যেন নেপথ্য থেকে তাকিয়ে বাড়িয়ে তোলার জন্য উঠেপড়ে লেগে যায়। কেউ কেউ বলে ওয়াজুলের 'আঙ্কল' রয়েছেন সব কিছুর মূলে। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অনুকরণে মুসলিম পল্লীতে পল্লীতে তরুণেরা প্রতি রাত্রে কুচকাওয়াজ শুরু করে দেয়। মুসলমানদের কোন একটা পরবের দিন শহরের আশ পাশের গ্রামাঞ্চল থেকে লোক এনে বিশাল মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলের

পুরোভাগে মার্চ করে ইউনিফর্ম-পরা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেই মিছিল দেখতে দেখতে প্রশ্ন জাগে মনে। আমরা যে স্বাধীনতা চাই সে ত শুধু হিন্দুর জন্য নয়। শুনেছি একেবারে গোড়ার যুগে কেউ কেউ হিন্দু-রাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু সে সব ধারণাকে অনেক পিছনে ফেলেই ত বিপ্লবী আন্দোলন এগিয়ে এসেছে। আমরা, যারা আজকার দিনে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মুক্তির কথা ভাবতে শিখেছি তারা ত ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত শোষিত মানুষের দুঃখ মোচনের সঙ্কল্প নিয়েছি। কংগ্রেসের নেতারাও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের একটি প্রধান স্তম্ভ হিসাবে দেখে থাকেন। তবে কেন মুসলিম জনগণের বড় অংশটাই স্বাধীনতা সংগ্রামের থেকে দূরে সরে রয়েছে? সেদিন জবাব খুঁজে পাই নি। পাওয়ার জন্য যে বড়-একটা চেষ্টা করেছিলাম তাও নয়। প্রশ্ন উঠেছে, আবার অব্যবহিত বর্তমানের কর্মচাঞ্চল্যে কোথায় তলিয়ে গিয়েছে। সহকর্মীদের ভিতরে এক সুরেন ছাড়া আর কাউকে এই সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতেও দেখি নি। বাঁধাছকের বাইরে কোন প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে তারা রাজী নয়।

ইতিমধ্যে একদিন নিউ হোস্টেল খানাতল্লাসী হয়ে গিয়েছে। ভোরে উঠে দেখি হোস্টেল কম্পাউণ্ডের বাইরে চারিপাশে লালপাগড়ীতে ঘিরে ফেলেছে। পুলিস তখনও ভিতরে প্রবেশ করে নি। সেজন্য প্রিন্সিপ্যালের অনুমতি চাই। প্রিন্সিপ্যাল বলে পাঠিয়েছেন তিনি এলে তবে পুলিস ভিতরে ঢুকবে। তাঁর উপস্থিতি ছাড়া ছাত্রদের ঘর তল্লাসী করা চলবে না। ছেলেদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য আর জল্পনা। আমাদের বন্ধুদের যার যার কাছে বে-আইনী পুস্তক-পুস্তিকা বা পুলিসের নজরে আপত্তিজনক বই আছে সে সব এই অবকাশে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা হয়। পরে দেখা গেল যে, পুলিস শুধু ফিফ্‌থ ব্লকে একজন ছাত্রনেতার ঘর তল্লাসী করে চলে যায়। আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায় নি। ক্রমে পুলিসের অতর্কিত ভাবে হানা দেওয়ার কারণ জানতে পারি। গতকাল রাতে রাজশাহী থেকে নাটোরগামী মেল ভ্যানের উপর ডাকাতির চেষ্টা সফল হয় নি। আক্রমণকারীদের একজন আহত অবস্থায় ধরা পড়েছে। সে লোকটি নাকি ফিফ্‌থ ব্লকে উক্ত ছাত্র নেতার অতিথি হয়েছিল বলে পুলিস সন্ধান পেয়েছে।

পুলিসের বেড়াজালের মধ্যে পড়ার এই প্রথম অভিজ্ঞতা। ফাঁড়া সহজেই

কেটে গেল দেখে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। কিন্তু কারা এই ডাকাতির উদ্যোক্তা? তবে কি বিদ্রোহীদের কোনো গ্রুপ অধৈর্য হয়ে 'অ্যাকশন' শুরু করে দিল? আর অ্যাকশনের সূচনাতেই ব্যর্থতা? সেই চোরাগলিরই হবে পুনরাবৃত্তি? অভ্যুত্থানের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অর্থসংগ্রহের জন্য রাজনৈতিক ডাকাতি। সেই উপলক্ষ্যে ব্যাপক ধরপাকড়। হয়ত নতুন করে কোনো ষড়যন্ত্রের মামলা। এমনি ভাবেই চলতে থাকবে বিপ্লবী যৌবনশক্তির অপচয়?

এবার এমন আরো দুজন নতুন সহকর্মী পেয়েছি যাদের সঙ্গে মন খুলে আলোচনা করা চলে। নিশীথ জেলা ছাত্র সম্মেলনের সময় কার্যকরী কমিটির সভ্য রূপে নির্বাচিত হয়েছিল। এখানে যুগান্তরের ছেলেরা বি-পি-এস-এ গঠন করার পর একজন সহকারী সম্পাদকের যে স্থানটি শূন্য হয় সেখানে কো-অপট্ করে নেওয়া হয় হিমাদ্রিকে। নিশীথের মতামতের উপরে যে সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাব সুস্পষ্ট তা আগেই লক্ষ্য করেছিলাম। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর জানতে পারি যে, "ইয়ং কমরেডস্ লীগ"এর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। এখানে ছাত্র আন্দোলনে অনুশীলনের সঙ্গে একত্রে কাজ করার নির্দেশ আছে তার উপরে। হিমাদ্রি অনুশীলনেরই কর্মী। সে এই শহরেরই ছেলে। এবার এসে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। বয়সে আমার থেকে কিছুটা বড় হলেও তার সঙ্গে মতের ও মনের মিলের ফলে কিছুদিনের মধ্যেই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। নিশীথের বেলায় ঠিক তা হয় না। তার সঙ্গে তর্কটাই হয় বেশি। রাজনৈতিক ডাকাতি, প্রতিশোধমূলক কার্যকলাপ, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা, এই সব কিছু সম্বন্ধে নিশীথের মতামত খুব স্পষ্ট। সে বলে যে, এসব হল বন্ধ্যা কর্মসূচী। বিপ্লবের প্রাণশক্তি দেশের শ্রমিক ও কৃষক। তাদের সংগঠিত করাই এই মুহূর্তে প্রধান করণীয়।

ততদিনে আমরা সাম্যবাদী সাহিত্যের সঙ্গে আরো একটু বেশি পরিচিত হয়েছি। জেনেছি যে, কালুদাও কমিউনিস্ট মতবাদের সমর্থক। তাঁর নিজস্ব সংগ্রহ থেকে বই পড়তে দিয়েছেন। কিন্তু কেন জানি না কোনদিন আলোচনায় উৎসাহ দেখান নি। আমাদের অনুরোধ সত্ত্বেও। কালুদার কাছে থেকেই নিয়ে পড়েছি "এ. বি. সি. অফ কমিউনিজম" এবং লেনিনের "ইম্পিরিয়ালিজম"। পড়ে যতটুকু বুঝেছি তাতে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের

চরিত্র সম্বন্ধে নতুন আলোক লাভ করেছি। পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, পরাধীনতা, ঔপনিবেশিক শোষণ এবং সামাজিক মুক্তি—এই সব ধারণার অন্তর্নিহিত যোগসূত্রগুলি যেন একটু একটু করে চোখের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। সাম্যবাদী মতাদর্শকে তখন পর্যন্ত পুরোপুরি গ্রহণ করিনি। সে সম্বন্ধে ধারণায় অনেক অস্পষ্টতা রয়ে গিয়েছে। বহু জিজ্ঞাসা আছে মনে। তবুও সেদিকে যে প্রবলভাবে ঝুঁকেছি তাতে সন্দেহ নেই। যথেষ্ট সহানুভূতি পোষণ করি কমিউনিস্টদের প্রতি। ভাবি যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে পরবর্তী অধ্যায়ে হয়ত তারাই পথ দেখাবে। সহকর্মীদের অনেকে যখন কমিউনিস্টদের প্রতি উন্নাসিক মনোভাব প্রকাশ করে তখন তাদের সঙ্গে তর্ক করি। সেই সময়ে বামপন্থী মহলের তথা বিপ্লবীদের এক অংশের মনে মুসোলিনী সম্বন্ধে মোহ সৃষ্টি হয়েছিল। কিভাবে তারুণ্যের শক্তিকে সংগঠিত করে একটা পশ্চাৎপদ ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলা যায় তার পথ নাকি দেখিয়েছে জবরদস্ত মানুষ মুসোলিনী। পদানত দেশের দুর্বল মানুষদের মনে শক্তিমান পুরুষদের সম্বন্ধে যে মনস্তাত্ত্বিক আকর্ষণ থাকে হয়ত এটা ছিল তারই অভিব্যক্তি। অথবা যারা মধ্যবিত্ত তরুণদেরই বিপ্লবের প্রাণশক্তি বলে মনে করে তারা হয়ত ফ্যাসিস্টদের সামরিক কায়দায় গড়া যুবসংগঠনের দিকটিকে বড় করে দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল। ফ্যাসিজম কি সে কথা আমিও যে তখন ভালভাবে বুঝেছি এমন নয়। কিন্তু এটুকু জেনেছিলাম যে, তা কমিউনিজমকেই নিজের প্রধান শত্রুরূপে চিহ্নিত করেছে। শুধু এই কারণেই ফ্যাসিজমকে গোড়া থেকে বর্জন করেছি।

মুসোলিনীকে দেখেছি ঘৃণার চোখে। অথচ সাম্যবাদের প্রতি এতখানি সহানুভূতি সত্ত্বেও নিশীথের সঙ্গে আমার হিমাদ্রির ও সুরেনের প্রচণ্ড মতভেদ দেখা দেয়। সে জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণ ও বাম, উভয়পন্থী নেতৃত্ব এবং বিপ্লবী সমিতিগুলির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে। সমালোচনার তীব্রতায় আমাদের আপত্তি ছিল না। ততদিনে নিজেরাও ধীরে ধীরে নেতৃত্বের সমালোচক হয়ে উঠেছি, অভ্যস্ত হয়েছি সমালোচনা শুনতে। কিন্তু নিশীথের বক্তব্য যে পুরোপুরি নেতিবাচক। জাতীয় কংগ্রেস বা মধ্যবিত্ত তরুণদের গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের যে কোনো ইতিবাচক দিক আছে তা সে স্বীকার করে না। ভারতের জাতীয় সংগ্রামে যে এদের কোনো অবদান আছে সেকথা মানতেও রাজী নয়। আমরা দেখি এ-ও কমিউনিস্ট-বিরোধীদের ধরনেই এক

পাল্টা উন্নাসিক মনোভাব। সুরেন তাকে বিদ্রূপ ভরে জিজ্ঞাসা করে: "তাহলে কি বলতে চাও যে দেশের সত্যকার স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে ইয়ং কমরেডস্ লীগের জন্মলগ্ন থেকে?" আমরা তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করি: 'আসন্ন যে সংগ্রামের জন্য দেশবাসী প্রস্তুত হচ্ছে সে বিষয়ে তোমাদের মনোভাব কি হবে? তোমরা তাতে অংশগ্রহণ করবে কি না?' নিশীথ সন্তোষজনক জবাব দেওয়া দূরে থাকুক প্রশ্নটিকেই এড়িয়ে যেতে চায়। সে বলে, মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন শুরু করবেন কিনা সন্দেহ। যদি নেহাৎ করেনই, সেটা হবে লোক দেখানো ব্যাপার! তাও থাকবে অহিংসা নীতির নানা বিধিনিষেধের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। শুনে আমি আর সুরেন বড় নিরাশ হই। নিশীথকে শুধাই: "এটা কি তোমার নিজের কথা না কমিউনিস্টদের সকলেই এই মত পোষণ করে।" সে বোঝাতে চায় যে, তার বক্তব্য কমিউনিস্টদের সাধারণ চিন্তাধারার অভিব্যক্তি। একদিন এমনি বিতর্কের সময় হিমাদ্রি উপস্থিত ছিল। নিশীথের কথা শুনে সে মন্তব্য করে: "এটা যদি সত্যি কমিউনিস্টদের সাধারণ সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তবে তারা মস্ত বড় ভুল করতে চলেছে। আর সেই ভুলের মাশুল যোগাতে হবে তাদের দীর্ঘকাল ধরে।" নিশীথ হিমাদ্রিকে প্রশ্ন করে: "তুমি কি গান্ধীজীর নেতৃত্বের উপর ভরসা রাখো?" হিমাদ্রি বলে এটা কোন ব্যক্তির উপরে ভরসার কথা নয়। বাস্তবে যা হবে বা হতে চলেছে আমি বলছি তার কথা।

দেশের সাধারণ মানুষের মনে বারুদের স্তূপ জমা হয়ে আছে। মহাত্মাজী যত সীমিতভাবে আন্দোলন শুরু করুন না কেন, দেখতে দেখতে সে আন্দোলন ব্যাপক রূপ নেবে। গান্ধীজী হয়ত তখন আগের বারের মত রাশ টেনে ধরতে চাইবেন। কিন্তু বামপন্থীরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়, যদি তারা সুপরিকল্পিত কর্মসূচী নিয়ে প্রস্তুত থাকে তাহলে সেই সঙ্কট মুহূর্তে আন্দোলনের নেতৃত্ব এসে যাবে তাদেরই হাতে। শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের যতটুকু প্রভাব আছে তাই নিয়ে যদি তারা কংগ্রেসের বামপন্থীদের সঙ্গে যোগ দেয় তবে গণবিক্ষোভ নেবে গণঅভ্যুত্থানের রূপ। আর যে সব বিপ্লবী আজ জনগণের সঙ্গে সংশ্রবহীন হয়ে সশস্ত্র কার্যকলাপের স্বপ্নে মশগুল হয়ে রয়েছে তারা যদি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে তবে সেই মুহূর্তটি পরিণত হবে গণঅভ্যুত্থানকে সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ দেওয়ার পরম লগ্নে। এক নিঃশ্বাসে আবেগের ভরে এতগুলি কথা বলে হিমাদ্রি নীরব হয়।

বন্ধুকে আজ দেখি সম্পূর্ণ নতুন রূপে। সে যে বিপ্লব সম্বন্ধে এত গভীর এবং সুশৃঙ্খলভাবে চিন্তা করে তা ছিল আমাদের ধারণার অতীত। তার জোরালো যুক্তি নিশীথের মুখ বন্ধ করে দেয়। সে শুধু বলে: "তুমি দেখছি বিপ্লবের একটা ছক তৈরি করে রেখেছ।" হিমাদ্রি জবাব দেয়: "এ ছক আমি আঁকি নি, চোখে দেখেছি। আমিও তোমাদের মতন বিপ্লবের স্বপ্ন দেখি বটে তবে সেই সাথে আমার কান পাতা রয়েছে দেশের মাটিতে। তোমরা জানো না যে, আমি কিছুদিন উত্তর ভারতে নানা প্রদেশে ঘুরেছি। গ্রামের মানুষের কুটিরে দিন যাপন করেছি। ভারতের কৃষি-সঙ্কটের কথা তোমরা পড়েছ শুধু অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকে। আমি তার সত্যকার চেহারাটা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছি। কৃষকের জীবন আজ এমন এক চরম সঙ্কটের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, তারা তপ্ত খোলার মতন হয়ে রয়েছে। তাদের অন্তরের না-বলা ভাষাকে সঠিকভাবে বুঝে যদি কেউ ডাক দিতে পারে তবে তারা তৎক্ষণাৎ সাড়া দেবে।"

আমার মনে পড়ে যায় সেই ছোটবেলায় তরাইয়ের আদিবাসী মজুরদের হঠাৎ ক্ষেপে ওঠার ঘটনা। তবু আমি হিমাদ্রিকে জিজ্ঞাসা করি: "তাই যদি হবে তাহলে তারা মুখ বুঁজে বোবা কান্নায় সব দুঃখকষ্ট সহ্য করে চলেছে কেন? এখনও ত ক্ষেপে ওঠেনি। তারা রাজনীতি-সচেতন হয়ে ওঠে নি এটাই কি কারণ নয়?" হিমাদ্রি বলে: "ভেবে দেখ সিপাহী বিদ্রোহের সময়-কার কথা। তখন দেশের মানুষের ধূমায়িত অসন্তোষ একটা উপলক্ষ করে ফেটে পড়েছিল। যখন নীলবিদ্রোহ হয়েছিল তখনও কৃষকেরা তোমার আমার মাপকাঠিতে রাজনীতি-সচেতন ছিল না। সাঁওতাল বিদ্রোহের সম্বন্ধেও কি তাই বলা চলে না? তারা দীর্ঘদিন ধরে বোবা কান্নায় অনেক জুলুম সহ্য করেছে। তারপর যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে তখন বাঁধভাঙা জলস্রোতের মতই উদ্দাম হয়ে উঠেছে। তখন ঠিকমত নেতৃত্ব পায় নি বলে তাদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে। আজ পরিস্থিতি ঠিক সেই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। সত্যিকারের কাণ্ডারীর কাজ হবে এই বিক্ষোভকে সঠিক পথে পরিচালিত করা।" আমি বলি: "তুমি যতটা স্বচ্ছভাবে চিন্তা করতে পেরেছ নেতারা তা পারবেন না কেন? তাঁরা চিন্তা করছেন না এমনটা ভাবারই বা কি কারণ আছে?" হিমাদ্রি ক্ষোভের সঙ্গে বলে: "আমাদের দাদারা অপেক্ষা করে আছেন কবে আর একটা

বিশ্বযুদ্ধ বাধবে আর সেই সুযোগে তাঁরা দেশে বিদ্রোহ ঘটাবেন। বিদ্রোহী দল ইস্টার বিদ্রোহের ধরনে অভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখছে। তারা বলে যে, বিপ্লব শুরু করে দিলে জনসাধারণ আপনা থেকে তাতে যোগ দেবে। অথচ দেশের মানুষকে এরা কেউ সত্যি সত্যি চেনে না বা তাদের মনের খবর রাখে না। নিশীথ ব্যঙ্গ করে : "চিনেছ কেবল তুমি। তাহলে তুমিই দেশকে পথ দেখাও।" হিমাদ্রি এবার উত্তেজিত হয়ে বলে : "পথ দেখাতে পারতে তোমরা, কমিউনিস্টরা। কিন্তু তোমরা জাতীয় আন্দোলনের থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে চাও। এটাই আমার চোখে বড় ট্রাজেডি।" এর পর আর বেশিক্ষণ আলোচনা চলে না। আমরা হোস্টেলে যে যার ব্লকে ফিরে আসি। হিমাদ্রি তাদের বাসায় ফেরে।

কথাগুলি আমার মনের গভীরে গেঁথে যায়। তার সম্বন্ধে একটা বিস্ময় মেশানো শ্রদ্ধার ভাব জাগে। যে ছিল বন্ধু ও সহযাত্রী সে যেন গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হয়। যে সব প্রশ্নের জবাব দাদাদের কাছে পাব কিনা সন্দেহ ছিল, তার কত সহজে সমাধান করে দিয়েছে। হিমাদ্রির সঙ্গে এরপর থেকে প্রায়ই আলোচনা হয়। তারই কাছে শুনি সে সম্প্রতি কয়েকমাস পাঞ্জাবে কাটিয়ে এসেছে। সেখানে থাকাকালে নওজোয়ান ভারতসভার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কর্মীর সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে তার মতবিনিময় হয়েছে। সেদিনের কথাগুলি নাকি নওজোয়ান ভারতসভারই কর্মীদের সাম্প্রতিক চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি। নওজোয়ান ভারতসভার প্রতিষ্ঠাতা সর্দার ভগৎ সিং এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা। শুনি আরো অনেক কথা। নওজোয়ান ভারতসভা পাঞ্জাবের ছাত্র ও যুব আন্দোলনকে সমাজতন্ত্রের আদর্শের অভিমুখে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। ভগৎ সিংয়ের পরিকল্পনা ছিল যে, নওজোয়ান ভারতসভা হবে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচারের প্রকাশ্য সংগঠন। সেই সঙ্গে কৃষকদের মধ্যেও কাজ চলবে। আর "হিন্দুস্থান সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন" গোপনে প্রস্তুতি করবে যাতে উপযুক্ত সময়ে গণ-আন্দোলনের সশস্ত্র বাহিনী রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। শুনে খটকা লাগে। তাই যদি হয় তাহলে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা সণ্ডার্স হত্যা ও কেন্দ্রীয় এ্যাসেম্বলীতে বোমা নিক্ষেপের মতন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে জড়িত হয়ে পড়লেন কেন? তিনি যদি আর দু'টি বৎসর ধৈর্য ধরে থাকতেন তবে হয়ত আসন্ন আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব হত। হিমাদ্রি জবাব দেয় : "নিজের মনের ভিতরটা একবার তলিয়ে দেখো।

রোমান্টিসিজমের প্রভাব কি তুমি বা আমি পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পেরেছি? যুক্তি দিয়ে যা বুঝি, আবেগ তা মানতে চায় না। সর্দার ভগৎ সিং শেষ পর্যন্ত সেই রোম্যান্টিক উন্মাদনার সামনে আত্মসমর্পণ করেছেন। এখানে যদি বিদ্রোহী গ্রুপ কোন চমকপ্রদ এ্যাকশন করে উঠতে পারে, তখন দেখবে আমরাও হয়ত স্রোতে গা ভাসাতে বাধ্য হব। আর দাদারা যদি নির্দেশ দান করেন তবে ত কথাই নেই।”

হিমাদ্রির সাহচর্য আমার চিন্তার বিকাশে কতখানি অবদান দিয়েছে তার সঠিক পরিমাপ করা তখন সম্ভব ছিল না। আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগেকার সেই দিনগুলির দিকে যখন ফিরে তাকাই তখন বুঝি যে, আমাদের জানার গণ্ডি ছিল কত সঙ্কীর্ণ আর সুযোগ ছিল কত সীমিত। বিশেষ করে রাজশাহীর মত একটি মফস্বল শহরে। এখন যেমন রেডিওর দৌলতে পৃথিবীর এক প্রান্তে কোন ঘটনা ঘটলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জানা যায়, সেদিন তা ছিল আমাদের স্বপ্নের অতীত। রেডিওর সঙ্গেই ত পরিচিত হয়েছি আরো বছরখানেক পরে, কলকাতায় এসে। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিকে কাজ করতে হত যে-কোন মুহূর্তে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে। দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় সংবাদ বিতরণের পরিধিও ছিল সীমিত। অন্য প্রদেশের খবরাখবর স্থানলাভ করত চাঞ্চল্যকর কোন বৃহৎ ঘটনা ঘটলে। সাপ্তাহিক কয়েকটি পত্রিকায় অবশ্য আইন বাঁচিয়ে রাজনৈতিক মত ও পথ নিয়ে কিছু কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। তবে তা খুব সুসংবদ্ধ ছিল না। সমস্ত পত্রিকা আমাদের ঐ শহরে যেয়ে পৌঁছাতও না। ‘লাঙল’ বা ‘ধূমকেতু’ কিম্বা ‘গণবাণী’র নাম শুনলেও চোখে দেখি নি। সাম্যবাদী সাহিত্যের যে দুই একখানা বই কাস্টমসের চোখে ধূলি দিয়ে বিদেশ থেকে আমদানী হত সেগুলি সংগ্রহ করতে হত লুকিয়ে। পড়তেও হত গোপনে। বে-আইনী প্রচারপত্র ও পুস্তিকা হাতে পৌঁছাত সুড়ঙ্গ পথ পরিক্রমা করে, হয়ত প্রকাশিত হওয়ার বেশ কয়েক বৎসর পরে।

ছাত্র ও যুবকদের কোন সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান তখনও গড়ে ওঠে নি। শুনেছি কয়েকবার চেষ্টা হয়েছে, দানা বাঁধে নি। বাংলার বাইরে বিপ্লবী সমিতিগুলি কিভাবে কাজ করছে তা জানতেন সম্ভবত মুষ্টিমেয় কয়েকজন নেতা বা কর্মী, যাদের সঙ্গে কোন না কোন সূত্রে ঐসব সমিতির যোগাযোগ ছিল।

গোপন আন্দোলন সম্বন্ধে তথ্য জানার জন্য অন্যের মুখে শোনা কথার উপরে নির্ভর করা ছাড়া উপায় ছিল না। নওজোয়ান ভারতসভার নাম শুনেছিলাম সংবাদপত্রের মারফত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা উপলক্ষে। তার কার্যকলাপ বা কর্মপন্থা সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানার সুযোগ পাই নি। শুনেছিলাম যে, ভগৎ সিংয়ের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় যোগেশ চাটার্জির গড়ে তোলা "হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনে"র সভ্য হিসাবে। ঐ এ্যাসোসিয়েশনের প্রচার পত্র পড়ার সুযোগ হয়েছিল বছর খানেক পূর্বে। কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় বহু কর্মী গ্রেপ্তার হওয়ার পর যে ঐ সংগঠনটি ভগৎ সিংয়ের এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর নেতৃত্বে "হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন" নামে নতুনভাবে কাজ আরম্ভ করেছিল সে খবর জানা ছিল না। প্রথম জানতে পারি হিমাদ্রির কাছে। আরো অনেক কিছু জানার জন্য কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়।

পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সঙ্গে হিমাদ্রির যোগাযোগ কি নিতান্ত আকস্মিক অথবা আমাদের সমিতির নেতারাই তাকে সেজন্য ভার দিয়ে পাঠিয়েছিলেন? কৌতূহল মনেই চেপে রাখি। হিমাদ্রি যত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হোক্ না কেন, মন্ত্রগুপ্তির শিক্ষা সেও পেয়েছে, আমিও পেয়েছি। যা আমার জানার প্রয়োজন নেই সে সম্বন্ধে অযথা আগ্রহ দেখানোটা ঐ শিক্ষার বিরুদ্ধে যায়। তাই কোন প্রশ্ন করি না। অন্য প্রসঙ্গ ওঠে। এই অধ্যায়ে পাঞ্জাবের বিপ্লবীরাই পথ দেখিয়েছে। কিন্তু তাদের চিন্তার খবর আমরা কতটুকু রাখি? তাদের দৃষ্টান্ত থেকে কি নির্ভীক বীরত্ব আর মৃত্যুভয়হীন আত্মদানের শিক্ষা ছাড়া অন্য কিছু নেওয়ার নেই? বিপ্লবীদের সাধনায় তারা যে এক নতুন পথ রচনার প্রয়াস পেয়েছিল সে বিষয়ে কি বাংলার ছেলেরা কিছু জানার বা তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে না? হিমাদ্রি বলে, "জানার বা তলিয়ে বোঝার চেষ্টা দূরে থাকুক, তার প্রয়োজন উপলব্ধি করে কয়জন? ভাবের বন্যায় গা ভাসাবার জন্যই ত বেশির ভাগ মানুষ উন্মুখ হয়ে রয়েছে।"

পূজোর ছুটি এসে যাওয়াতে আমাদের আলোচনায় সাময়িকভাবে ছেদ পড়ে। ছুটির সময়টা আমাকে যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে থাকতে হয়। আমি যে রাজনীতির আবর্তে কতটা জড়িয়ে পড়েছি অভিভাবকেরা তখনও তা বিন্দুমাত্র টের পান নি। তাঁদের কাছে সেই আগেকার মুখচোরা শান্ত নিরীহ স্বভাবের ছেলেটিই রয়ে গিয়েছি। শিলিগুড়ি গেলে বড়দা অবশ্য আর আগেকার মত

আমার চলাফেরার উপর কড়াকড়ি করতে পারেন না। এখন বি-এ পড়ছি। সুতরাং খানিকটা স্বাধীনতা দিতেই হয়। শিলিগুড়িতে সংগঠনের কাজ বেশি দূর এগোয় নি। যে কয়টি ছেলে আমাদের সঙ্গে রয়েছে তাদের বে-আইনী বই, ইস্তাহার পড়াবার ব্যবস্থা মোহনই করে। অবসর পেলে চলে যাই জলপাই-গুড়িতে বীরেনদার কাছে। তিনি এখন এই অঞ্চলে সংগঠন গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আমরা যে সব প্রশ্ন নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্কে প্রবৃত্ত হই সেগুলির ছোঁয়া তাঁর ধারে কাছে এসে পৌঁছায়নি। শিলিগুড়ির ছেলে ক্ষীরোদ আমার পরের বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজশাহী কলেজে পড়তে এসেছে। তাকে দলে টেনেছি। সে ছিল অত্যন্ত চাপা স্বভাবের ছেলে। সারা দিনে কয়টা কথা বলে তা হয়ত গোণা সম্ভব। তার উপর সে আমাকে নেতা ও খানিকটা গুরু হিসাবে গণ্য করে। তাই তার সঙ্গে আলোচনার সুযোগ বেশি ছিল না। যেটুকু হত তা একতরফা। তবু কাজ একটা কিছু খুঁজে বার করতে হবে। স্থির করি যে, দুজনে মিলে পাহাড়ের পাদদেশের গভীর অরণ্যবলয়ের মধ্য দিয়ে যে সব পায়ে চলার সংক্ষিপ্ত পথ আছে সেগুলির সঙ্গে পরিচিত হব। ভবিষ্যতে যদি কখনও এই অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধের পরিকল্পনা গৃহীত হয় তখন সে পরিচয়টা কাজে লাগবে। দিন কয়েক ঘোরার পরেই চলে যেতে হল নৈহাটিতে। সেখানে মা রয়েছেন মেজদার কাছে। মেজদা সরকারী কর্মচারী। অতএব যে কয়দিন ওখানে থাকব একেবারে লক্ষ্মী ছেলে হয়ে কাটাতে হবে। সঙ্গে করে নিয়ে যাই "জাঁ ক্রিস্তোফ" শেষের দুটি খণ্ড আর রোঁলারই অপর একটি কালজয়ী গ্রন্থ "সোল এনচান্টেড"। নৈহাটির নিঃসঙ্গ অবসরে নিজের সঙ্গে হিসাব মেলাতে বসি। যে পথের সন্ধান করেছিলাম সেদিকে অনেকটা এগিয়েছি। পেয়েছি অনেক কিছু, আবার অনেক কিছুকে ছাড়তে বা উপেক্ষা করতেও হয়েছে। নাটক রচনা মক্স করা কবে ছেড়েছি। নন্দনতত্ত্বের আলোচনা গিয়েছে পিছনে পড়ে। তবে সেজন্য অনুশোচনা নেই। ইংরেজী অনার্স ক্লাসে ইংরেজীর প্রধান অধ্যাপক সেকস্‌পীয়রের ট্রাজেডির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে মৃত্যুই ট্রাজেডি নয়। তার মর্মবস্তু হল এক বিরাট সম্ভাবনার ব্যর্থতায় পরিসমাপ্তি। ভুল পথ বেছে নেওয়ার জন্য দেখা দেয় এমন তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব যার আঘাতে সমস্ত জীবন বিষাদ হয়ে ওঠে। অনুতাপের তুষানলে হয় পদস্খলনের প্রায়শ্চিত্ত। শুনে

সঙ্কল্প করি যে, আমার জীবনকে কিছুতেই ট্রাজেডিতে পরিণত হতে দেব না। যে পথ বেছে নিয়েছি তা থেকে যেন কখনও ভ্রষ্ট না হই। সংগ্রামী অভিজ্ঞতায় অন্তর ভরে উঠবে সার্থকতার অনুভূতিতে। সে আশীর্বাদ লাভ করতে হলে যে কত কঠিন মূল্য দিতে হয় তাও ত এতদিনে কিছুটা উপলব্ধি করতে শিখেছি। 'জঁা ক্রিস্তোফ' বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় রয়েছে তার স্বাক্ষর। "সোল এন্‌চান্টেড্" বইটি থেকে রোম্যাঁ রোলাঁর আর একটি উক্তিকে পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করি—"to seek, to strive—not to find and not to yield"। অশ্রান্ত বেগে সামনের দিকেই ছুটে চলতে হবে—সংঘাতের পর সংঘাতের মধ্য দিয়ে—অন্তরে, বাহিরে। আমার সাহিত্য সৃষ্টি হবে সত্যের সন্ধানেরই অঙ্গ।

নিজেকে নিয়ে থাকার সময় বেশি দিন পাই না। ছুটি ফুরিয়ে যায়। কলেজে ফিরেই জড়িয়ে পড়তে হয় কাজের আবর্তে। জেলা কংগ্রেস এবং ছাত্র সমিতির সংগঠক হিসাবে কয়েকটি মহকুমা শহরে ও গ্রামে ঘোরার দায়িত্ব পড়ে। হোস্টেল থেকে মাঝে মাঝে অনুপস্থিত থাকতে হয়। সরকারী হোস্টেলে আইনের কড়াকড়ি যথেষ্ট। তবে আইনকে ফাঁকি দেওয়া সহজ হয় সংগঠন-শক্তির দৌলতে। কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক ব্লকে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্য থেকে একজনকে 'মনিটর' নিযুক্ত করতেন। তার দায়িত্ব অধ্যক্ষের সহকারী হিসাবে কাজ করা। প্রায় প্রতি ব্লকের মনিটর ছিল হয় সমিতির সভ্য নতুবা সমর্থক। গত বৎসর পর্যন্ত আমাদের ব্লকটাই শুধু ছিল ব্যতিক্রম। এবার সুরেন দাশগুপ্ত মনিটর মনোনীত হয়েছে। অনুপস্থিতির জন্য কোন একটা নির্দোষ অজুহাত দেখিয়ে দরখাস্ত লিখে তার হাতে দিয়ে গেলেই চলে। না দিলেও সে কোন না কোন ভাবে সামলে নেয়। আমাদের কাছে যেটা বড় তা হল জিতেশদার অনুমতি। এ-ত আসলে সমিতিরই কাজ সুতরাং তা সহজেই পাই। কিন্তু এটাকে ঢালাও অনুমতি ধরে নিয়ে অকারণে কাজে লাগাতে গিয়ে একবার বেশ বে-কায়দায় পড়তে হয়। কি একটা উপলক্ষ্যে কলেজে তিন চার দিন ছুটি। নিশীথ প্রস্তাব করে এই সুযোগে কলকাতা বেড়িয়ে আসা যাক। নির্মল তৎক্ষণাৎ সায় দেয়। আমিও প্রলোভন সামলাতে পারি না। মহানগরী তখন মফস্বলের ছেলেদের কাছে রূপকথার রহস্যপুরী। এর আগে যে দুবার সেখানে গিয়েছি, তখন যাকে বলে কলকাতা দেখা, তার সুযোগ হয় নি। আর একটা বড় আকর্ষণ

আছে—নাট্যমন্দিরে শিশির ভাদুড়ীর 'দিগ্বিজয়ী' নাটকটি দেখা যাবে। শিশির বাবুর সম্প্রদায়ের 'সীতা' দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল জলপাইগুড়ি শহরে আর্য-নাট্য রঙ্গমঞ্চে। মফস্বলের মঞ্চে সৌখীন সম্প্রদায়ের অভিনয় দেখতে অভ্যস্ত আমাদের মতন সবারই পক্ষে সে ছিল এক অনাস্বাদিত পূর্ব অভিজ্ঞতা। এখন ত সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে নাটকের উপর আকর্ষণ আরো বেড়েছে। তখন কি জানি যে, কলকাতা থেকে ফিরে জিতেশদার প্রচণ্ড বকুনি খেতে হবে। আমাদের অনুপস্থিতির সময় একদিন তিনি খোঁজ করেছিলেন। সুরেনকে বলে রেখেছেন যে, ফেরার পরই যেন অতি অবশ্য তাঁর সঙ্গে দেখা করি। ঐ স্নেহকোমল মানুষটি যে শৃঙ্খলাভঙ্গের এই অতি তুচ্ছ ঘটনার জন্য এত কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করবেন তা স্বপ্নেও ভাবি নি। নির্মলের চোখে ত প্রায় জল এসে যায়। আমার অবস্থাও সুবিধার নয়। ভবিষ্যতে আর কখনও এমন ভুল হবে না প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর জিতেশদার মেজাজ ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে। তিনি বলেন: "তোমরা দায়িত্বশীল কর্মী। তোমাদের আচরণ দেখে অন্যেরা শিখবে। সে কথাটা কখনও ভুলে যেয়ো না।" তাঁর এত কঠোর হওয়ার কারণটাও খুলে বলেন। বিদ্রোহীগ্রুপ নাকি খুব তৎপর হয়ে উঠেছে। বিদ্রোহীদের নেতা কারা কারা তা দাদারা জানেন। কিন্তু অন্য যারা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সবাইকে চেনেন না। এটুকু জানেন যে, তারা দলের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। অন্যদিকে পুলিসও বসে নেই। পুঁটিয়া মেল ডাকাতি প্রচেষ্টার পর পুলিসের তৎপরতা এই জেলায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে আমরা যদি নেহাৎ নির্দোষ উদ্দেশ্য নিয়েও কলকাতা যাই সেটা তাদের সন্দেহের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তারা ভাবতে পারে যে, আমরা বিদ্রোহী গ্রুপেরই দূত হয়ে গিয়েছি। জিতেশদার কথায় একটু খটকা লাগে। ঐ ধরনের সন্দেহ কি শুধু পুলিসই করবে না সমিতির নেতারাও কর্মীদের গতিবিধির উপর সতর্ক নজর রাখতে শুরু করেছেন? রাজশাহীতে বিদ্রোহী গ্রুপের অস্তিত্ব আছে বলে এযাবৎ কানাঘুঁষাও শুনি নি। কিছুদিন থেকে অবশ্য সুরেন দাশগুপ্ত খানিকটা উদাসীন হয়ে পড়েছে। জেলা ছাত্র-সমিতির সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছে। জেলা সম্মেলনে সুরেন্দ্রমোহন ঘোষকে সভাপতি করে আনার জন্য সমিতির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব নাকি সুরেন দাশগুপ্তর কৈফিয়ত তলব করেছিলেন। সেই থেকে মনোমালিন্যের সূত্রপাত। কিন্তু সুরেনের যা রাজনৈতিক মত তাতে

ত বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদানের সম্ভাবনা আছে মনে হয় না। রহস্যভেদ হয় কিছুদিন পরে। ছাত্র সমিতির সম্পাদক ছিলেন শৈলেনদা। ছাত্র আন্দোলনের কাজে মহকুমা শহরগুলিতে ঘোরার সময় মাঝে মাঝে তিনিও সঙ্গে যেতেন। অনেক কথার মধ্য দিয়ে ক্রমশ টের পেলাম যে, শৈলেনদা বিদ্রোহীদলের সঙ্গে যুক্ত। তিনি আবার হোস্টেলে গোপন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত কর্মী। এমনিতে মানুষটি বড় চাপা, কথা বলেন খুবই কম। আমাকে বিশ্বাস করেন বলেই এভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। আমি তাঁর প্রস্তাবে সায় দিতে পারি না। নিজের চিন্তা কোনদিকে অগ্রসর হচ্ছে তা খুলে বলি। দাদাদের উপর আমার অন্ধ বিশ্বাস নেই। তাঁদের মুখ চেয়ে বসে থাকতে যেমন রাজী নেই তেমনি বিদ্রোহীদের প্রস্তাবিত কর্মপন্থাকেও সমর্থন করি না। আমার মতামত জেনে শৈলেশদা খুব অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছেন বুঝতে পারি। এদিকে আমাকে দলে টানতে পারবেন আশায় নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছেন ; অথচ আমার মতের সঙ্গে তাঁর বিন্দুমাত্রও মিল নেই। আমি ভরসা দিয়ে বলি যে, তিনি যখন আমাকে বিশ্বাস করেছেন সে বিশ্বাস ভঙ্গ করবো না। এতে সমিতির শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য কিছুটা লঙ্ঘিত হবে ঠিকই। কিন্তু ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে যখন একই দলের ভিতরে মত ও পথ নিয়ে এত দ্বন্দ্ব চলেছে সেই সময়ে শৃঙ্খলার প্রশ্নকে অতীত যুগের মাপকাটি দিয়ে বিচার করা চলে না।

এক যুগের মাপকাঠি দিয়ে অন্য একটি যুগকে যান্ত্রিকভাবে বিচারের চেষ্টা করলে ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক ধারণা গড়ে উঠতে পারে না। অতীতের মাপকাঠি যেমন বর্তমানের ক্ষেত্রে অচল হয়ে পড়ে ঠিক তেমনি বর্তমানের চোখ দিয়ে অতীতকে বিচার করতে গেলে তার উপর অনেকাংশে অবিচার করা হয়। এই শিক্ষাটি পেয়েছিলাম জিতেশদার কাছে ; সেই একদিন বকুনি দেওয়ার পর থেকে তিনি আমাদের কাছে অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রায়ই নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। সন্ধ্যার অন্ধকারে কোনদিন কলেজের মাঠে, কোনদিন শহরের প্রায় সীমানা ছাড়িয়ে পাঁচানির মাঠে বসে কথা হয়। কখনও হিমাদ্রি ও নির্মল আমার সঙ্গে উপস্থিত থাকে। কখনও আমি আর নির্মল। এক এক সময় থাকি শুধু আমি। আগে দাদার সঙ্গে সম্পর্কটা ছিল অন্য ধরনের, ঠিক যে রকমটা অন্যান্য জেলার রেওয়াজ বলে শুনেছি। বিশেষ কোন নির্দেশ দেওয়ার থাকলে তিনি দেখা করার জন্য

খবর পাঠাতেন। আমার দিক থেকে কিছু জানার বা বলার থাকলে আমি সাক্ষাৎপ্রার্থী হতাম। এখন মাঝে মাঝেই আমরা একত্র হয় মত বিনিময় করার জন্য। মত বিনিময় বৈকি। জিতেশদা নিজের মতামতকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিতেন না। ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের বক্তব্য শুনতেন। তারপর বলতেন নিজের যা বলার আছে। যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। যেক্ষেত্রে বুঝতেন যে, আমাদের মনে প্রশ্ন রয়ে গেছে সেক্ষেত্রে বলতেন "সমিতির নেতৃত্ব ত তোমাদেরই হাতে আসবে। তখন তোমরাই এর মীমাংসা করে নিও।" জিতেশদার মতন একজন প্রথম সারির নেতা আমাদের সঙ্গে এত সহজভাবে আলোচনা করছেন সেটা ছিল সেদিন এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তাই ভরসা পেয়ে অনেক প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। বিপ্লবী আন্দোলনের গোড়াকার যুগের সম্বন্ধে জানতে চাই অনেক কথা। সেই প্রসঙ্গেই জিতেশদা বলেন: "অতীতকে বুঝতে হলে বিচার করতে হবে তখনকার পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে। নতুবা যারা ছিলেন আন্দোলনের পথিকৃৎ, তাঁদের উপর অবিচার করা হবে। কি রকম পরিবেশের মধ্যে তাঁরা পথচলা শুরু করেছিলেন, কি কি ধরনের বাধা বিপত্তি ছিল তাঁদের সামনে তার কিছুই বুঝতে পারবে না।"

জিতেশদার অভ্যাস ছিল নিজের বক্তব্যকে সহজ উপমা এবং দৃষ্টান্তের সাহায্যে উপস্থিত করা। জনসভাতেও তাই করতেন। ফলে তাঁর বক্তৃতা শ্রোতারা খুব উপভোগ করত। এক্ষেত্রেও তিনি আমার অতি পরিচিত একটি উপমা দিয়ে বলেন: "যখন তুমি ছোট্ট লাইনের ট্রেনে যাত্রী হয়ে দার্জিলিং যাও তখন ইনজিনিয়ারিং কৌশলের প্রশংসা কর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হও। কিন্তু যারা ঐ রেলপথটি তৈরী করেছে তাদের যে কিরকম কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কত প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তির সঙ্গে লড়াই করে অগ্রসর হতে হয়েছে সে কথা কি কখনও কল্পনা করেছো?" আমি বলি "বাংলায় বিপ্লব বাদ" বইটিতে তখনকার অবস্থার কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়। উত্তরে জিতেশদা বলেন: "বই পড়ে কতটুকু বোঝা যায়। সেখানে যেটুকু আভাষ পেয়েছো তা থেকে প্রকৃত অবস্থাটা উপলব্ধি করা যায় না।"

"আজ তোমরা কিছু কিছু বই পত্র পত্রিকা পড়ার সুযোগ পাও, প্রকাশ্য সভা সম্মেলনে আলোচনা করে থাকো। সব কথা খোলাখুলি বলা সম্ভব না হলেও আভাষে ইঙ্গিতে অনেক কিছু বলতে পার। কত নতুন মত ও পথের কথা

জানতে পারো। তা নিয়ে বিতর্ক চলে, লেখালেখি হয়। সেই তুলনায় আমাদের সুযোগ ছিল কতটুকু! চারিদিকে যেন অন্ধকার। একদিন যে ভোর হবে সে কথাই বা তখন ক'জনে ভাবে বা ভাবতে পারে? মৃত অতীতের বোঝা কাঁধের উপরে সিন্দ্‌বাদের বৃদ্ধের মতই চেপে বসে। ভীরুতা আর নিষ্ক্রিয়তার জীবনদর্শন পায়ের শিকল হয়ে পিছনে টেনে রেখেছে। সেই অবস্থার মধ্যে বসে দেশকে স্বাধীন করবো এই স্বপ্ন দেখাটাই ছিল মস্তবড় দুঃসাহসের ব্যাপার। আর যারা স্বপ্ন দেখেই থেমে থাকেনি, ঘর ছেড়ে ব্যক্তিগত জীবনের কামনা বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়ে পথে বার হয়ে এসেছে তাদের সেই পদক্ষেপের প্রকৃত মূল্য যদি বুঝতে নাও পারো, তার অমর্যাদা করো না। আজ তোমরা জনসভায় মুক্তবন্দীদের সম্বর্ধনা করো, গার্ড অফ অনার দাও, গলায় ফুলের মালা পরাও। সেদিন যারা লোকচক্ষুর আড়ালে আত্মগোপন করে, নামযশের প্রত্যাশাটুকুও না না করে কত দুঃখবেদনা সহ্য করে চলেছে, তাদের জন্য 'আহা' বলার লোকও ত বেশি ছিল না। ধরা পড়লে পুলিসের হাতে অমানুষিক নির্যাতন। জেলে বন্দী অবস্থায় দিনের পর দিন নিদারুণ লাঞ্ছনা আর অপমান। এই ছিল দেশসেবার পুরস্কার, বিপ্লব সাধনার আশীর্বাদ।"

"নিছক রোম্যান্টিক উন্মাদনাকে সম্বল করে ত এই রকম সুদীর্ঘ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়! কেউ কেউ পারে নি, পথভ্রষ্ট হয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগেই শিরদাঁড়া সোজা রেখে বেরিয়ে এসেছে। এসেই বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে আবার আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে। তাদের সামনে কেউ পথের রেখা চিহ্নিত করে দেয় নি। বিজ্ঞেরা কেউ পাশে থেকে হাতে ধরে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে নি। তাদের সেদিনের বোঝায় হয়ত অনেক ভুল ছিল, ছিল অনেক অসম্পূর্ণতা। কিন্তু দেশপ্রেমে ফাঁকি ছিল না। অ-যাত্রা পথের সেই প্রথম পথিকদের পদচিহ্ন ধরেই তোমরা এগিয়ে চলেছ। এটুকু যদি ভুলে যাও তাহলে ইতিহাসকে অস্বীকার করা হবে।"

জিতেশদাকে আমরা এতদিন মনে মনে প্রায় পাথরের দেবতায় পরিণত করেছিলাম। তাই তাঁর কথাগুলির মধ্যে ফুটে-ওঠা আবেগের গভীরতা আমাদের অনুভূতিতে আলোড়ন তোলে। কত না ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে তাঁর হৃদয়ে। হয়ত বিদ্রোহী গ্রুপ দাদাদের বিরুদ্ধে যে সব নেতিবাচক সমালোচনা করে তাই তাঁকে এতটা আঘাত দিয়েছে। ভাবি আমরাও ত

অনেক সময় তাঁদের বিরুদ্ধে একপেশে সমালোচনা করেছি। সম্ভবত আমাদের তিনজনের মনে একই চিন্তা দোলা দেয়।

হিমাদ্রি জিতেশদার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলে : "আমরা কখনও আপনাদের অবদানকে অস্বীকার করব না।" আমি আর নির্মল হিমাদ্রির দেখাদেখি দাদাকে প্রণাম করে নীরবে সেই কথা বোঝাতে চাই। জিতেশদা বলেন : "যুগ পালটাচ্ছে। যারা পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে না তারা আপনা থেকে বাতিল হয়ে যাবে। তোমাদের উপরে ভরসা রাখি, তোমরা নতুন যুগের সারথি হবে। তাই বলি যে, নিজেদের দৃষ্টির গণ্ডিকে শুধু বর্তমানের মধ্যে সীমিত করে রেখো না। অতীতের পটভূমি আর ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিত এই দুটির সাহায্যে বর্তমানকে বোঝার চেষ্টা করবে।" আমি বলি : "সেইজন্যই ত আপনাদের সময়ের কথা বিশদভাবে জানার কৌতূহল হয়।" উত্তরে জিতেশদা বলেন : "কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক, প্রয়োজনও বটে। কিন্তু আমাদের যুগের জমাখরচের সত্যিকার হিসাব করার দিন এখনও আসে নি।

"আন্দোলনের গোড়ার দিক থেকে এ যাবৎ বাধ্য হয়েই গোপনতার উপর জোর দিতে হয়েছে। আমরা কি ভেবেছি, কি চেয়েছি, কি করেছি—তার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা দূরে থাকুক, টুকরো টুকরো বিবরণীও কেউ খাতার পাতায় টুকে রাখার কথা চিন্তা করে নি। স্মৃতিকথা লেখার পরিকল্পনা নিয়ে ত কেউ এ পথে পা বাড়ায় নি। আজকাল যে দুই একজন সেই যুগ সম্বন্ধে লেখার চেষ্টা করছেন তাঁদেরও অনেক কিছু রেখে ঢেকে বলতে হচ্ছে। নতুবা শত্রুপক্ষের হাতে আমাদের বিরুদ্ধে মারণাস্ত্র তুলে দেওয়া হবে। তবে এটুকু তোমাদের বলতে পারি যে, আমরাও অনেকগুলি অধ্যায় পার হয়ে এসেছি। আমাদের চিন্তাতেও বহু পরিবর্তন ঘটেছে, ঘটছে, ঘটবে।"

সেদিন এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল। তবু অনেক কিছু জানতে বাকি রয়ে গিয়েছে। ভবিষ্যতে আলোচনা হবে বলে বৈঠক শেষ হয়। জিতেশদা বলেন : "এমনি ভাবে আলাপের সুযোগ কতদিন পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা নেই। বিদ্রোহী গ্রুপ হয়ত একটা কিছু করে বসবে আর গভর্নমেণ্ট সেই অজুহাতে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করবে। আমরা ধরা পড়ে যাব। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তখন তোমরা নিজেরাই স্থির করে নেবে।" তাঁর আশঙ্কাটা

শীগগিরই আংশিকভাবে ফলে গেল। ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে কলকাতায় মেছুয়াবাজারে একটি বাড়িতে অকস্মাৎ হানা দিয়ে পুলিস বিদ্রোহীদলের বেশ কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। এঁদের মধ্যে দুটি নামের সঙ্গে আমরা রাজশাহীতে বসেও পরিচিত ছিলাম। একজন সতীশ পাকড়াশী এবং অপর জন নিরঞ্জন সেনগুপ্ত। সতীশদা অনুশীলনের প্রবীণ নেতাদের অন্যতম। নিরঞ্জন সেনের নাম প্রথম জানি নিখিল বঙ্গ ছাত্র-সমিতির মুখপত্র "ছাত্র" পত্রিকায়। সতীশদা বিদ্রোহী দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন জানায় সহকর্মীদের মধ্যে খানিকটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

এদিকে সারা দেশে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। ১৯৩০ সালের উদ্বোধন হয়েছে জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে—পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প ঘোষণা করে। বিদায়ী বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রির পর কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরু এক বিশাল জনসমাবেশের সামনে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেছেন। শুধুমাত্র এইটুকু জেনেই আমাদের মত কর্মীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। দেশবাসীর মনে যেন একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ সঞ্চারিত হয়। শুনি সেই অনাগত দিনগুলির পদধ্বনি যখন আসমুদ্র হিমাচল লক্ষ লক্ষ মানুষ শঙ্কাহীন চিত্তে জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে গণ-সংগ্রামের বন্যাস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এবারেও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পড়া রিপোর্ট আমার কল্পনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে সুরেন দাশগুপ্তর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনার মাধ্যমে। সে গিয়েছিল দর্শক হিসাবে। যাওয়ার আগ্রহ আমারও কম ছিল না। সেদিন আমাদের মতন ছেলেদের কাছে লাহোর যাওয়াটা ছিল প্রায় বিলাত যাত্রার অনুরূপ। ভারতের সুদূর পশ্চিম প্রান্তে লাহোর, ইতিহাসের কত স্মৃতি বিজড়িত, স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পীঠভূমি। বাংলার বাইরে কখনও পা বাড়াবার সুযোগ হয় নি। এই উপলক্ষে উত্তর ভারতের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের অবকাশ হবে। চরমপন্থী চিন্তাধারার দিক দিয়ে পাঞ্জাব তখন বাংলার বিপ্লবী মানসের অত্যন্ত কাছাকাছি। কংগ্রেস অধিবেশনের সময় একটি সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনেরও আয়োজন হয়েছে। উদ্যোগ নিয়েছে পাঞ্জাবের ছাত্র ইউনিয়ন। বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্র-সমিতিকে তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছে। নিখিল ভারত ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তুতি হবে। হয়ত সেই সম্মেলনে নওজোয়ান ভারত সভার কর্মীদের সঙ্গেও পরিচয় ঘটবে। সবার উপরে রয়েছে এই ঐতিহাসিক

মুহূর্তে স্বাধীনতা ঘোষণার মহালগ্নে সর্বভারতীয় সমাবেশে উপস্থিত থাকার বিরাট আকর্ষণ।

অসুবিধাও কম নেই। অপরিচিত স্থান, অচেনা পরিবেশ। কয়েকটি দিন কোথায় কি অবস্থার মধ্যে কাটাতে হবে কে জানে। এসব খুঁটিনাটি সমস্যা অবশ্য উৎসাহের প্রাবল্যের সামনে ভেসে যায়। বাধা হয়ে দাঁড়ায় অন্য প্রশ্ন। দু'জন যাওয়ার উপযোগী পাথেয় সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না বলে শেষ পর্যন্ত সুরেন একলাই যায়। তাকে ওখানে পৌঁছে কম অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি। পাঞ্জাবের প্রচণ্ড শীত সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকায় যথেষ্ট শীতবস্ত্র নিয়ে যায় নি। বাংলার প্রতিনিধি শিবিরে কোন রকমে থাকার ব্যবস্থা হলেও টাকাপয়সা যা সঙ্গে ছিল ফুরিয়ে গিয়েছে। ফেরার পথের রেলভাড়ার ব্যবস্থা হয়েছে কালুদার সাহায্যে। তবু ত সে এক বিরাট অভিজ্ঞতা। সব কষ্ট ছাপিয়ে উঠেছে সেই অনুভূতি। আমি তা থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

লাহোর কংগ্রেসে দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মত-সংঘাতের বিবরণ শুনি। পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে কিন্তু আন্দোলনের কোন কর্মসূচী উপস্থাপিত হয় নি। সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর একলার হাতে। আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে, এর বেশি কিছু বলা হয় নি। সুভাষবাবু বামপন্থীদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন দেশে একটি পাল্টা গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রমিক, কৃষক ও যুবকদের সংগঠন গড়ে তোলা হোক। প্রস্তাবটি ভোটে পরাজিত হয়েছে। বামপন্থী মহলের সামনে আন্দোলনের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কিনা জানি না।

জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয় আগামী ২৬শে তারিখটি সারা দেশে স্বাধীনতা দিবসরূপে পালিত হবে। শহরে ও গ্রামে সর্বত্র সংগ্রামের শপথ নেওয়া হবে বিশাল জনসমাবেশে। কংগ্রেস নেতৃত্ব শপথ বাক্যের যে বয়ান প্রচার করেন তার সব কিছুই আমাদের মনঃপূত হয় না ঠিকই। বিশেষত অহিংসার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ আমরা স্বভাবতই পছন্দ করি না। তবু বেশ উপলব্ধি করি যে, তা গণমনে সৃষ্টি করেছে বিদ্রোহের এক বলিষ্ঠ উন্মাদনা। দেশের অগণিত মানুষ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অসংখ্য সভায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করবে: "বিদেশী শাসনের সামনে মাথা নোয়ানোকে আমরা ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি অপরাধ বলে

গণ্য করি।” আমাদের দৃষ্টিতে শপথ বাক্যের ঐ কয়টি ছত্রই অসামান্য গুরুত্ব অর্জন করে। এই ঘোষণা ত ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির চ্যালেঞ্জ। তা দেশের সাধারণ মানুষের মনে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে। একবার যদি বাঁধ ভেঙ্গে যায় তারপর সেই বন্যাপ্রবাহকে ঠেকাবে কে? দেখতে দেখতে ২৬শে জানুয়ারি এসে যায়। এই দিনটি যাতে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয় সেজন্য জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে জোর প্রস্তুতি চলেছে। সমস্ত দলের কর্মীরা বিভেদ ভুলে একসঙ্গে কাজ করে। সকালে কংগ্রেস কমিটির অফিসে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান। বিকালে ভুবনমোহন পার্কের জনসভায় শপথ গ্রহণ।

শহরের বহু ঘরে ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলিত হয়েছে। কলেজ হোস্টেলের প্রত্যেকটি ব্লকের মাথায় জাতীয় পতাকা উদ্ধতভাবে ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্বকেই যেন অস্বীকার করে। সন্ধ্যায় দীপালির আলোকসজ্জা। পার্কে জনসমাবেশে উপস্থিত শত শত মানুষের মিলিত কণ্ঠে প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রত্যেকটি শব্দ বজ্রনির্ঘোষে উচ্চারিত হয়। সেদিনের সভায় কোন বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল না। প্রয়োজনও নেই। উপস্থিত মানুষগুলির একজনের মনের কথা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যের মনের কন্দরে প্রতিধ্বনি তোলে। একই লক্ষ্য, একই সঙ্কল্প প্রায় দুশো বৎসরের দাসত্বের হীনতাবোধ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সমগ্র জাতি আজ আমাদের জন্মগত অধিকার সগর্বে ঘোষণা করছে! অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত রকমের দুঃখবরণ এবং আত্মদানের শপথ নিয়েছে। মুখের ভাষায় তাকে ব্যাখ্যা করার দরকার কি? এই পুণ্য দিবসে সারা দেশের মানুষ একই মুহূর্তে সমবেতভাবে সেই অভিযানের প্রথম পদক্ষেপ করছে। অনির্বচনীয় সে অনুভূতি। বিদ্যুৎগর্ভ পরিমণ্ডল।

হোস্টেলের অধিবাসীদের ভিতরে যেসব সুবোধ বালক রাজনীতির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে দূরে সরে থাকতে চায়, তারা পতাকা উত্তোলন এবং আলোকসজ্জা পছন্দ করে নি। কর্তৃপক্ষের বিষ নজরে পড়তে হবে এটাই ছিল তাদের ভয় আর আপত্তির কারণ। বেশির ভাগ ছাত্রদের উৎসাহের সামনে তাদের আপত্তি টেকে নি। যেসব ছেলেরা এতদিন স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে উদাসীন ছিল, তাদের অনেকের মনেও ২৬শে জানুয়ারি তারিখটিতে যেন ভাবের জোয়ার এসেছিল। কর্তৃপক্ষ ঘটনাটিকে কি চোখে দেখবে না দেখবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার বোধ করি নি। পরে জানতে পারি যে, ব্যাপারটার জের অনেক

দূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল। নিউ হোস্টেলের যিনি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন তিনি ছাত্রদের কাজে-কর্মে বড় একটা হস্তক্ষেপ করতেন না। বয়স্ক অধ্যাপক ছেলেদের থেকে একটা দূরত্ব রক্ষা করে চলতেন বটে, তবে হোস্টেলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বরাবর তাঁর সহযোগিতা আমরা পেয়ে এসেছি। ২৬শে জানুয়ারির মাসখানেক পরে তিনি একদিন সুরেনকে এবং আমাকে ডেকে পাঠালেন। অন্য কেউ উপস্থিত নেই। তাঁর কাছে জানি যে হোস্টেলে জাতীয় পতাকা তোলার ঘটনা সম্বন্ধে জেলার সরকারী কর্তৃপক্ষ স্বরাষ্ট্র বিভাগের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছে। স্বরাষ্ট্র বিভাগ চাপ দেওয়াতে শিক্ষাদপ্তর থেকে প্রিন্সিপ্যালের কাছে কড়া চিঠি এসেছে যে, সরকারী হোস্টেলে কি ভাবে এটা সম্ভবপর হল? সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বলেন: "মিঃ উইলিয়ামস যেভাবেই হোক এবারকার মত সামাল দিয়েছেন। আমারও কৈফিয়ত তলব করেন নি। তোমাদের বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা নেওয়ার ইচ্ছা তাঁর নেই। কিন্তু বারবার সামাল দেওয়া সম্ভব হবে না। অধ্যাপকদের ভিতরে দুই একজন আছেন গভর্নমেণ্টের খয়ের খাঁ। তার উপর সম্প্রতি যে, মুসলিম অধ্যাপকটি এসেছেন তিনি ভয়ঙ্কর কংগ্রেস-বিদ্বেষী। শিক্ষা দপ্তরের চিঠির কথা এঁরা সবাই জানেন। সুতরাং ভবিষ্যতে কোন ঘটনা ঘটলে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁরা হয়ত প্রিন্সিপ্যালের উপরে চাপ দেবেন।" অধ্যাপক আরো বলেন: "তোমাদের দুজনকে আমি যথেষ্ট স্নেহ করি। বাইরে প্রকাশ করা সম্ভব না হলেও তোমরা যা করেছ তার প্রতি আমার মনে যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। কাজ বন্ধ করতে বলি না। তবে একটু সাবধানে চলবে। বিশেষ করে যখন তোমাদের দু'জনের উপরে পুলিসের বিষদৃষ্টি পড়েছে। পুলিসের ধারণা তোমরাই নষ্টের গোড়া। তাই কোনরকম অজুহাত পেলে আর ছাড়বে না।"

আমরা এতদিন ভেবেছি যে, সুপারিটেণ্ডেণ্ট নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষ বলে হোস্টেলে কি ঘটছে না ঘটছে সে বিষয়ে বড় একটা হস্তক্ষেপ করেন না। তাঁর পরের কথাগুলিতে আমাদের ভুল ভেঙ্গে দেয়। ভিতর থেকে কেউ কেউ তাঁর কাছে আমাদের গতিবিধি সম্বন্ধে নিয়মিত রিপোর্ট দিয়ে থাকে। তিনি সব রিপোর্ট যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে তাদের আশ্বাস দিয়ে শান্ত করেন বটে, তবে আসলে এতদিন সব কিছু চেপে গিয়েছেন। প্রবীণ অধ্যাপকের সহানুভূতিশীল মনোভাবের পরিচয় পেয়ে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে চলে আসি।

স্থির করি যে এখন থেকে আরো সতর্ক হয়ে চলতে হবে। যারা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কানে খবর পৌঁছে দেয় তারা সরাসরি পুলিসের কাছে রিপোর্ট দেবে তাতে আর বিচিত্র কি! গোয়েন্দা বিভাগের খাতায় আমাদের নাম উঠবে সেটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। সেজন্য তৈরি হয়েই তো পা বাড়িয়েছি। হোস্টেলে তাদের চর থাকবে সেটাও গোড়া থেকে ধরে নেওয়া। যেটুকু ছিল এতদিন অনুমান, এখন শুধু বাস্তবে তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা গেল। সতর্ক হওয়া মানে গোপন সংগঠনের যোগসূত্রগুলি সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হয়ে চলা। অবশ্য কংগ্রেস বা ছাত্র সমিতির কাজ তো প্রকাশ্য। তাতে আমরা [illegible] হয়ে গিয়েছি। ক্রমে বেশি করে হচ্ছি।

জেলা ছাত্র সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছি। এবং হিমাদ্রি, নির্মল যুগ্ম সম্পাদক। সহ-সভাপতিদের মধ্যে আছে শহরের ছেলে দীনেশ ব্যানার্জী। সুতরাং এখানকার ছাত্র আন্দোলনে আমার স্থান এখন শুধু পাদপ্রদীপের সামনেই নয়, একেবারে সকলের পুরোভাগে। ভুবনমোহন পার্কে ছাত্র সমাবেশে পৌরোহিত্য করতে হয়। কংগ্রেসের ডাকে অনুষ্ঠিত জনসভাতেও ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসাবে বক্তৃতা দিই। পদমর্যাদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বও বেড়ে চলেছে। এবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে রাজশাহীতে। জেলা কংগ্রেস কমিটির কর্মকর্তারাই অভ্যর্থনা সমিতির কর্মকর্তা হয়েছেন। পদাধিকার বলে আমি হয়েছি অন্যতম সহকারী সম্পাদক। কাজের চাপের সঙ্গে সঙ্গে গতিবেগ অত্যন্ত দ্রুত হয়েছে। পড়াশুনা শিকেয় উঠেছে। আগেভাগে পাঠ্যক্রমের তুলনায় অনেক বেশি পড়ে রেখেছি বলে আসন্ন বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য চিন্তা না করেই কর্মের স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। এখানেও প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠিত হয়েছে। চেরুদা সর্বাধিনায়ক, দীনেশ ব্যানার্জী তাঁর সহকারী। হোস্টেলে যারা স্বেচ্ছাসেবকদলে যোগ দিয়েছে তাদের নেতা সুরেন দাশগুপ্ত। নেতৃত্বের সঙ্গে তার মনোমালিন্য মিটে গিয়েছে। সে আবার নতুন উৎসাহ নিয়ে কাজে নেমেছে।

স্বেচ্ছাসেবকেরা রোজ বিকেলে সামরিক কায়দায় উর্দি পরে কুচকাওয়াজ করে। ট্রেনিং দেয় দীনেশ ব্যানার্জী। সুরেন তার কাছে শিখে নিয়ে পরে স্বেচ্ছাসেবকদের অন্য দলকে ট্রেনিং দেয়। হোস্টেলের সেই বাক্যবাগীশের দল

বিদ্রূপ করে। তাদের চোখে এসব নিছক হুজুগ এবং অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়টাতে প্রাদেশিক সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। তার আগেই মহাত্মা গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহ অভিযান শুরু হয়ে যাবে। সুতরাং এবারকার সম্মেলন এক অসাধারণ গুরুত্ব অর্জন করেছে। সারা দেশ জুড়ে যে সাজো সাজো রব উঠেছে সেই হাওয়া এখানেও দোলা দিয়েছে আমাদের সকলের মনে। হোক না এ যুদ্ধ অহিংস, তবু দেশে সমরসজ্জার পরিবেশ গড়ে উঠছে। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিতে প্রতিদিন খবরের শিরোনামা দেহে মনে যুদ্ধের উন্মাদনা সঞ্চারিত করে। মাঝখানে কর্মীদের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে, মহাত্মা বুঝি বোধন না হতেই বিসর্জনের ব্যবস্থা করবেন। পূর্ণ স্বরাজকে তিনি "স্বাধীনতার সারবস্তু" (Substance of Independence) আখ্যা দিয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে গ্রহণযোগ্য রূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। আপসের শর্ত হিসাবে যে, এগার দফা প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা অনেকের মনেই হতাশা সৃষ্টি করেছিল। মহাত্মা ঘোষণা করেছিলেন যে, এটা হল আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার আগে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ চেষ্টা। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সাড়া দেয় নি। অতএব গান্ধীজী দেশবাসীকে আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হতে ডাক দিয়েছেন। ১২ই মার্চ তিনি সবরমতী আশ্রমের বাছাই করা কর্মীদের নিয়ে ডাণ্ডী অভিযান শুরু করবেন।

৬ই এপ্রিল হবে সমুদ্রতীরে লবণ আইন অমান্য। সেইদিন দেশের সর্বত্র আইন অমান্য কর্মসূচীর উদ্বোধন। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, এবার তাঁর গ্রেপ্তারের পর আন্দোলন নিছক নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে সীমিত হয়ে রইবে না, অত্যন্ত সক্রিয় ধরনের অহিংস প্রতিরোধের রূপ নেবে। উপরন্তু চৌরীচৌরার মতন শত শত ঘটনা ঘটলেও আন্দোলন বন্ধ হবে না।

কর্মীদের উৎসাহে যে ভাঁটার টান দেখা দিয়েছিল মাঝখানে, তা কেটে গিয়ে নতুন জোয়ার আসে। মার্চ মাস শেষ হওয়ার আগেই আবহাওয়াটা অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আকাশ বিদ্যুৎগর্ভ মেঘে মেঘে থমথমে, বাতাসে রণদামামার নির্ঘোষ। সারা ভারতের জনচিত্ত ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রতরঙ্গের মত উত্তাল হয়ে উঠছে—এই পরিবেশে আমাদের কয়েকজনের মনের সেই পুরানো প্রশ্নগুলি নতুনভাবে সামনে এসে হাজির হয়। এখন ত আর সেগুলি বিমূর্ত

বিতর্কের বিষয় নয়। অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যারা অহিংস পন্থায় পরিপূর্ণ বিশ্বাসী তাদের পক্ষে গান্ধী-নেতৃত্বের উপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখে চলা সম্ভব হতে পারে। তারা এসব কথা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। যখন যা নির্দেশ আসবে সৈনিকের শৃঙ্খলায় তা পালন করবে। আমরা যারা গান্ধী-পন্থায় বিশ্বাসী নই অথচ তাঁর সীমিত ইতিবাচক ভূমিকাকে স্বীকার করি, সমস্যা তাদেরই। আসন্ন আন্দোলনের সম্ভাবনাকে আমরা যতটুকু উপলব্ধি করি তাতে বুঝি যে, নিজস্ব কর্মপন্থা এবং পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে এতে যোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের মতের মূল্য কতটুকু! জিতেশদাকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি নেতৃত্বের যে নির্দেশের কথা জানান তাতে হতাশ না হয়ে পারি না। যারা কংগ্রেস বা ছাত্র সংগঠনের কর্মকর্তা পদে অধিষ্ঠিত রয়েছে তারা প্রয়োজন হলে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করতে পারে। এর বেশি আর কিছু নাকি তাঁদের বলার নেই।

দেশের এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে সমিতি কি নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকবে? নিজস্ব কোন ভূমিকা কি নেবে না? জিতেশদা বলেন: "প্রাদেশিক সম্মেলনের সময় সমিতির নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীদের অনেকেই এখানে আসবেন। একটা গোপন বৈঠক বসবে। নেতাদের সঙ্গে বিদ্রোহী গ্রুপের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের একটা আলোচনা হওয়ার কথা আছে। সেখানে যদি কোন মীমাংসা হয় তাহলে সেই অনুযায়ী কর্মপন্থা গৃহীত হবে।" অন্যদিকে কমিউনিস্টদের মনোভাব সম্বন্ধে যা শুনি তাও নিতান্ত নিরাশাজনক।

নিশীথ একদিন একটা ছাপানো ইস্তাহার পড়তে দেয়। এতে নাকি তাদের মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। পড়ে দেখি ইস্তাহারে আসন্ন আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা আছে, নেই শুধু কর্মের নির্দেশ। সেখানে বলা হয়েছে উচিত ছিল দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট এবং খাজানা বন্ধ অভিযানের আহ্বান দেওয়া। তার বদলে গান্ধী-নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে লবণ আইন অমান্যের এক নখদন্তহীন কর্মপন্থা। এ শুধু জনসাধারণকে ভাঁওতা দেওয়া। আমরা বলি: "তোমাদের সমালোচনা মেনে নিলাম। কিন্তু তোমরা কি করবে সে কথার ত বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই! তোমাদের যেটুকু শক্তি আছে তাই নিয়ে যেখানে সম্ভব সাধারণ ধর্মঘট আর খাজানা বন্ধ অভিযান শুরু করে দাও না কেন?" নিশীথ বলে: "গান্ধীজী শ্রমিকদের রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকতে নির্দেশ

দিয়েছেন।" হিমাদ্রি তৎক্ষণাৎ পাল্টা জবাব দেয়ঃ "তোমরা ত গান্ধীর বশংবদ নও। তোমাদের নেতৃত্বে শ্রমিকদের যে অংশ সংগঠিত তারাই অন্যদের পথ দেখাক না কেন ?"

নিশীথ এর উত্তর দিতে পারে না। সে বলে প্রাদেশিক সম্মেলনের সময় এখানে "ইয়ং কমরেডস লীগের"ও সম্মেলন হবে। কলকাতা থেকে নেতারা আসবেন। তাঁদেরকেই এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো।

প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনের সময় ঐ মণ্ডপেই বিভিন্ন সময়সূচীতে পর পর কয়েকটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। যুব সম্মেলনের সভাপতি হবেন প্রফুল্ল গাঙ্গুলী, প্রধান অতিথি ডঃ ভূপেন দত্ত। ইয়ং কমরেডস লীগের সম্মেলনের সভাপতি হবেন খ্যাতনামা শ্রমিক নেতা বঙ্কিম মুখার্জী। রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, যিনি 'মহারাজ' নামে সমধিক পরিচিত। অধীর আগ্রহে সামনের সেই দিনগুলির জন্য প্রতীক্ষা করে থাকি। বিভিন্ন রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে দেশের সামনে পথের কি ইঙ্গিত দেওয়া হবে ?

খ্যাতনামা নেতাদের দেখার জন্য ঔৎসুক্য কম নয়। বিশেষভাবে দেখার ইচ্ছা মহারাজকে। 'বাংলায় বিপ্লববাদ' বইটিতে অনন্তকুমার ছদ্মনামে তাঁরই একটি জীবন্ত চিত্র আঁকা হয়েছে। আরো অনেকের মুখেই শুনেছি এঁর সম্বন্ধে নানা কথা। সত্যিকারের বিপ্লবতাপস এই মানুষটি কোমলে কাঠিন্যে গড়া। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" বাক্যটি এঁর বেলায় অক্ষরে অক্ষরে প্রযোজ্য। অভ্রান্ত, অব্যর্থ তাঁর হাতে পিস্তলের লক্ষ্য। কত দুঃসাহসিক অভিযানের তিনি নায়ক। আত্মগোপনের জীবনের দুঃখকষ্ট যাঁকে কখনও এতটুকু বিচলিত করতে পারে নি। নৌকার মাঝি সেজে মাসের পর মাস কাটিয়েছেন! শৃঙ্খলা রক্ষায় অত্যন্ত কঠোর অথচ সহকর্মীদের প্রতি স্নেহে অতীব কোমল। মানুষের প্রতি ভালবাসায় তাঁর হৃদয় কানায় কানায় ভরা বলেই আপনাকে দেশমাতৃকার পূজায় একান্তভাবে উৎসর্গ করেছেন। নিজের বলে তাঁর কিছু নেই, নিজের সম্বন্ধে চিন্তা মনে ঠাঁই পায় না। শুনেছি অনুশীলন এবং যুগান্তরের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ সত্ত্বেও দুই দলের যে কয়েকজন নেতা সর্বজনশ্রদ্ধেয়, মহারাজ তাঁদেরই অন্যতম।

নিজেকে যদি কারুর ছাঁচে গড়ে তুলতে হয় তাহলে এই মানুষটিরই ছাঁচে।

কিন্তু শুধু ব্যক্তিত্বের উপর আস্থাকে সম্বল করে ত ইতিহাসের এই অধ্যায় পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়। চিন্তার সেই স্তর পিছনে ফেলে এসেছি। জাতির জীবনের এই মহাসন্ধিক্ষণের কথা ভেবেই বোধ হয় বিদ্রোহী কবি তাঁর গানে বলেছেন "কাণ্ডারী হুশিয়ার"। কোথায় সেই কাণ্ডারী, যাঁর বিপ্লব সাধনার মধ্যে হয়েছে যুগপৎ জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়? যাঁর ইতিহাস-চেতনায় ভবিষ্যতের রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠবে আর সেই আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে আমাদের সামনে পথের দিগন্তরেখা।

নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি ৬ই এপ্রিল তারিখে কলকাতায় এক কনভেনশন আহ্বান করেছে। কথা উঠেছে ছাত্ররা এবার জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেবে কিছুটা গান্ধীর নেতৃত্ব, সার্বভৌম [illegible] কর্মপন্থা নিয়ে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় পরিষদ-বিভিন্ন প্রদেশে নির্দেশ পাঠিয়েছে ছাত্ররা যেন আইন অমান্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দলে নাম লেখায়। আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব প্রদেশ থেকে মহকুমা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে আইন অমান্য সমিতি গঠন করতে বলেছেন। সোদপুরে স্থাপিত হয়েছে স্বেচ্ছাসেবকদের শিক্ষা শিবির। সেখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে তারা যাবে লবণ আইন অমান্যের জন্য নির্দিষ্ট বিভিন্ন কেন্দ্রে। হোক না আন্দোলন অহিংস, পুলিসের লাঠি ত অহিংস নয়। জেনে শুনে স্বেচ্ছায় শান্তভাবে পুলিসের বে-ধড়ক আক্রমণের মোকাবিলা করতে যাওয়াটাও যথেষ্ট সাহসের পরিচয়। তারপর আছে কারা-বাসের ক্লেশভোগ। কিন্তু যে হাওয়া এসে গিয়েছে তা যেন ভীরুকে নিমেষে দুঃসাহসী করে তোলে। দেশের জন্য কারাবরণ হয়ে ওঠে সম্মানের নিদর্শন।

রাজশাহী থেকে প্রথম সত্যাগ্রহী দল যাত্রা করে. তাদের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে বিপুল সংবর্ধনার মধ্যে বিদায় দেওয়া হল। তারা এখান থেকে সোদপুর পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথ পদব্রজে পরিক্রমা করবে। এই পরিক্রমার দ্বারা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া হবে অহিংস সংগ্রামের আহ্বান। জনচিত্তকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে তোলার এই কৌশলের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন গান্ধীজী তাঁর ডাণ্ডী অভিযানের পরিকল্পনায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে লবণ সত্যাগ্রহীরা এইভাবেই এগিয়ে চলেছে।

যা ছিল আপাতদৃষ্টিতে নিছক লবণ আইন অমান্য, তা দেখতে দেখতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার দেশব্যাপী প্রতীকে পরিণত হয়।

রাজশাহীতে যারা সত্যাগ্রহীদের প্রথম দলে যোগ দেয় তাদের মধ্যে এমন দুই একজন ছাত্র ছিল যারা কোনদিন রাজনীতির ছায়া মাড়ায় নি। বিশেষত সন্তোষ বাগচিকে আমরা সবাই এতদিন হাসির খোরাক হিসাবেই দেখে এসেছিলাম। উশকো খুশকো চুল, গেরুয়া রংয়ের ঢোলা হাতা পাঞ্জাবী পরে সে যখন কলেজের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করত তখন তার বাচনভঙ্গি এবং হস্ত-সঞ্চালনের ভঙ্গিমা আমাদের বিশেষ উপভোগের বস্তু ছিল। ছাত্রমহলে তার পরিচয় ছিল হতাশপ্রেমিক কবি বলে। সেই লোকটি যখন এগিয়ে এল সত্যাগ্রহী দলে নাম লেখাতে তা অনেককে বিস্মিত করেছিল। পরে নিজের অভিজ্ঞতায় বার বার দেখেছি যে, আন্দোলনের জোয়ার এলে এমনি ধরনের বহু মানুষ তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা পরীক্ষিত কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে দুঃখবরণ করে, মৃত্যুর সম্মুখীন হতেও ভয় পায় না।

ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহের কি বিপুল জাগরণ এসেছে, কলকাতায় কনভেনশনে তার নিদর্শন দেখি। এ্যালবার্ট হলের ভিতরে ও প্রবেশপথে তিলধারণের ঠাঁই নেই। বিভিন্ন জেলা থেকে বহু প্রতিনিধি এসেছে। সভাপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা দিতে ওঠেন। সভাপতির বক্তৃতার পর ভাবী কর্মপন্থা নিয়ে কিছুক্ষণ তুমুল বিতর্ক চলে। এক অংশ দাবি করে এখন থেকেই সারা বাংলার সমস্ত শিক্ষায়তনে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হোক। অন্যেরা বলে সাধারণ ধর্মঘটের সময় এখনও আসেনি। আইন অমান্য আন্দোলন আরো কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর সেই ডাক দেওয়া সমীচীন হবে। সমিতির শ্রদ্ধাভাজন নেতারা ছিলেন শেষোক্ত মতের পক্ষে। তাই শেষ পর্যন্ত আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতি সমর্থন এবং আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

সাধারণ ধর্মঘট সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে গরমের ছুটির পর আর একটি কনভেনশনে। ইতিমধ্যে যারা ইচ্ছুক তারা স্বেচ্ছাসেবকদলে নাম লেখাবে এবং নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে আইন অমান্য সমিতির সহযোগিতায় কর্মসূচী স্থির করবে। কলকাতায় ছাত্র সমিতির নেতারা বিভিন্ন পার্কে সভায় সিডিশান বা রাজদ্রোহের আইন অমান্য করবেন। সরকার যে সব বই বা পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করেছে সেই ধরনের পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ করা হবে প্রকাশ্য জনসমাবেশে।

মাত্র দিন কয়েক আগে গাড়োয়ানদের ধর্মঘট মহানগরীর রাজপথে নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। ধর্মঘটীদের উপর পুলিসের গুলি চালনার প্রতিবাদে আমাদের কনভেনশন সোচ্চার হয়ে ওঠে। গণবিক্ষোভের আগুন বিভিন্ন পথে বিভিন্ন ধারায় আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের মতই উদ্গীরিত হতে শুরু করেছে। এই ধারাগুলিকে একত্রে মিলিয়ে মহা প্রবাহের সৃষ্টি করবে কে?

সমিতির সর্বোচ্চ নেতাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য জিতেশদার চিঠি নিয়ে এসেছিলাম। দেখা হয় প্রতুলদার সঙ্গে। তিনি আমাদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন বটে, তবে সন্তোষজনক জবাব পাই না। শুধু এইটুকু আশ্বাস নিয়ে ফিরি যে, রাজশাহীতে প্রাদেশিক সম্মেলনের সময় সারা বাংলার নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে আলোচনার পর নির্দেশ দেওয়া হবে। ফিরে সম্মেলনের প্রস্তুতির কাজে ডুবে যেতে হয়। বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল আগেই, তাই রক্ষা। এদিকে সারা দেশে আইন অমান্য আন্দোলন এগিয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে চলেছে ব্যাপক হারে সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার ও নির্মম লাঠিচালনা। পুলিসের বেধড়ক লাঠিচালনাকে আজ আর কেউ পরোয়া করেনা। নিরস্ত্র হলেও মানুষের মন থেকে ভয়ডর মুছে গিয়েছে। গান্ধীজীর এক আবেদনের পর সারা ভারতে মেয়েরাও নেমে পড়েছে সংগ্রামের ময়দানে। অলঙ্কারের বদলে মোটা খদ্দরের শাড়ী, কারাবরণ, পুলিসের হাতে লাঞ্ছনা — এই সবই হয়ে দাঁড়িয়েছে নারীদের অঙ্গের আভরণ।

অসহযোগ আন্দোলনেও মেয়েরা যোগ দিয়েছিল। কিন্তু এবার তারা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে বিপুল সংখ্যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার মেয়েদের নতুন মর্যাদা দান করে। তারা আর অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠিতা নয়। বীরাঙ্গনার বেশে সমান মর্যাদায় পুরুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। আমাদের শহরেও তার ঢেউ লাগে।

রাজশাহী ছিল এদিক থেকে অত্যন্ত রক্ষণশীল। অন্তঃপুরিকারা অসূর্যম্পশ্যা হয়ে থাকবেন এটাই বনেদীয়ানার লক্ষণ। বালিকা বিদ্যালয় থাকলেও কলেজে সহশিক্ষা প্রচলনের প্রস্তাব কার্যকরী হতে পারে নি অভিজাত সমাজপতিদের বিরোধিতার দরুন। এবার তাঁদের অনুশাসনকে উপেক্ষা করে স্বেচ্ছাসেবিকাদলে নাম লেখাতে এগিয়ে আসে সুরেন মৈত্র মহাশয়ের কন্যা মীরার নেতৃত্বে আরো কয়েকটি মেয়ে। সবার নাম আজ আমার মনে নেই। থাকার কথাও নয়।

তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছে খুব অল্পই। তবে শমিতার কথা এই কাহিনীর সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। কেন না তাকে উপলক্ষ্য করেই আমি হিমাদ্রির ব্যক্তিত্বের একটি কোমলতম দিকের সন্ধান পেয়েছিলাম। সে তার হৃদয়ের দুয়ার খুলে ধরেছিল আমার সামনে। শমিতাকে ঘিরে তার মনে একটি নিভৃত স্বপ্নকে মঞ্জরিত হয়ে উঠতে দেখেছি। প্রথমটায় অবশ্য হিমাদ্রি আর শমিতা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। আরো বেশি অবাক হয়েছিলাম তাদের সপ্রতিভভাবে আলাপ করতে দেখে। শুধু শমিতারই নয়, হিমাদ্রির পক্ষেও সপ্রতিভতা সেদিন আমার চোখে বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল বৈকি!

আমার কাছে তখন পর্যন্ত নারী রয়ে গেছে রহস্যরূপিণী, কল্পলোকবাসিনী। অনাত্মীয়া কোন কিশোরী বা তরুণীর সঙ্গে পরিচয় দূরে থাকুক, সংস্রবে আসার সুযোগ ঘটেনি। আত্মীয়তা সম্পর্কে সম্পর্কিতাদের মধ্যেও ঐ বয়সের কাউকে পাই নি। যৌবনের তাগিদে অবকাশের কোন মুহূর্তে বা ঘুমভাঙা রাতে হয়ত এমন একজনকে একান্ত আপনার করে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে যার সান্নিধ্য জীবনকে স্নিগ্ধতার পরশে ধন্য করে তুলবে। কিন্তু যে পথ বেছে নিয়েছি তাতে সে কল্পনাকে জোর করে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়েছে। তাকে দুর্বলতা বলেই ভেবেছি। দুর্বলতার কথা কারুর কাছে প্রকাশ করি নি। নির্মলের কাছেও নয়, হিমাদ্রির কাছে ত নয়ই।

হিমাদ্রিকে ভেবেছি আগাগোড়া ইস্পাতে ঢালাই করা বিপ্লবী বলে। তাই কৌতূহল দমন করতে পারি না। একদিন তাকে খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করি। সেও অকপটে সব কথা খুলে বলে। হিমাদ্রিকেও ছাত্র সংগঠনের কাজে জেলার নানা স্থানে ঘুরতে হয়। এমনি ঘোরার মধ্য দিয়েই হয় শমিতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

সেবার দুদিনের জন্য তাকে যেতে হয়েছিল রাজশাহী শহরের নিকটেই একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে। গিয়েছিল একজন সহপাঠী বন্ধুর অতিথি হয়ে। কিন্তু যে দুদিন সেখানে ছিল রোজই একবেলা পাড়া প্রতিবেশীদের কারুর না কারুর বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হয়েছে। দ্বিতীয় দিনে যে বাড়িতে দুই বন্ধু পাশাপাশি খেতে বসেছে সেখানে পরিবেশন করে একটি সুন্দরী কিশোরী। হিমাদ্রি প্রথমে তার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে নি। বর্ষীয়সী বিধবা গৃহকর্ত্রী

সামনে বসে অতিথিদের খাওয়ার তদারক করছেন। স্নেহকোমল মাতৃহৃদয়, কথার ফাঁকে ফাঁকে হিমাদ্রির বাড়ির খবর নিচ্ছেন। আপনজন থেকে দূরে হোস্টেলে তার না জানি কত অসুবিধা হচ্ছে ভেবে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কথার জবাব দেওয়ার জন্য এক সময় মুখ তুলতেই হিমাদ্রির চোখ পড়ে দেওয়ালে টাঙানো কার্পেটের উপর লেখনের দিকে। কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো কার্পেটে উল দিয়ে বুনে লেখা "যারা ডাক দিয়ে গেল, বন্দীশালার শিকল ঝঙ্কারে"। সেদিকে হিমাদ্রির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে দেখে মহিলা বলেন: "ওটা শমিতার লেখা। ওতো তোমাদেরই দলে, স্বদেশীর ভীষণ ভক্ত।"

হিমাদ্রি এবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখতেই দুজনেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। শমিতার দুই চোখ এতক্ষণ ওরই মুখের দিকে নিবদ্ধ ছিল। সুগৌর মুখমণ্ডলে লজ্জার ঈষৎ রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়ে। হিমাদ্রিও বুকের ভিতরে অনুভব করে এক অনাস্বাদিতপূর্ব চাঞ্চল্যের অনুভূতি। মহিলাটি জানান শমিতা তাঁর নাতনী, জেলা শহরে বালিকা বিদ্যালয়ে উপরের ক্লাসে পড়ে। কয়েক দিনের ছুটিতে বাড়িতে এসেছে। বিদায় নেওয়ার সময় হিমাদ্রি বৃদ্ধার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, শমিতাকে জানায় নমস্কার। শমিতা এখন সপ্রতিভভাবেই প্রতি-নমস্কার করে।

হিমাদ্রি অসঙ্কোচে আমাকে বলে যে, ঐ গ্রাম ছেড়ে চলে আসার পরেও বার বার তার মনের পটে ভেসে উঠেছে একখানি স্নিগ্ধ কমনীয় মুখচ্ছবি, ঘন কালো দুই চোখে পূজারিণীর শুচিশুভ্র দৃষ্টি। এই কিশোরীর চোখের নীরব ভাষায় সে খুঁজে পায় বীরপূজার অর্ঘ।

তারপর সম্প্রতি দুজনের দেখা হয়েছে নাটকীয় পরিবেশে, সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির অফিসে। হঠাৎ এভাবে আবার দেখা হবে সে কথা বোধ হয় কেউ ভাবে নি। আকস্মিকতার প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে দু পক্ষেরই কয়েক মুহূর্ত সময় লাগে।

শমিতার সঙ্গে আছে তিন চারটি মেয়ে। তারা স্বেচ্ছাসেবিকা দলে নাম লেখাতে এসেছে। হিমাদ্রি তাদের বসতে বলে প্রশ্ন করে: "আপনারা কি অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে এসেছেন?" শমিতা পাল্টা প্রশ্ন করে: "ছেলেদের বেলায় কি অনুমতির কথা ওঠে?" হিমাদ্রি জবাব দেয়: "কোন কোন ক্ষেত্রে ওঠে বৈকি।" তারপর একটু হেসে বলে: "আপনি রাগ করছেন কেন? অন্তত

আমাদের এই শহরে এখনও খুব বেশি সংখ্যক মেয়ে প্রকাশ্যে আন্দোলনে নামে নি।" শমিতাও হেসে ফেলে, বলে: "আমরা অনুমতি নিয়েই এসেছি। নতুবা কি আসা সম্ভব হত?"

তারপর কয়দিন মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য দেখা, কয়েকটি কথা, একটু হাসি। তবু দুটি তরুণ হৃদয়ের পক্ষে পরস্পরের কাছে আসার পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট। বিশেষ করে যখন তারা একই সংগ্রামের সৈনিক।

সব কথা শুনে আমি বলি "হিমাদ্রি! তোমাকে এতদিন নীরস পাথর বলেই ভেবেছি। এখন দেখছি যে, পাষাণেরও হৃদয় আছে আর সেখানে প্রেমের মুকুল ফোটে। কিন্তু যে পথের মোড়ে মোড়ে বিপদ প্রতীক্ষা করে রয়েছে, সেখানে প্রেমের স্থান আছে কি?"

হিমাদ্রি বলে, "এইখানে তোমার সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গির তফাত। আমি মনের কৃচ্ছ্রসাধনে বিশ্বাসী নই। অন্য দেশের বিপ্লবে মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমান অংশ নিয়েছে। বিপ্লবী ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভালবাসাও হয়েছে। তারা একথা জেনেই একে অন্যকে ভালবেসেছে যে, হয়ত বাসরশয্যা রচনার শুভক্ষণ কোনদিনই আসবে না তাদের জীবনে।"

আমি বলি: "তাহলে হৃদয়কে অন্যের হাতে তুলে দেওয়ায় কি লাভ? এক অপূর্ণ অকাঙ্ক্ষার বেদনাময় স্মৃতিকে বয়ে চলাই কি সার হবে না?"

হিমাদ্রি বলে: "আমি ত মনে করি যে, হৃদয়কে উপবাসী রাখার চেয়ে সে বেদনা অনেক শ্রেয়। সেখানে ব্যথার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মাধুর্যের পরশ। শমিতার সঙ্গে হয়ত পরে আর কোনদিন আমার দেখা হবে না। তবু এই স্মৃতিটুকু অনুপম পাথেয় হয়ে থাকবে।" সে আমাকে পাল্টা জিজ্ঞাসা করে: "তুমি কি স্বপ্ন দেখ না কখনও? তুমি কি পেরেছ যৌবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা-কামনা-বাসনার কণ্ঠরোধ করতে?"

আমি বলি: "তা পারি নি ঠিকই। স্বপ্নও যে দেখি না তা নয়। তবে আমার স্বপ্নচারিণী ত এখনও কায়া ধরে নি, অস্পষ্ট ছায়া হয়েই আছে। তাছাড়া তুমি যেভাবে বেদনাকেই পুরস্কার বলে মেনে নিতে রাজী আছ, আমি নিজের সম্বন্ধে ততটা নিশ্চিত নই। আমার মনে হয় যে, পেয়ে হারাবার ব্যথা বোধ হয় না পাওয়ার দুঃখের চেয়ে অনেক বেশি। তাই আমাদের জীবনে সে কল্পনা এখন নিছক কল্পমায়া হয়ে থাকাই ভাল।"

এ প্রসঙ্গ তখন আর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। তবু যেটুকু হল তা থেকে আমার অনেক দিনের একটা জিজ্ঞাসার জবাব পাই। বিপ্লবীরাও ত রক্তমাংসের মানুষ। তাদের জীবনে কি নারীর প্রেমের স্থান নেই? হিমাদ্রি খুব আত্মসচেতন দৃঢ়চিত্ত স্পষ্টবক্তা বলেই এত সহজে মনের কথা খুলে বলেছে। অন্যেরা কখনও মুখ ফুটে বলতে চাইত না, দুর্বলতা প্রকাশ করা হবে বলে। 'পথের দাবী'তে শরৎবাবু সব্যসাচীর জন্য সুমিত্রার প্রেমকে স্পষ্ট করেই রূপ দিয়েছেন। কিন্তু সব্যসাচীর মনের ভিতরটায় উঁকি দেওয়ার সুযোগও পাঠকদের দিতে চান নি। দুর্বলতা থাকাটা ত মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। তাকে জয় করতে পারাটাই শক্তির পরিচয়। নরনারীর ভালবাসা আলোবাতাসের মতই প্রকৃতির দান। সেটাকে দুর্বলতা বলেই বা গণ্য করা হবে কেন? যদি তা এগিয়ে চলার পথে পিছুটান হয়ে দাঁড়ায় তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু বিপ্লবীরা বলিষ্ঠভাবে পিছুটানের মোকাবিলা করবে, এই ত আশা করি।

নির্ধারিত দিনে প্রাদেশিক সম্মেলন শুরু হয়। মূল সভাপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কারাগারে বন্দী। কলেজ স্কোয়ারে আইন অমান্যের জন্য দণ্ডিত হওয়ার পরই তাঁকে পুলিস হেফাজতে রেঙ্গুনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে একটি রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে বিচার হবে। সুভাষবাবুও কারাবরণ করেছেন। সভাপতি হয়ে আসছেন প্রবীণ বিপ্লবী নেতা বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী।

রাজশাহী স্টেশন থেকে সব কয়টি সম্মেলনের সভাপতিকে বিরাট আড়ম্বরে মিছিল করে সভামণ্ডপে নিয়ে আসা হয়। মিছিলকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর রুট মার্চ। সামরিক কায়দায়, ব্যাণ্ডের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দৃপ্ত পদক্ষেপের ছবিটি আজও যেন চোখের সামনে ভাসে। স্মৃতির সাগর মন্থন করে কত অসংখ্য টুকরো টুকরো ছবি মনের পটে সামনে এসে দাঁড়াতে চায়। ভাবগম্ভীর পরিবেশে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠান। প্রাণ দিয়েও পতাকার মান রক্ষার শপথ নিই সমবেত সকলে। প্রতিনিধিদের ভিড়ে সভামণ্ডপ জমজমাট। বড় রাস্তা থেকে মণ্ডপের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকদের কড়া পাহারা।

আমার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম এত বড় একটা সম্মেলনে যোগ দিয়েছি। দর্শক হিসাবে নয়, মহাযজ্ঞের একজন প্রধান শরিক। বুকে আঁটা রয়েছে

কর্মকর্তাদের পদমর্যাদার চিহ্ন, মস্ত বড় একটা কাপড়ের ফুল। তা দেখে স্বেচ্ছাসেবকেরা সসম্মানে পথ ছেড়ে দেয়। প্রতিনিধিদের অনেকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় আমার দিকে। একজন বয়স্ক প্রতিনিধি এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেন: "সত্যেন! চিনতে পার?" চিনি চিনি করেও যখন পারি না, তখন পরিচয় দিয়ে বলেন: "আমি তোমার ছোটবেলার মাস্টারমশায় মণি ভৌমিক।" পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। তাঁর মনে দেশপ্রেমের যে বহ্নিশিখা চাপা আছে বলে অনুমান করেছিলাম তা সত্য হতে দেখে আনন্দ বোধ করি।

এই ধরনের কত প্রিয় স্মৃতির পাশাপাশি কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার কথাও জমা হয়ে আছে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে। একটি ঘটনা বিশেষভাবে মনে পড়ে। ছোট্ট হলেও তার তাৎপর্য তুচ্ছ করার মত নয়। অনুশীলনের বিদ্রোহী-দলের নেতৃস্থানীয় কর্মীরা প্রায় সবাই নিউ হোস্টেলে অতিথি হয়েছেন। কুমিল্লার প্রভাত চক্রবর্তী, মণীন্দ্র চক্রবর্তী, ঢাকার সতীন রায়, খুলনার প্রমথ ভৌমিক এবং আরো অনেকে। এই নিয়ে যে শহরের সহকর্মীদের কারুর কারুর মনে আমাদের সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে তা জানব কি করে? যাঁরা হোস্টেলে উঠেছেন তাঁরা নিজ নিজ পূর্বপরিচিত বন্ধুদের অতিথি হয়েছেন। সহকর্মীসুলভ মনোভাব থেকে আমরা তাঁদের সুখসুবিধার প্রতি যতটুকু সম্ভব নজর রেখেছি। এতে আমাদের দোষটা কোথায়? অথচ শহরের একজন বয়স্ক সহকর্মী সামান্য একটা ছুতোয় সন্দেহটা বেশ উষ্মার সঙ্গেই প্রকাশ করেন। টুনুদা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ কর্মীটিকে ভৎর্সনা করলেন। ফলে ব্যাপারটা তখনকার মত বেশিদূর না গড়ালেও আমি তিক্ততার স্বাদটুকু ভুলতে পারি না।

আমার মানসলোকে যে আবহসঙ্গীতের মধ্যে সম্মেলনের উদ্বোধন হয়েছিল তার মাঝে এই ঘটনা বড় বে-সুরো মনে হয়। রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে বিনা কারণে এতখানি অবিশ্বাস আর অসহিষ্ণুতা দেখা দেবে কেন? সুরেন দাশগুপ্ত বলে যে, আমি হলাম উপলক্ষ মাত্র, উষ্মা প্রকাশ করা হয়েছে আসলে তার এবং শৈলেনদার বিরুদ্ধে। সন্দেহটা তাদেরই উপরে। শুনে আমার আরো খারাপ লাগে। কয়েক বৎসর আগে হলে সম্ভবত খুব বড় আঘাত পেতাম। এখন অবশ্য ততটা লাগে না। রাজনীতির কালো দিকগুলির সঙ্গে পরিচয়ও ত ক্রমে বেশি করে ঘটছে!

বিভিন্ন সম্মেলনে নেতাদের বক্তৃতা শুনি। জানতে পাই অনেক কথা।

শিখি কত নতুন কিছু। প্রত্যেকটি সম্মেলনের বক্তৃতা এবং আলোচনা থেকে এমন কিছু উপাদান পাই যা চিন্তার বিকাশে সাহায্য করে। আবার অনেক বক্তব্যকে নিজের মনের পছন্দসই ভাবে ব্যাখ্যা করে নিই। তবু আমাদের সেই সঞ্চিত প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক জবাব কোথাও পাই না। প্রত্যেক দিন রাত্রে হিমাদ্রি, সুরেন, আমি ও নির্মল একত্রে বসে সারা দিনে শোনা কথাগুলির মধ্যে পাওয়া না পাওয়ার হিসাব মেলাই। নির্মল বড় একটা কথা বলে না, শুধু শোনে। মূল সম্মেলনে স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় কংগ্রেসের আইন অমান্য কর্মসূচীর প্রতি সমর্থনের আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

যুব সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে প্রফুল্ল গাঙ্গুলীর কণ্ঠে শুনি নতুন সুর। "গণবিপ্লবের যুগ এসেছে। সেই আদর্শ নিয়ে কাজ করতে হবে। এখন প্রয়োজন হল গণ-আন্দোলনের মারফত জনগণের বৈপ্লবিক চেতনার জাগরণ ঘটানো।"

গণবিপ্লবের এই ধারণায় যে অস্পষ্টতা রয়েছে তাকে তলিয়ে বোঝার উপযোগী রাজনৈতিক বিচক্ষণতা আমাদের কারুরই তখন হয় নি। আমরা প্রফুল্লদার বক্তব্যের ইতিবাচক দিকটিকে বড় করে দেখি। সমিতির সর্বোচ্চ নেতারা তাহলে নবযুগচেতনাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সহকর্মীদের মধ্যে যারা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য অধীর, 'গণ' শব্দটি শুনলে যাদের নাক উঁচু হয়, তাদের পক্ষে এটা বড় রাজনৈতিক পরাজয়। জিতেশদা যে বলেছিলেন নেতৃত্বের মতামতেও পরিবর্তন ঘটছে সে কথা তাহলে সত্যি! কিন্তু গণবিপ্লবের জন্য কোন্ কর্মসূচী নির্দেশ করেন নেতারা? যে গণ-আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে তাতে আমাদের ভূমিকা কি হবে? এসব প্রশ্নের জবাব ত পাই নি। নির্মল বলে: "হয়ত গোপন বৈঠকের পর নির্দেশ আসবে।"

আসবে কি? আমরা তার মত আশাবাদী হতে পারি না। নেতৃত্বের চিন্তায় পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দিয়েছে সত্যি—তবে অনেক বিলম্বে। তাঁরা ঘটনাপ্রবাহের তুলনায় সেদিক থেকে পিছিয়ে রয়েছেন। অন্যদিকে ইয়ং কমরেডস লীগের সম্মেলনে যে সব বক্তৃতা শুনি তাতেও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারি না। শুনি কংগ্রেস নেতৃত্বের চরিত্র বিশ্লেষণ। "বুর্জোয়া নেতৃত্ব সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে আপস চায়। জনসাধারণকে বিপ্লবের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য তারা এই আন্দোলন শুরু করেছে। বুর্জোয়া আন্দোলনের মুক্তি আসবে না। মুক্তিসংগ্রামের আসল শক্তি শ্রমিক ও কৃষক। তাদের নেতৃত্ব

প্রতিষ্ঠার জন্যই গঠিত হয়েছিল ওয়ার্কার্স এ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি। তার অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।" এতদিনের ব্যবধানে বক্তাদের সমস্ত কথা মনে নেই। তবে এটাই ছিল মূল সুর। ততদিনে বুর্জোয়া শব্দটির সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত হয়েছি। ডঃ ভূপেন দত্তর মুখে ত কথাটি হামেশা শুনেছি।

কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব যে বুর্জোয়া, আপসপন্থী এবং মৌলিক সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিরোধী সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে সেটাকে বুর্জোয়া আন্দোলন বলে অভিহিত করে দূরে সরে থাকার যুক্তি মেনে নিতে পারি না। যেখানে দেশের অগণিত শ্রমজীবী মানুষ লড়াইতে অংশগ্রহণ করতে চলেছে তখন কি আলোচনা ছাড়া অন্য কিছু করণীয় নেই? ইয়ং কমরেডস লীগ সম্মেলনের বক্তৃতাগুলি শুনে মোটের উপর এই ধারণা হয় যেন বর্তমানের প্রতি তাঁরা কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না।

কিন্তু কেন? এই আন্দোলন তাঁদের নেতৃত্বে শুরু হয় নি বলে? আমাদের মনের ভারটাকে হিমাদ্রি তীক্ষ্ণ ভাষায় প্রকাশ করে বলে: "আসলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমাদের নেতারা এবং কমিউনিস্টরা, উভয়েই জনসাধারণকে সেই বুর্জোয়া নেতৃত্বের প্রভাবেই ঠেলে দিচ্ছে। তারা অন্য কোন পথ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং যে পথ দেখিয়েছে তাকেই জনসাধারণ অনুসরণ করবে। বুর্জোয়া নেতাদের হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়ার মত শক্তি বা যোগ্যতা এদের কেউই অর্জন করে নি এখনও। আর সেই অক্ষমতাকে এরা ঢাকতে চায় নানা রকম বুলির আড়ালে।"

প্রতীক্ষা করে থাকি কর্মী সম্মেলনের জন্য। সেখানে আসলে অনুশীলনের কর্মীরাই মিলিত হবে। আমরা ভাবছি যে, দাদাদের সঙ্গে বিদ্রোহী নেতাদের গোপন বৈঠকে যদি কোন মীমাংসা হয় তাহলে সম্ভবত সম্মেলনে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে জিতেশদার সঙ্গে যেয়ে মহারাজের সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছি। কথাবার্তা বড় একটা হয় নি। মানুষটিকে শুধু চোখে দেখা। অবাক হয়ে ভাবি যে, এই অত্যন্ত সাদাসিধে, বৈশিষ্ট্যবর্জিত চেহারার শান্ত স্বভাবের মানুষটিই মহারাজ! বাইরের চেহারা দিয়ে যে ভিতরের আগুনকে বোঝা যায় না সেকথা ততদিনে ভালভাবেই জেনেছি। তবু তাঁকে দেখে বিস্ময় জাগে। বহু মানুষের ভিড়ের মধ্যে আলাদাভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কোন

বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ে না। কথাবার্তা অত্যন্ত শান্ত, নিরুত্তাপ। অথচ প্রয়োজনে কি ভীষণ রুদ্র হয়ে উঠতে পারেন তিনি, তা ত কারুর অজানা নয়!

মহারাজ সবাইকে বলেন: "তোমরা আমাকে সভাপতি করে খুব বিপদে ফেলেছ। বক্তৃতা ত জীবনে কোন দিন দিই নি। দিতে হবে তাও ভাবি নি। এতগুলি লোকের সামনে লিখিত অভিভাষণ পড়তেও হয়ত আমার হাত কাঁপবে, পা কাঁপবে।" জিতেশদা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকভরে নজরুলের কবিতার জের টেনে বলেন: "ছেলেরা যখন তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচবে বলে জিদ ধরেছে তখন আর কি করবেন!"

কিন্তু কর্মী-সম্মেলনের অধিবেশন আর হতে পারে না। ১৯শে এপ্রিল ভোর না হতেই বিরাট পুলিস বাহিনী প্রতিনিধি শিবির আর নেতাদের বাসস্থান ঘিরে ফেলে। খবর পেয়ে চারদিক থেকে সবাই ছুটে যাই। পুলিস চারটি সম্মেলনের চারজন সভাপতিকেই গ্রেপ্তার করেছে, আরো কয়েকজন নেতার খোঁজ করছে। হঠাৎ কেন এই ধরপাকড়? তরুণদের মধ্যে উত্তেজনা। তারা নেতাদের ছিনিয়ে নিয়ে যেতে দেবে না। শেষ পর্যন্ত নেতারা বুঝিয়ে শান্ত করেন। বহু লোক জমা হয়েছে। বিশাল জনতা মিছিল করে বন্দী নেতাদের সেণ্ট্রাল জেলের গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে।

আমরা ফিরে এলে শুরু হয় খোঁজ নেওয়ার পালা, আর কেউ ধরা পড়েছেন কিনা! পুলিস রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, আশু কাহিলী প্রভৃতি নেতাদের সন্ধান করছিল। রবিদা, আশুদা বহু অভিজ্ঞতায় পোড়খাওয়া। তাঁরা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রত্যেকটি রাতই প্রতিনিধি শিবিরের বাইরে কাটাতেন। তাই আপাতত বেড়াজাল এড়াতে পেরেছেন। হোস্টেলের উপর পুলিসের নজর এখনও পড়ে নি। পড়তে কতক্ষণ? অতএব প্রভাত চক্রবর্তীর মতন যাঁদের নামে ওয়ারেণ্ট থাকার সম্ভাবনা আছে তাঁদের নিরাপদে রাজশাহী শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ততক্ষণে এই আকস্মিক পুলিসী হামলার কারণ জানা গিয়েছে।

সকালের ট্রেনে কলকাতা থেকে বীরেন দাশগুপ্ত সংবাদ নিয়ে এসেছেন। তাঁর কাছে জানা গেল চট্টগ্রামে বিপ্লবীরা অতর্কিত আক্রমণে সরকারী অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছেন। তাঁরা চট্টগ্রাম শহরের সঙ্গে বহির্জগতের সমস্ত যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। সরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা বেতারে পাঠানো

সংবাদ কলকাতায় এসে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে গভর্নর সারা বাংলা জুড়ে সমস্ত বিপ্লবী দলের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ পাঠিয়েছে। শুধু এখানেই নয়, সমস্ত জেলায় এতক্ষণে পাইকারী হারে ধরপাকড় শুরু হয়ে গিয়েছে।

শত্রুপক্ষের প্রতি-আক্রমণ অত্যন্ত ব্যাপক হারে শুরু হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের তরফ থেকে জবাব দেওয়ার প্রস্তুতি কোথায়? দাদাদের সঙ্গে বিদ্রোহী নেতাদের বৈঠক হয়ে ওঠে নি। কেন হয়নি তাই নিয়ে ইতিমধ্যেই ভুল বোঝাবুঝি এবং এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষের উপর দোষারোপ শুরু হয়ে গিয়েছে। সুচিন্তিত সংগঠিত ভাবে কোন পরিকল্পনা নেওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়ি। হিমাদ্রি বলে: "তরুণ কর্মীদের মধ্যে এখন চট্টগ্রামের পথ অনুসরণের ঝোঁকটাই বড় হয়ে উঠবে। আর শেষ পর্যন্ত তার পরিণতি হবে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে।" আমরা কি করব তাহলে? হিমাদ্রি জবাব দেয়: "আমরাও শেষ পর্যন্ত স্রোতে গা ভাসাতে বাধ্য হব। আত্মসমর্পণ করব রোম্যান্টিক উন্মাদনার সামনে। নতুবা কোন কিছু না করেই ধরা পড়ে যাব।"

জিতেশদা এক নিভৃত বৈঠকে ডেকে পাঠালেন। তিনিই বা কি করে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ দেবেন? তিনি বলেন: "আমিও হয়ত খুব বেশিদিন বাইরে থাকব না। সমিতির দায়িত্ব এখন থেকে তোমাদের হাতে। শুধু এইটুকু অনুরোধ করি, যা করবে তোমরা মিলেমিশে করবে। সংগঠন যেটুকু আছে তা যেন ভেঙ্গে না যায়।"

জিতেশদার নির্দেশ অনুসারে প্রকাশ্য সংগঠনের ভার পেলেন টুনুদা আর গোপন সংগঠনের দায়িত্ব থাকে অম্বিকা মৈত্রের উপরে। অম্বিকাবাবু বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যে অনুশীলনের কর্মী সে কথা আগেই জানতাম। সর্বদা হাসিমুখ, মিষ্টভাষী, লাজুক প্রকৃতির এই মানুষটি হবেন জেলার গোপন সংগঠনের কর্ণধার। জিতেশদা যখন তাঁকে এই দায়িত্বের জন্য বেছে নিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই তিনি যোগ্যতম পাত্র।

জিতেশদার সঙ্গে কলেজের ছুটির পর আর দেখা হবে না ধরে নিই। বিদায় নেওয়ার সময় বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। অগ্রজ প্রতিম নেতার সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তবে সৈনিকের জীবন আমাদের। মুক্তিযুদ্ধের বলি সবাইকে একদিন না একদিন হতেই হবে। কেউ দুদিন আগে, কেউ হয়ত পরে। সেজন্য দুঃখ পেলেও মুষড়ে পড়া চলবে না। গুরু দায়িত্ব

এসে পড়েছে কাঁধের উপরে। যাঁরা জেলার ভার নিলেন তাঁরা বয়সে কিছুটা বড় হলেও তফাত খুব বেশি নয়। আমাদের সমান অংশীদার হিসাবেই গ্রহণ করেন তাঁরা।

এতদিন কাজ করে এসেছি উপরের নির্দেশে। এখন থেকে সব কিছুর ঝুঁকি নিয়ে চলতে হবে। কত কাজ পড়ে আছে সামনে! সংগঠনের ছিন্ন-সূত্রগুলিকে আবার জোড়া দিতে হবে। নতুন নতুন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে হবে সংগঠনকে। শত্রুর অগ্নিবর্ষণের সামনে দাঁড়িয়ে প্রস্তুতি করতে হবে পাল্টা আঘাত হানার। আমাদের কর্মক্ষেত্র সীমিত বটে, কিন্তু সেখানে [illegible] কাণ্ডারী। এবার হবে আমাদের যোগ্যতার পরীক্ষা। ইতিহাসের [illegible] বেগে ছুটে চলেছে। তার ঐ প্রমত্ত গতির সঙ্গে তাল রেখে [illegible] ছুটতে হবে।

ঝড়ের যাত্রী

গরমের ছুটির আড়াই মাস কোথা দিয়ে কেটে যায়। যেন এক ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ অশান্ত সাগরের সৈকতে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছি কখন তার উত্তাল তরঙ্গ এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। মনের ভিতরে গুনগুনিয়ে ওঠে বিদ্রোহী কবির গানের সেই ছত্রগুলি :

"মোদের পায়ের তলায় মূর্চ্ছে তুফান,
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড় বাদল।"

সারা দেশ জুড়ে আইন অমান্য আন্দোলনের জোয়ার ছড়িয়ে পড়েছে। শিলিগুড়িতে তার ঢেউ তখনও এসে পৌঁছায়নি বটে তবে নানা সূত্রে যেসব খবর পাই তাতে বুঝি যে, আন্দোলন গোড়ার দিকের সীমিত চরিত্র অতিক্রম করে এক অহিংস গণ-বিদ্রোহের রূপ নিয়েছে। বিদেশী শাসকের দমন নীতির নির্মম নিষ্ঠুর রথচক্র ব্যর্থ হয়েছে সেই বন্যাপ্রবাহের গতিরোধ করতে।

এপ্রিল মাসের শেষদিক থেকে শুরু হয় একের পর এক অর্ডিনান্স জারীর পালা। সংবাদ প্রকাশের উপর অজস্র বিধিনিষেধের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি প্রায় পক্ষকাল বন্ধ থাকে। তারপর যখন তারা পুনরায় আত্ম-প্রকাশ করে, তখন চলে সেন্সরের বেড়াজাল এড়িয়ে আন্দোলনের খবর পরি-বেশনের নিত্য নতুন কৌশল উদ্ভাবন। কংগ্রেস সংগঠন বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু আইন অমান্য সমিতি গোপনে সর্বত্র কাজের নির্দেশ পৌঁছে দেওয়ার এবং যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করে। সমিতির দ্বারা প্রকাশিত সাইক্লোস্টাইল করা বুলেটিনের মারফত দেশের একপ্রান্তে যা ঘটছে তার বিবরণ অন্য প্রান্তে পৌঁছে যায়। পুলিস শত চেষ্টা সত্ত্বেও সেগুলি বিলি হওয়া বন্ধ করতে পারে না। সর্বপ্রথম এই বে-আইনী বুলেটিনের দৌলতেই জানতে পারি পেশোয়ার এবং শোলাপুরের যুগান্তকারী ঘটনার কথা। দুর্ধর্ষ পাঠানেরা খান আবদুল গফুর খানের প্রভাবে রাইফেল ছেড়ে অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত

হয়েছে, তাই বলে হিম্মত হারায়নি। শান্ত নিরস্ত্র জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য তাদের উপর সাঁজোয়া গাড়ি চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোরা সৈন্যরা নির্বিচারে গুলী বর্ষণ করেছে। পাঠান নারী পুরুষ নির্ভীকচিত্তে তার সামনে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিয়েছে। কেউ পালিয়ে যায়নি। অহিংস প্রতিরোধের এই নীতি আমার কাছে অর্থহীন মনে হলেও সেই শহীদদের মৃত্যুভয়হীন, আত্মদানের গৌরবকে ত কোনমতে ছোট করে দেখা চলে না।

এরই পাশাপাশি ঘটেছে এমন আর একটি ঘটনা যার ঐতিহাসিক তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। ঠাকুর চন্দ্রসিংহের নেতৃত্বে গাড়োয়ালী সৈন্যরা নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করেছে। সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে এই প্রকাশ্য বিদ্রোহকে গভর্নমেন্ট কঠোর হস্তে দমন করতে চায়। ঠাকুর চন্দ্রসিংহ প্রমুখ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে সামরিক আদালতের বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। পাঠান জনতা গাড়োয়ালী বন্দীদের স্বতস্ফূর্তভাবে জানায় বিপুল অভিনন্দন। তারপর পেশোয়ারে কি ঘটেছিল সঠিক জানিনা এইটুকু শুনি যে, প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের সামনে ভীত সন্ত্রস্ত কর্তৃপক্ষ শহর ছেড়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। পক্ষকালের জন্য সেখানে ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্ব ছিল না।

শোলাপুরের ঘটনা আমার কাছে আরো বেশি তাৎপর্যবহ মনে হয়। সেখানে জনতার প্রতিরোধ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের ইঙ্গিত দিয়েছে। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সারা দেশে হরতাল পালনের আহ্বানে শোলাপুরও সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু সেখানকার সূতাকল শ্রমিকেরা নীরব নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদে থেমে থাকেনি। তারা পুলিস জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, থানা দখল করেছে এবং অভ্যুত্থান করে শহরের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপনের পর স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। তিনদিনের জন্য শোলাপুর ছিল মুক্ত শহর। তারপর বাইরে থেকে ইংরেজ সৈন্যদল এসে বর্বর সন্ত্রাস আর রক্তের বন্যায় বিদ্রোহ দমন করেছে।

সঠিক নেতৃত্ব দিলে অহিংস গণ-বিদ্রোহই যে সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হতে পারে, তার জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়েছে পেশোয়ার আর শোলাপুর। কিন্তু কোথায় সেই নেতৃত্ব যা এই মহান সম্ভাবনাকে সার্থক করে তুলবে? আকুল হয়ে সেই কথা ভাবি। শিলিগুড়িতে এমন কেউ নেই যার কাছে মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারি। আবেগের প্রাবল্যে হিমাদ্রিকে চিঠি লিখে বসি।

কাজটা যে কত ছেলেমানুষি হয়েছে তা বুঝতে পারি হিমাদ্রির জবাব পেয়ে। তার চিঠিতে আমার প্রসঙ্গের কোন উল্লেখই নেই। সে শুধু লিখেছে যে, ছুটির পর যখন সাক্ষাৎ হবে তখন সব কিছু আলোচনা করা যাবে। সম্বিত ফিরে পাই। সত্যিই ত পুলিসের নজর রয়েছে আমাদের দুজনের উপরে। তারা চিঠিপত্র খুলে দেখবে না এমন ধারণা করাটা নিছক বোকামি। অগত্যা কিছুদিনের জন্য নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিই। ততদিনে চট্টগ্রামে জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ কানে এসে পৌঁছেছে। যারা সেখানে সৈনিকের মৃত্যুবরণ করেছে মধু দত্ত তাদের অন্যতম। খবরটা মোহন আগেই পেয়েছিল। তবু সঠিক তথ্যের জন্য প্রতীক্ষা করেছিলাম। এখন নিহত বিপ্লবীদের একটি ফটো অ্যালবাম সুড়ঙ্গপথে এসে পড়ে আমাদের হাতে। ফটো দেখে বন্ধুকে চিনতে কষ্ট হয় না। সে তার চির ইপ্সিত শহীদের মৃত্যুবরণ করেছে। নিজেকে আহুতি দিয়েছে মাতৃভূমির মহাযজ্ঞে। এজন্য যে আদৌ তৈরী ছিলাম না তা নয়। বছর খানেক আগে মধু একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজশাহী এসেছিল। তারা যে এবার সত্যিই একটা কিছু করতে চলেছে তা তখনই খানিকটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। আর এই মরণই ত আমাদের সকলের কাম্য। তবু কিছুদিনের জন্য একটা বিরাট শূন্যতা অনুভব করি।

মোহন একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। তার মুখ চেয়ে আমাকে শক্ত হতে হয়। সান্ত্বনা দিয়ে বলি যে, মুষড়ে পড়লে চলবে না। আমাদের এই অঞ্চলেও একটা বড় রকমের "এ্যাকশন" করার ডাক হয়ত অদূর ভবিষ্যতে এসে যাবে। তার প্রস্তুতি হিসাবে আমাদের ছোট্ট গোপন সংগঠনটির পরিধি বাড়াতে হবে।

কথাটা বলেছিলাম মোহনকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে। কি ধরনের "এ্যাকশন" তার কোন ধারণা বা পরিকল্পনা মাথায় নেই। অথচ একটা কিছু লক্ষ্য সামনে না থাকলে নিছক সংগঠনের জন্য সংগঠন করায় কার মনেই বা প্রেরণা জাগে। নিজেকে দিয়েও সে কথা ভালভাবে বুঝি। ছুটির সময়টার সদ্ব্যবহার করতে হবে। সারা দেশ জুড়ে যখন সংগ্রাম চলেছে তখন একটা দিনও কর্মহীনভাবে কাটাতে নিজেকে যেন নিতান্ত অপরাধী বোধ করি। কাজ চাই। কাজ সৃষ্টি করতে হবে। বাধা অনেক। শিক্ষিতদের অ-রাজনৈতিক

পরিবেশে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের নিয়ে ছাত্র বা যুব সংগঠন গড়ে তোলার সম্ভাবনা খুবই কম। আমি কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকে এখানে নতুন মুখের আমদানি বড় একটা হয় নি। যে ক'জন আছে তাদের মধ্যে আগ্রহের অভাব। উপরন্তু রয়েছে অভিভাবকদের কড়া শাসন।

সংগঠনের পরিধিকে প্রসারিত করার একমাত্র উপায় শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে তাকে প্রসারিত করা। অথচ এই অঞ্চলের উপেক্ষিত মানুষগুলির হৃদয়ের দুয়ারে দূরে থাকুক, তাদের আঙ্গিনার ধারে পৌঁছোবার উপযুক্ত যোগসূত্র তখনও খুঁজে পাই নি। ভেবে স্থির করি মঙ্গল সিংয়ের সাহায্য পেলে হয়ত এই সমস্যা সমাধানের একটা পথ হবে। তিনি তখন তরাইয়ের হাটে বন্দরে বস্তিতে ঘুরে ঘুরে কংগ্রেসের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন। আলোচনার সুযোগ করে দিলেন তিনি নিজেই। রাজশাহীতে আমার কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর কি করে যেন তাঁর কানে পৌঁছেছিল। একদিন পথে দেখা হতে অভিযোগের সুরে বলেন: "আপনি রাজশাহীতে কংগ্রেসের কাজ করবেন আর নিজের জায়গায় এসে ভাল ছেলে হয়ে থাকবেন, এটা কেমন কথা?" সেই সূত্র ধরে একথা ও কথার পর দুজনে তাঁর ঘরে গিয়ে বসি।

সেদিন শহরের ভদ্রলোকদের চোখে মঙ্গল সিং ছিলেন একজন মাথাগরম লোক এবং অগ্নিবর্ষী রাজদ্রোহ-প্রচারক। তাঁর আস্তানায় যাওয়াটা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বহু মন্তব্যও শুনতে হবে জানি। তবু আমার পক্ষে এটুকু ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। আলাপে আলাপে তাঁকে সব কিছু খুলেই বলি। শুনে তিনি বলেন: "আমি ত গান্ধীজীর অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী। অতএব আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি না। তবে আপনাদের দেশপ্রেমকে শ্রদ্ধা করি। তাই অন্যভাবে যতটা সম্ভব সাহায্যে করব।"

এটুকু তখনকার মত আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি নিজে কেন এখানে প্রকাশ্যে কাজ করতে পারব না তা বুঝিয়ে বলি। স্থির হয় যে, মোহন কংগ্রেস-কর্মী হিসাবে মঙ্গল সিংয়ের সঙ্গে ঘুরবে। মোহনকে নির্দেশ দিই: "হাটে বক্তৃতা দেওয়ার লোভ তোমাকে সামলাতে হবে। তুমি মঙ্গল সিংয়ের সঙ্গে গ্রামে ঘোরার উপর মনোযোগ দেবে। কৃষকের ঘরের ছেলেদের যাতে দলে টানতে পারো সেটাই হবে তোমার প্রধান লক্ষ্য।"

কি একটা উপলক্ষ্যে ব্রজেন বাবুর সঙ্গেও যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তিনি

হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। পূর্ববঙ্গের মানুষ, জীবিকার তাগিদে বছর দুই হল এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। রোগীর সন্ধানে সাইকেলে চেপে গ্রামাঞ্চল চষে বেড়ান। তারই ফাঁকে ফাঁকে কংগ্রেসের কাজ করেন। তরাইয়ের হাটবার-গুলিতে মঙ্গলসিং-এর সাথী হন। পূর্ববঙ্গের লোক যখন, তখন কোন না কোন সূত্রে নিশ্চয়ই গুপ্ত সমিতির সঙ্গে তাঁর কিছুটা যোগ থাকতে পারে ধরে নিয়েছিলাম। কথায় কথায় জানতে পারি যে আমাদের সমিতির দুই একজন নেতৃস্থানীয় কর্মীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর পরিচয় আছে। সেই প্রসঙ্গ ধরেই কাজের কথা তুলি। শিলিগুড়ির মত জায়গায় গুপ্ত সমিতির অস্তিত্ব আছে জেনে তিনি প্রথমটায় খুবই বিস্মিত হন। তাঁর ধারণা, লাঠি-খেলা, ছোরা-খেলা এবং জিমন্যাস্টিকের ক্লাব ইত্যাদির মারফত সমিতি কাজ করে। এখানে ত সে সবের চিহ্নমাত্র নেই। কেন যে ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা করি নি তা বুঝিয়ে দেওয়ার পর অবশ্য মেনে নিলেন।

ব্রজেন বাবুকে সমর্থক হিসাবে পেয়ে যথেষ্ট উৎসাহিত হই। কেন না চিকিৎসক হিসাবে গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছানো তাঁর পক্ষে অনেক সহজ। সমিতির জন্য তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে কিছু করতে হবে না। তিনি শুধু মোহনকে নিজের সহকারী রূপে পরিচয় করে দেবেন। ব্রজেনবাবু আর একটি ব্যাপারেও আমাকে সাহায্য করেন। যদু কুশারীর সঙ্গে পরিচয় তিনিই করিয়ে দেন।

যদুবাবু অনুশীলনের প্রাক্তন কর্মী। একবার জেল খেটেও এসেছেন। ঐ সময়টাতে তিনি কার্শিয়াং-এ একটি স্কুলে শিক্ষকতা করছিলেন। সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ নেই। রাজনীতির সংস্রবও রাখেন না। সেদিন কার্শিয়াং শহরে সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করে তা রাখা সম্ভবও নয়। কিন্তু রাজনীতির নেশা যাকে একবার পেয়ে বসে তার পক্ষে অতীতকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাওয়া কি সম্ভব হয়? ব্রজেনবাবুর চিঠি নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বুঝতে পারি তিনি এখনও মনে মনে সমিতির কার্যকলাপের প্রতি গভীর সহানুভূতি পোষণ করেন।

যদুবাবুর প্রসঙ্গ এখানে তোলার একটি বিশেষ কারণ আছে। পার্বত্য অঞ্চলে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার পথে যে সব বাধা ও সমস্যা আছে সে সম্বন্ধে তাঁর কাছেই আমি সর্বপ্রথম কিছুটা ধারণা লাভ করি। যদুবাবু কার্শিয়াং-এ এসেছেন কয়েক বছর আগে। নিজে রাজনীতি না করলেও প্রবীণ বিপ্লবীর

অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে এখানকার পরিস্থিতিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন : "স্বাধীনতার যে আবেদন সমতলের সাধারণ মানুষের, শহরের মধ্যবিত্ত ছাত্র ও যুবকের মনে সহজে সাড়া জাগায়, এখানে ঠিক সেই রকমটি আশা করা ভুল হবে। সেই দলবাহাদুর গিরির ঘটনার পর থেকে ইংরেজ গভর্নমেন্ট সুকৌশলে পাহাড়ের মানুষের মনে সমতলবাসীদের বিরুদ্ধে একটা সন্দেহ ও বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টি করতে পেরেছে। আমরা অর্থাৎ সমতলভূমি থেকে যারা এখানে এসে বাস করছি তাদের আচরণও এজন্য খানিকটা দায়ী। ইংরেজ তার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে। তাই পাহাড় অঞ্চলে কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে শুরু করতে হবে একেবারে নীচের তলা থেকে। যারা খেটে-খাওয়া মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলির প্রতি নজর দিয়ে সেখান থেকে কাজ আরম্ভ করতে হবে।"

যদুবাবু যে অবস্থাটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সে সম্বন্ধে আমারও মোটামুটি একটা ধারণা ছিল। সুতরাং তাঁর কথা বুঝতে বা মেনে নিতে অসুবিধা হয় নি। তবে বোঝা আর তাকে কাজে পরিণত করা, দুটো ত এক জিনিস নয়। কাজে পরিণত করতে হলে একটা দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী নিয়ে এই অঞ্চলে পড়ে থাকতে হয়। আমাদের তখনকার বিপ্লব কল্পনায় অতখানি সময় দেওয়ার অবকাশ কোথায় ? কার্শিয়ং এবং দার্জিলিং শহরের বাঙ্গালী বাসিন্দাদের কাছ থেকে কোন রকম সাড়া পাওয়ার আশা নেই বলেই তিনি জানান। যদি বা দুই এক জনকে কোন মতে পাওয়া যায় তাদের 'রিজার্ভ' হিসাবে রেখে দেওয়াই ভাল। প্রয়োজন হলে সমতলের আত্মগোপনকারী কর্মীদের আশ্রয় দেওয়া এবং যতটুকু সম্ভব অর্থসাহায্য করা, এটুকুই হবে তাদের কাজ। যদুবাবুর উপদেশকে যুক্তি-যুক্ত বলে মেনে নিই। তাঁর সঙ্গে আলাপের ফলে মনে বেশ ভরসা হয়। প্রত্যক্ষভাবে কোন কাজ তিনি নাই বা করলেন। প্রয়োজন মত পরামর্শ এবং উপদেশ দেবার উপযুক্ত একজন বয়স্ক অভিজ্ঞ লোক পাশেই রয়েছেন, এটার মূল্যও ত কম নয়।

কার্শিয়াং-এর পর দার্জিলিং। বাড়িতে বলে এসেছি যে, পাহাড়ে যাচ্ছি বেড়াবার উদ্দেশ্য নিয়ে। দার্জিলিং চকবাজারে মঙ্গল সিং-এর আলু-পেঁয়াজের দোকান আছে। খাওয়ার ব্যবস্থা তাঁর ওখানে, থাকা ধর্মশালায়। এই উপলক্ষ্যে পার্বত্য প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় আরো ঘনিষ্ঠ হয়। একে ত হিমালয়ের

নয়নাভিরাম অপরূপ সুন্দর পরিবেশ আর সেই সঙ্গে মিশে যায় যে কাজে এসেছি তার রোম্যান্টিক আমেজ। দুইয়ের রংয়ে রঙীন হয়ে কল্পনেত্রের সামনে ভেসে ওঠে কত বিচিত্র ছবি! আপন মনে চড়াই-উৎরাই ভেঙ্গে পাহাড়ী পথ পরিক্রমা করি আর স্বপ্নের জাল বুনে চলি। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে এই সব পথঘাট, গভীর বনে ঢাকা অতলস্পর্শী খাদ হবে আমাদের রণক্ষেত্র। একটি দিনের কথাই বলি। মঙ্গল সিং-এর চিঠি নিয়ে চলেছি 'সীমানা' অভিমুখে।

সীমানা অর্থাৎ দার্জিলিং এবং নেপালের সীমান্তে অতি ছোট্ট একটি বন্দর। সেখানে থাকার মধ্যে আছে আশপাশের জনবিরল বস্তির গরিব মানুষদের সামান্য চাহিদা মেটাবার মত কয়েকটি দোকানপাট। ওদের মধ্যে আছে দু জন বিহারী দোকানদার, সরযূ সিং এবং রামপ্রসাদ—মঙ্গল সিং-এর অনুগত ভক্ত। মঙ্গল সিং বলেন: "ওরা দু জনে নওজোয়ান। হয়ত বোঝাতে পারলে আপনার দলে যোগ দেবে। জায়গাটা নিরিবিলি। দরকার হলে আপনাদের কোন ফেরারী কর্মী হিন্দুস্থানী সেজে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে পারবে।" এরকম একটা সুযোগ অপ্রত্যাশিতভাবে হাতের মুঠোয় এসে গেলে কি ছাড়া চলে? কোনরকম "এ্যাকশন" শুরু হলে আশ্রয়ের প্রয়োজন ত হবেই। তার উপর সীমান্ত এলাকা। একদিকে নেপাল। অন্যদিকে সীমানার গা ঘেঁষে জেলা বোর্ডের সড়ক মিরিক পর্যন্ত প্রসারিত। মিরিকে পৌঁছাবার আগেই বালাসন নদী পার হয়ে পাঙখাবাড়ী রোড ধরে পানিঘাটায় পৌঁছানো যায়। হিলকার্ট রোড এড়িয়ে গোপনে যাতায়াতের বিকল্প পথ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। সব দিক থেকে গোপন ঘাঁটির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ঘুম স্টেশন থেকে সুখিয়াপোখরি পর্যন্ত যেতে হবে বাসে। তারপর মাইল তিনেক পদব্রজে। এই তিন মাইল মানুষের মুখ দেখতে পাই নি। পথের দুপাশে পাইন বনের ভিতর থেকে ঝিঁঝির একটানা ঝিমঝিম ডাক শুনতে শুনতে এগিয়ে চলেছি।

পাহাড়ে বর্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে নীচের উপত্যকা থেকে জলভরা 'ফগ' উঠে চারিদিকে ঢেকে ফেলে। মনে হয় যেন ধুসর ধোঁয়ার সমুদ্রের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি। গন্তব্যস্থানে পৌঁছোবার পর সরযূ সিং এবং রামপ্রসাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের অনুভূতি কম বিচিত্র নয়। মঙ্গল সিং-এর চিঠি নিয়ে এসেছি শুনে তারা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। সে রাতটা তাদের অতিথি হয়ে কাটাতে হবে। কাটাতে এমনিতেই হত। একে ত

অনভ্যস্ত পাহাড়ী পথে একটানা নীচের দিকে নামতে নামতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তার উপর সুখিয়াপোখরি থেকে ধূমযাত্রী 'বাস' অনেকক্ষণ আগেই চলে গিয়েছে। ফিরতে হলে পনের মাইল চড়াই পদব্রজে অতিক্রম করতে হবে। ফিরতে চাইলেও ওরা ছেড়ে দেবে না! একে ত এই জনমানবহীন অঞ্চলের নতুন কোন আগন্তুক এলে সেটুকুই ওদের কাছে কত বৈচিত্র্যময় মনে হয়। তার উপর সেই মানুষ যদি কোন মানুষের সন্ধান বয়ে আনে তাহলে ত কথাই নেই। সন্ধ্যা না হতেই রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে নিই। চারিদিক তখনই নিশুতি নিস্তব্ধ। গাঢ় কুয়াসার আবরণে সব কিছুকে ঢেকে ফেলেছে। মনে হয় যেন বাইরের জগতের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপে বসে কথা বলছি। কম্বল জড়িয়ে আগুনের চারধারে বসে গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা চলে।

মঙ্গল সিংকে ওরা গুরুর মতই শ্রদ্ধা করে। তবে তিনি ঠিকই বলেছেন যে, ওরা হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামায় না। কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণ ও বামপন্থা, কংগ্রেসের বাইরে নানা দল, মত ও পথের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন খবরও রাখে না। ওরা শুধু বোঝে যে, স্বরাজ চাই আর সেই স্বরাজের জন্য সম্ভাব্য সমস্ত রকম উপায়ে লড়াই করতে হবে। আমার কাজে যথাসাধ্য সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে ফিরে আসি। পরের দিন দার্জিলিংয়ে প্রত্যাবর্তনের পর যখন শিলিগুড়ি অভিমুখে যাত্রা করি তখন মনের মধ্যে সাফল্যের অনুভূতি গুঞ্জরিত হয়ে উঠতে থাকে। কাজ সৃষ্টি করব ভেবে পা বাড়িয়েছিলাম অজানার উদ্দেশ্যে। সে চেষ্টা কিছু পরিমাণে সার্থক হয়েছে।

ততদিনে কলকাতায় ছাত্র সমিতির বিশেষ কনভেনশনে সমস্ত স্কুল-কলেজে অনির্দিষ্টকাল ধর্মঘটের আহ্বান দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়িতে পৌঁছে সংবাদ-পত্রের মারফতে সে কথা জানতে পারি। বড়দা বলেন যে, আপাতত কিছুদিন রাজশাহীতে নাই বা গেলে। তিনি ত জানেন না যে, ধর্মঘট পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর ছোট ভাইকেই নিতে হবে। আমি বলি : "ওখানে যেয়ে যদি অবস্থা সেরকম দেখি তাহলে নাহয় ফিরে আসব।" রাজশাহীতে ফিরে দেখি একটা থমথমে অবস্থা। কলেজ কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করছেন যে, খোলার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘট শুরু হয়ে যাবে। নিউ হোস্টেলের উপর এবার তাঁরা সতর্ক দৃষ্টি দিয়েছেন। আগে পাঁচটি ব্লকের দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন একজন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। এখন সেখানে

তিনজনের উপর দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। ছুটি ব্লকের সঙ্গেই তৈরি হয়েছে নতুন অধ্যক্ষ দুজনের জন্য আবাসিক কোয়ার্টার। আমাদের ছুটি ব্লকের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে এসেছেন বাংলার অধ্যাপক। তিনিও আমাদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন। সুতরাং একেবারে গোড়া থেকেই বাধা পাওয়ার আশঙ্কা নেই। তারপরে যা হয় দেখা যাবে। সমুদ্রে শয়ন করতে চলেছি, শিশিরে কি ভয়। ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের সবাই এসে উপস্থিত হয়েছে। সুরেন দাশগুপ্ত বি. এ. পরীক্ষার পর এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা ছিল। যায় নি। সম্মুখে জীবনের প্রথম অগ্নিপরীক্ষা। আমাদের 'টিম'টি অক্ষুণ্ণ আছে দেখে যথেষ্ট ভরসা পাই। ছাত্রদের অধিকাংশ তখনও এসে পৌঁছোয়নি। তাই আমরা পরামর্শ করে কিছুদিন অপেক্ষা করাই শ্রেয় বিবেচনা করি। ধর্মঘট হবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য। সেক্ষেত্রে ছাত্রদের সাধারণ সভায় অন্তত সংখ্যা-গরিষ্ঠের সমর্থন নিয়ে পদক্ষেপ করাই সমীচীন হবে। কিছু সংখ্যক কর্মী অবশ্য অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। তারা বলে কলকাতার কলেজগুলিতে যখন শুরু হয়ে গিয়েছে তখন আর বিলম্বের প্রয়োজন নেই। আমরা বলি : "বিনা প্রস্তুতিতে কলকাতার পদাঙ্ক অনুসরণে হয়ত সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হবে না।"

ছাত্র সমিতির সভায় আমাদের প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তুতি পর্বের জন্য সাতজনকে নিয়ে গঠিত হয় সংগ্রাম পরিষদ। পদাধিকার বলে আমি সভাপতি। এদিকে জেলার গোপন সংগঠনের মধ্যে একটা সংঘাত শুরু হয়েছে। জিতেশদা গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই এখানে অনুশীলনের সভ্যদের মধ্যে একটা বিদ্রোহী-গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করে। এখন সেটা বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। তারা অবিলম্বে জঙ্গী কার্যকলাপ আরম্ভ করার পক্ষপাতী। এই বিদ্রোহের পিছনে খানিকটা রয়েছে চট্টগ্রামের অনুপ্রেরণা। কিন্তু সুরেন বলে যে, আর একটা দিকও রয়েছে। টুনুদা জেলার নেতা হওয়ায় কর্মীদের এক অংশ বিক্ষুব্ধ। সেই বিক্ষোভটাই অন্যভাবে ফুটে উঠেছে।

টুনুদা জেলার নেতৃস্থানীয় কর্মীদের এক গোপন বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে বিদ্রোহীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা উপস্থিত করে। অভ্যুত্থান বলতে একদিন অতর্কিতে বড় ডাকঘর এবং ট্রেজারী লুঠ করা হবে। তারপর আশ্রয় নেওয়া হবে পদ্মার চরে। অনেকে এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করে। শহরে আমাদের এমন সংগঠন নেই যে, ট্রেজারী আক্রমণ ও দখল করা সম্ভব হবে।

অথচ ট্রেজারী লুণ্ঠন করতে পারলেই একটা চমক সৃষ্টি হয়। কেউ বলে যে, পদ্মার চরে আশ্রয় নেওয়ার প্রস্তাব নেহাৎ অবাস্তব। সেখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশ মুসলমান। তাদের সঙ্গে আমাদের কোন যোগসূত্র নেই। তারা আমাদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে না। টুনুদা বলেন: "সমিতির অনেক নেতা ধরা পড়লেও সবাই পড়েন নি। যাঁরা বাইরে আছেন তাঁরা মিলিত হয়ে শীগগিরই কোন নির্দেশ দেবেন আশা করি। সেজন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন। তাছাড়া ঠিক বর্তমান মুহূর্তে এখানে কোনরকম হিংসাত্মক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হলে আইন অমান্য এবং ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। এই জেলায় দুটিরই নেতৃত্ব রয়েছে আমাদের হাতে, আর তা ক্রমে গতিবেগ সঞ্চয় করছে।" বিদ্রোহীদের নেতা বটব্যাল এসব যুক্তি মানতে রাজী নয়। সে বলে: "এই অধ্যায়ে পথের নিশানা দেখিয়েছে চট্টগ্রাম। দাদাদের জন্য আমরা সে গৌরব অর্জন করতে পারি নি। তবু এখন যেখানে যতটুকু শক্তি আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার। নতুবা অনুশীলনের মর্যাদা ধূলায় লুটাবে।"

যারা বটব্যালের মতের বিরোধী, তার তৎক্ষণাৎ কোন জবাব খুঁজে পায় না। তারা শুধু দলের শৃঙ্খলার প্রশ্নকে বড় করে তুলে ধরে। জবাব দেয় হিমাদ্রি। সে দৃঢ়ভাবে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করে বলে: "চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের বীরত্ব এবং আত্মত্যাগকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমার মতে চট্টগ্রাম নতুনের নিশানা নয়, অতীতের পরিসমাপ্তি। গণ-সংশ্রবহীন অভ্যুত্থানের যে স্বপ্ন দেখতে আমরা এতদিন অভ্যস্ত ছিলাম এটা তারই একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তবে আমার মতে আগামী অধ্যায়ের সূচনা করেছে শোলাপুর আর পেশোয়ার। যদি কোন বৈপ্লবিক পরিকল্পনা নিতে হয় তাহলে শোলাপুরের নির্দেশিত দিগন্তই হবে আমাদের লক্ষ্য।" হিমাদ্রির চিন্তা কোন খাতে বইছে তার সঙ্গে সুরেন এবং আমি যথেষ্ট পরিচিত হলেও অন্য সবার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। তাদের নানা প্রশ্নের উত্তরে হিমাদ্রি বলে: "আইন অমান্য আন্দোলনকে নিয়ে যেতে হবে গ্রামের কৃষকদের মধ্যে। তারা অংশগ্রহণ করবে নিজস্ব ধরনে। তারপর গণবিক্ষোভ যখন চরমে উঠবে তখন পুলিস জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে আমরা সংগঠিতভাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপদান করব।" বটব্যালেরা হিমাদ্রির কথাকে হেসে উড়িয়ে দেয়। অন্যেরা মুখ ফুটে কিছু না বললেও বুঝি যে, তাদের মানসিকতায় ঐ ধরনের পরিকল্পনাকে অবাস্তব বলে মনে হয়।

শুধু সুরেন আর আমি হিমাদ্রিকে সমর্থন করি। বৈঠক আরো কিছুক্ষণ চলে বটে, কোন মীমাংসা হয় না। শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে এসে পড়ার লক্ষণ দেখা দিতে টুনুদা বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। দলের ভাঙনকে আর জোড়া দেওয়া যাবে না এই উপলব্ধি নিয়েই সবাই ফিরে আসি। হয়ত অচিরেই এখানে বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম শুরু হয়ে যাবে।

কি হবে না হবে তা নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ মেলে না। কলেজে ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়। ছাত্রদের সাধারণ সভায় বিপুল সংখ্যাধিক্যে সিদ্ধান্ত হয় বটে — তবে যারা বিরোধিতা করে তাদের সংখ্যা নগণ্য নয় দেখে কিছুটা বিস্মিত হই। আমার ও সুরেনের অনুরোধে মুসলিম ছাত্ররাও সভায় উপস্থিত হয়েছিল। দু'তিন জন বাদে তাদের সবাই বিরুদ্ধে মত দেয়। এটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। হামাদের সঙ্গে পূর্বাহ্নে আলোচনা করে নিয়েছিলাম। সে বলেছিল সেই পুরানো কথা, এই আন্দোলনে যোগ দিলে তাদের সম্প্রদায়ের মানুষ অসন্তুষ্ট হবে। কিন্তু হিন্দু ছেলেদের মধ্যে একটা অংশ যে বিরোধিতা করবে তা আশা করিনি। এজন্য কেউ কেউ আমাদের পূর্বতন সিদ্ধান্তকে দায়ী করে। তারা বলে যে, কনভেনশনে যখন ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে তখন আর এখানে কালক্ষেপের প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিল না অতটা গণতান্ত্রিক হয়ে ছাত্রদের সকলের মতামত নেওয়ার। যে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেখানে আমি উন্মাদনা সৃষ্টির চেষ্টা করিনি, এজন্যও তারা অভিযোগ করে। অথচ আমি জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ছাত্ররা নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না বলে যথেষ্ট আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেই সঙ্গে অবশ্য বলেছিলাম যে, "এই সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হবে। অনেক দুঃখকষ্ট নির্যাতন বরণ করে নিতে হবে। সেজন্য মনের দিক থেকে প্রস্তুত হয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। নতুবা ঝোঁকের বশে কিছু করলে হয়ত মাথা হেঁট করে ফিরে আসতে হবে দুদিন পরে"। হুজুগের উপরে ডাক দিলেই যে ধর্মঘট স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে সফল হত না তার প্রমাণ পাওয়া যায় অল্পকালের মধ্যেই। প্রথম কয়েক-দিন পিকেটিং করার প্রয়োজন দেখা দেয় নি। মুসলিম ছাত্ররা অবশ্য কলেজে গিয়েছে। তাদের শতকরা ৯৫ জন থাকে কলেজের কম্পাউণ্ডের মধ্যে ফুলার হোস্টেলে।

হিন্দু ছাত্রদের হোস্টেলগুলি বা শহর থেকে কেউ ক্লাসে যোগ দিতে আসে

নি। কিন্তু তারপরই পিকেটিংয়ের ব্যবস্থা জরুরী হয়ে ওঠে। দুটি প্রধান গেট ছাড়াও কলেজের বিশাল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রবেশের বহু পথ রয়েছে। পদ্মার দিকটা ত অবারিত। তাই পিকেটার চাই যথেষ্ট সংখ্যায়, একজন বা দুজনের কাজ নয়। শহরে যে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী সংগঠিত হয়েছিল তারাই এজন্য এগিয়ে আসে। হোস্টেলগুলি থেকে বড় একটা কাউকে পাওয়া যায় না। টুনুদা এবং অম্বিকাবাবু দু জনেই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা কয়েকজন যেন কিছুতেই পিকেটিং করে কারাবরণ না করি। কেন না তাহলে ধর্মঘট বেশি দিন জীইয়ে রাখা যাবে না।

ধর্মঘট চলেছিল মাস খানেকের উপর। কিছুদিনের জন্য এটাই রাজশাহী শহরে আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। তীব্র উত্তেজনা আর চাঞ্চল্যে ভরা সেই দিনগুলি এমনই দ্রুততালে কেটে গিয়েছে যে, আজ এত বছর পরে স্মৃতির ভগ্নাংশগুলি এলোপাথাড়িভাবে মনের সামনে ভেসে উঠছে। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে জমা হয়েছে অজস্র নতুন উপাদান। সাদা এবং কালো দু-টি দিকেরই সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। কারুর কাছে পেয়েছি অপ্রত্যাশিত সমর্থন, পরামর্শ, উপদেশ। সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ এসে শ্রদ্ধার অর্ঘ দিয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে অন্যায় সমালোচনা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছি। যারা পাশে এসে দাঁড়াবে ভরসা দিয়েছিল তাদের কেউ কেউ বিপদের সামনে পিছিয়ে গিয়েছে। যাদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করি নি তারা সঙ্কট মুহূর্তে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। তখন কিন্তু যখন যা ঘটেছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মোকাবিলা করেছি। এক মুহূর্তের ঘটনা নিয়ে পরের মুহূর্তে মাথা ঘামাবার ফুরসত পাইনি। সকালে উঠে পিকেটিংয়ের ব্যবস্থা, সারাদিন আনুষঙ্গিক নানা কাজে ঘোরাফেরা, সন্ধ্যায় ভুবনমোহন পার্কের জনসভায় অথবা হোস্টেল-গুলিতে ছাত্রদের সমাবেশে বক্তৃতা। সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক চলে গভীর রাত্রি পর্যন্ত। বৈঠক শেষ হলে সেখানেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়ি।

ইংরেজীর তরুণ অধ্যাপকের সঙ্গে একদিন পথে দেখা হল। নমস্কার করে পাশ কাটিয়ে যেতে তিনি স্নেহভরে কাছে ডেকে নিয়ে বলেন : "এবার তোমরা যে সংযম ও বিবেচনার পরিচয় দিয়েছ তাতে চমৎকৃত হয়েছি।" আমি কথাটা ঠিক বুঝি নি। অধ্যাপক শিক্ষায়তন এবং সাহিত্যের বাইরের কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন না বলেই এতদিন ধারণা ছিল। মুখ তুলে তাকাতে বলেন :

"তোমরা যে হুজুগের মাথায় কাজ করনি, বেশ ভেবেচিন্তে তবে ধর্মঘটে নেমেছ সেই কথাই বলছি।" আমি বলি: "স্যার। ভেবেছিলাম যে, আপনি বুঝি আমাকে হুজুগে মাতবার দোষে দোষী করে ভর্ৎসনা করবেন"। তিনি উত্তরে বলেন: "গত মহাযুদ্ধের সময়ে ইয়োরোপের সমস্ত দেশের শিক্ষায়তনগুলি কয়েক বৎসরের জন্য কার্যত বন্ধ হয়ে ছিল। ছেলেরা দলে দলে সৈন্যদলে যোগদান করেছে। এও ত আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ। কলেজগুলি কিছুদিন না হয় বন্ধ হয়েই থাকুক।" তাঁর কাছে জানতে পারি যে, দুই একদিনের মধ্যে কলেজ গেটে পুলিস মোতায়েন হবে। পিকেটারদের গ্রেপ্তার করা হবে। প্রিন্সিপ্যাল যাতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সেজন্য তাঁর উপর নানা মহল থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। এতদিন তিনি ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। এখন আর সম্ভব হবে না। আমরা ত ধরে নিয়েছিলাম যে, প্রথম থেকেই পুলিসের আক্রমণ শুরু হবে। পক্ষকাল কেটে গেল তবু তারা কিছু করছে না দেখে বরং আশ্চর্য হয়েছিলাম। অধ্যাপকের কথায় কারণটা বুঝতে পারি। পরের দিন দেখি, কলেজের প্রবেশ-পথগুলি লাল পাগড়ীতে ছেয়ে ফেলেছে। একদল পিকেটার গ্রেপ্তার হওয়ার পর জনসাধারণের উত্তেজনা ফেটে পড়ে। জনতা জয়ধ্বনি করতে করতে তাদের জেল গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে। এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয় এমনি ভাবে। তারপর ধর্মঘট পরিচালনায় সঙ্কট দেখা দেয়। হোস্টেলের ছেলেদের একটা অংশ ইতিমধ্যেই কলেজে যোগ দেওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে। তাদের উপর নাকি অভিভাবকদের তরফ থেকে ক্রমাগত চাপ আসছে। দেরিতে শুরু করার জন্য যারা আমার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল তাদেরই দুই একজনকে দেখি ধর্মঘট ভাঙার ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে। এদিকে শহর থেকে পিকেটার পাওয়ার সম্ভাবনা আর নেই। যারা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নাম লিখিয়েছিল তাদের প্রায় সবাই কারাবরণ করেছে। হোস্টেলগুলি থেকে যারা নাম দিয়েছিল তাদের মধ্যে দুই একজন বাদে অন্যেরা শেষ মুহূর্তে নানা অজুহাতে পিছিয়ে যায়।

সেদিনকার মতন সঙ্কটের সমাধান করে দেয় সুরেন দাশগুপ্ত। সে দু'তিন-জন সঙ্গী নিয়ে পুলিস বেষ্টনীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রেপ্তার হয়। সুরেন কলেজ ইউনিয়নের প্রাক্তন সম্পাদক, ছেলেদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। তার গ্রেপ্তারকে উপলক্ষ্য করে আমরা ছাত্রদের আবেগ-উদ্দীপ্ত করে তুলি। যে কয়েকজন ছাত্র ক্লাসে যোগ দিয়েছিল তারাও বেরিয়ে আসে। আমাদের

অনুরোধে মুসলিম ছাত্ররাও সেদিন ক্লাস বর্জন করে। তারা জানায় যে, আমরা যদি অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিতে রাজী হই তাহলে তারা ছাত্র সংহতির প্রতীক হিসাবে দু'দিনের জন্য ক্লাসে যোগদান থেকে বিরত থাকবে। একদিক হতে প্রস্তাবটি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেই মুসলিম অধ্যাপকটি সমানে বিদ্বেষ প্রচার করে চলেছেন। পুলিস ডাকার জন্য প্রিন্সিপ্যালকে অনেকটা বাধ্য করেন সেই একই ব্যক্তি। তাঁর প্রভাবকে উপেক্ষা করে মুসলিম ছেলেরা সহযোগিতার হস্ত যতটুকু প্রসারিত করেছে তার মূল্যও ত কম নয়। কিন্তু প্রস্তাব মেনে নেওয়াও সম্ভব হয় না। তার মানে হার স্বীকার করা। ফলে সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যায়, বরং আরো জটিল হয়ে ওঠে। পুলিসী হামলার পরেও আন্দোলন থামে নি দেখে কলেজ কর্তৃপক্ষ জনপাঁচেকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আমাদের উপরে কলেজ থেকে বহিষ্কারের নোটিশ দেওয়া হয়। আমি আর নির্মল সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে নোটিশ পাই। অরবিন্দ ঘোষ পিকেটিং করার সময় একজন খয়ের খাঁ অধ্যাপকের নজরে পড়েছিল। আর দুজনের নাম মনে নেই। কলেজ থেকে বহিষ্কারের সঙ্গে আমি আর নির্মল হোস্টেল ত্যাগের নোটিশ পাই। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্তব্যের খাতিরে নোটিশ দিতে বাধ্য হলেও অত্যন্ত সঙ্কোচের সাথে সে কথা জানিয়ে বলেন: "তোমরা বাইরে কোথাও যেয়ে থাকো। তোমাদের খাবারটা টিফিন কেরিয়ারে করে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।"

সেদিন রাতটা তিনি হোস্টেলে থেকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন বেশ খানিকটা ঝুঁকি মাথায় নিয়ে। এদিকে আমরা হোস্টেল থেকে বিতাড়িত হয়ে আইন অমান্য সমিতির অফিসে আশ্রয় নিয়েছি ধারণায় শেষরাতে পুলিস সেখানে হানা দেয়। কিন্তু তাদের ফিরে যেতে হল ব্যর্থ মনোরথে। প্রশ্ন ওঠে আমরা এখন কি করব? আমার ও নির্মলের ইচ্ছা যে, সুরেনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ অর্থাৎ কারাবরণ করি। হিমাদ্রি তাতে আপত্তি জানায়। তার মতে এটা হবে সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া। আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিই যে, সত্যাগ্রহ আন্দোলনে আত্মগোপনের নিয়ম নেই। তাছাড়া যে যুক্তিতে আমাকে গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলতে বলা হচ্ছে ঠিক সেই যুক্তিতেই বলতে হয় যে, এতে ছাত্রদের মনোবল ভেঙ্গে পড়বে। আমাকে সামনে না দেখলে নিন্দুকেরা প্রচার করবে আমি ভয়ে পালিয়ে গিয়েছি। প্রশ্নের মীমাংসা করে দিলেন

টুনুদা। পুলিসের নজর এড়িয়ে চলব অথচ ছাত্রদের চোখের সামনে উপস্থিত থাকব—কিভাবে তা সম্ভব হবে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন: "বিপ্লবী আন্দোলনের ফেরারীদের জন্য পুলিস যেভাবে খোঁজাখুজি করে এক্ষেত্রে খুব সম্ভবত তা করবে না। সুতরাং আপনি রাতটা আর দিনের বেলা কোথায় কাটাবেন তার ব্যবস্থা আমরা করছি। সন্ধ্যাবেলায় ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হবেন।" তাঁর কথায় তখনকার মত নিরাপদ আশ্রয়ে যাই। সন্ধ্যায় হোস্টেল-গুলি পরিক্রমা করি। সারাদিন আমাকে সামনে না দেখে নিন্দুকেরা যে গুঞ্জন তুলেছিল তা নিমেষে থেমে যায়। বন্ধুরা উল্লসিত হয়ে উঠে। সাধারণ ছাত্রেরাও এই ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানায়। হিমাদ্রির সঙ্গে দেখা হতে জানতে পাই যে, পিকেটিং অব্যাহত রাখার জন্য মেয়েরা এগিয়ে এসেছে। মীরা মৈত্র, হেনা ভট্টাচার্য, শমিতা এবং আরো কয়েকটি মেয়ে। শমিতার নাম উল্লেখের সময় হিমাদ্রির সুন্দর মুখমণ্ডলে রক্তিমাভা লক্ষ্য করি।

এইভাবেই আমার আত্মগোপন করে চলার হাতেখড়ি হয়। আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয় পার্টির বিশ্বস্ত সমর্থকদের বাসায়। গত কয়েকমাসে প্রায় প্রত্যেক সভাতে অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা করে শহরে সবার কাছে অত্যন্ত পরিচিত হয়ে গিয়েছি। যে পাড়াতেই যাই—মেয়েপুরুষ সবাই চেয়ে দেখে। তবে ঠিক কোন আস্তানায় রাত কাটাবো তার হদিশ যাতে অন্য কেউ না পায় সেজন্য সঙ্গীরা সতর্কতা অবলম্বন করে।

বিপ্লবী সংগঠনের কঠোর শৃঙ্খলার একটি নতুন দিকের পরিচয় পাই। টুনুদা বা অম্বিকাবাবুর অনুমতি ছাড়া গৃহকর্তা অন্য কাউকে আমার বাসস্থানের খবর দেবে না। হিমাদ্রি বা নির্মলকে ডেকে দিতে বলেও দেবে না। অথচ তাদের সঙ্গে কত জরুরী পরামর্শের প্রয়োজন হয়। টুনুদাকে একথা জানাতে তিনি বলেন: "ওদের ত গোপন আশ্রয়ের নিয়ম কড়াকড়ি ভাবে মেনে চলতে শেখানো হয়েছে। যদি আপনার বেলায় ব্যতিক্রম করি তবে ভবিষ্যতে হয়ত শৈথিল্যটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াবে। আপনি বরং সুবিধামত একটা জায়গা ও সময় ঠিক করে নিন যেখানে রোজ রাত্রে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।" অগত্যা সেই ব্যবস্থাই করতে হয়।

পিকেটিংয়ের ব্যবস্থার দায়িত্ব এখন হিমাদ্রির উপরে। তার কাছে প্রতিদিনের বিস্তৃত বিবরণ শুনি। কথায় কথায় কোনদিন শমিতার প্রসঙ্গ

এসে পড়ে। নির্মল যেদিন অনুপস্থিত থাকে সেদিন হিমাদ্রি অসঙ্কোচে মনের কপাট উন্মুক্ত করে ধরে। প্রাদেশিক সম্মেলনের পর তার ও শমিতার এই প্রথম সাক্ষাৎ। আবার পরস্পরের কাছে আসার সুযোগ লাভে দুজনেরই মন খুশীতে ঝলমল করে উঠেছে। মুখের কথায় প্রকাশ না করলেও চোখের ভাষায় একে অন্যের অন্তরের সন্ধান পায়। দেখা হয় অনেক লোকের মধ্যে। বাক্য বিনিময় যেটুকু হয় তা নিভাস্ত কাজের প্রসঙ্গে। তবু হিমাদ্রি উপলব্ধি করে যে, এইটুকুতেই যেন তার পাওয়ার পাত্র ভরে ওঠে। তার সঙ্গে চোখের মিলন ঘটলে শমিতার মুখের উপরেও সলজ্জ আনন্দের রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়ে। হিমাদ্রি ভাবে অপরূপ সুন্দর সেই ছবিখানি।

আমি বলি : "তোমার স্বপনচারিণীকে কর্মসঙ্গিনী রূপে পেয়েছো, সে ত আনন্দের বিষয়। কিন্তু ক'দিনের জন্য? যখন কর্মের স্রোত তোমাদের দুজনকে দুদিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তখন কি হবে?" হিমাদ্রি সেই পুরানো উত্তরের পুনরাবৃত্তি করে : "যেটুকু পেয়েছি তাই আমার মানসলোকে ধ্রুবতারার মতই চির উজ্জ্বল হয়ে রইবে।"

ক্রমে প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটে ভাঁটার টান ধরে। মফঃস্বলের প্রায় সব কলেজেই পুরোদমে ক্লাস শুরু হয়েছে। কলকাতারও দু-একটি কলেজে ধর্মঘটের অবসান হয়েছে শুনে এখানে একদল ছাত্র ক্লাসে যোগদানের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। নিউ হোস্টেলের থার্ড ব্লকের ছেলেরা এই ব্যাপারে অগ্রণী। আর থার্ড ব্লকের ছেলেদের পুরোভাগে রয়েছে আমারই অন্যতম বন্ধু রজনী। সে বহু ছাত্রের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে সংগ্রাম পরিষদের কাছে দাবি জানায় যে, ধর্মঘট অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নেওয়া হোক। আমরাও বুঝি আর বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যাবে না। সেই অবস্থায় যদি সংগঠিতভাবে সম্মানজনক শর্তে প্রত্যাহার করা সম্ভব হয় তাহলে মান বজায় থাকে। কিন্তু কি ভাবে তা করা যাবে? কলেজ কর্তৃপক্ষের এবং আমাদের ভিতরে মধ্যস্থতা করবেই বা কে? একটা উপায় উদ্ভাবনের জন্য কিছুটা সময় ত প্রয়োজন!

আমার প্রস্তাব অনুসারে সংগ্রাম পরিষদ রজনীদের চিঠির উত্তরে জানায় অচিরে সাধারণ সভা ডাকা হবে। যা কিছু সিদ্ধান্ত নিই তা নিতে হবে সেখানে। এই উত্তরে রজনী খুব ক্ষিপ্ত হয়। তবে অন্য ছাত্রদের বোঝাতে পারি যে, এটাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি। ঘটনাচক্রে একদিন রাতে পথ চলতি অন্য একজন

প্রবীণ অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তিনি বলেন: "তোমাকে কি ভাবে পাওয়া যায় সেই কথাই ক-দিন ধরে ভাবছি। দেখা যখন হয়ে গেল তখন আমার বাসায় চল। জরুরী আলোচনা আছে।" পরক্ষণেই হেসে বলেন: "ভয় নেই। পুলিস ডেকে ধরিয়ে দেব না নিশ্চয়ই"।

তাঁর বাসায় নিয়ে যেয়ে অধ্যাপক ধর্মঘট প্রত্যাহারের প্রসঙ্গটিই উত্থাপন করেন। আমরা যদি আরো দুই এক মাস চালিয়ে যেতে পারি বলে মনে করি তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু পরিস্থিতি যদি অনুকূল না হয় সে ক্ষেত্রে সম্মানজনক মীমাংসার পক্ষে এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। প্রিন্সিপ্যালের ইচ্ছা নয় যে ছাত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক আরো তিক্ত হয়ে উঠুক। অথচ ধর্মঘট চলতে থাকলে তাঁকে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কতকগুলি অপ্রীতিকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং তিনিও মিটমাটের সূত্র সন্ধান করছেন।

অধ্যাপকের কথা শোনার পর আমাদের সমস্যাটা তাঁর সামনে তুলে ধরি। তিনি আমাকে বলেন, সোজাসুজি প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করতে। কেন না আমার সম্বন্ধে মিঃ উইলিয়ামস উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। আমি তাঁকে জানাই সেটা সম্ভব নয়। সংগ্রাম পরিষদের অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে কোন আলোচনা আমি করতে পারি না। তাছাড়া আমার নামে ত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে।

অধ্যাপক বলেন: "পুলিস যাতে পরোয়ানা তুলে নেয় সেজন্য প্রিন্সিপ্যাল চেষ্টা করতে রাজী হবেন বলেই আমার ধারণা।" শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে সংগ্রাম পরিষদের মতামত তাঁকে জানালে তিনি বে-সরকারীভাবে মিঃ উইলিয়ামসের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা বলতে পারেন। সংগ্রাম পরিষদের সম্মতি নিয়ে তাঁকে খবর দিই।

এদিকে ছাত্রদের প্রস্তাবিত সাধারণ সভা ডাকায় আর দেরি করা সম্ভব নয়। আমাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট তুলে নেওয়া হয়েছে কিনা সে সংবাদের জন্য অপেক্ষা না করেই দিন কয়েক পরে সভা ডাকি। সেখানে দেখি ছাত্রদের অধিকাংশের মনোভাব খুব হতাশাজনক নয়। তারা ধর্মঘটের অবসান চায় ঠিকই কিন্তু বিনা শর্তে বা যে কোন শর্তে নয়। বে-গতিক দেখে রজনীরা সুর নরম করতে বাধ্য হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তিনটি শর্ত—আমাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট এবং বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার আর ছাত্রদের কারুর বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তি-

মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার প্রতিশ্রুতি। ততদিনে জানা গেল পুলিস প্রিন্সিপ্যালের অনুরোধে ওয়ারেন্ট তুলে নিয়েছে। সাধারণ ছাত্রদের কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না বলেও তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমাদের পাঁচজনের বেলায় প্রস্তাব দিলেন যে, বহিষ্কারের আদেশ তুলে নেওয়া হবে, তবে আমাদের অন্য কলেজে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেবেন। এই ভাবেই শেষ পর্যন্ত মীমাংসা হল। সার্টিফিকেটে প্রিন্সিপ্যাল লিখে দিলেন যে, ছাত্র ধর্মঘটে নেতৃত্ব নেওয়ার জন্য তাকে এই কলেজ থেকে চলে যেতে বলা হয়েছে। নতুবা সাধারণ চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের সময় সহানুভূতি প্রকাশ করে বললেন: "আমার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব, করেছি।" তিনি আমার শুভ কামনা করেন। আমিও বলি: "ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ বা অভিযোগ নেই। শিক্ষক হিসাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করি। আমরা সংগ্রাম করছি দেশের মুক্তির জন্য বিদেশী শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়।"

এবার সামনে এসে হাজির হয় কয়েকটি ব্যক্তিগত সমস্যা। এখন কি করব? আমার ইচ্ছা রাজশাহীতে থেকে আইন অমান্য সমিতির সংগঠকরূপে কাজ করি। টুনুদা বলেন প্রথমে আমার সম্বন্ধে তিনি সেই ব্যবস্থার কথাই ভেবেছিলেন। কিন্তু তিনি অনুমান করছেন বটব্যালের গ্রুপ শীগগিরই সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম শুরু করে দেবে আর পুলিসও তার পূর্ণ সুযোগ নেবে। বিনা বিচারে আটক আইন ত আছেই। মিথ্যা অজুহাতে কোন মামলায় জড়িত করে ফেলাও বিচিত্র নয়। আমার উপর পুলিসের বিষদৃষ্টি ত রয়েছেই। একবার এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি বলে রাগ আরো বেশি। সুতরাং এখানে থেকে মিছিমিছি ধরা পড়ার চেয়ে কলকাতায় যেয়ে পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করে কোন দায়িত্বের ভার নেওয়াই হবে সঙ্গত। টুনুদার নির্দেশ মেনে নিই।

বিগত কয়েক বৎসরের অতি প্রিয় পরিচিত কর্মক্ষেত্র ছেড়ে যেতে বেদনাবোধ হলেও উপায় নেই। আমার সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন প্রকৃত পক্ষে রাজশাহীতে শুরু। বৃহত্তর জীবনের স্বাদও পেয়েছি এই কলেজে এসে। কত মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে এখানকার সব কিছুর সঙ্গে। আমি আর নির্মল চলে যাব, হিমাদ্রি এখানে থেকে যাবে। চলার পথে আর কোনদিন তাকে পাশে পাব কিনা তাই বা কে জানে! পিছনে পড়ে থাকবে পদ্মার উদ্দাম জলরাশি, কলেজের ছায়া-

ঢাকা বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, নিউ হোস্টেলের সেই একান্ত আপনার পরিবেশ। পিছনে পড়ে রইবে কত প্রিয় সঙ্গী, কত চেনা মুখ, কত প্রিয় স্মৃতি।

জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির দৌলতে অভিভাবকেরা সব খবর পেয়ে গিয়েছেন। কলেজ থেকে বিতাড়নের নোটিশ পেয়েছি জানার পর প্রথমটায় ত তাঁদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়েছিল। পরে আমার কার্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণ জেনে বাধ্য হয়েই অবস্থাটাকে মেনে নিয়েছেন। ভাইয়ের জন্য মনে গর্ববোধও আছে। আবার তাঁদের উপদেশ অমান্য করেছি বলে ক্রোধ এবং অসন্তোষ জমে উঠেছে। সবচেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট হন বড়দা। সামনে না পেয়ে চিঠির দ্বারাই ভর্ৎসনা এবং উপদেশ বর্ষণ করেন।

কলকাতার কলেজে পড়ব বলে মেজদার আশ্রয়ে এসেছি। আপাতত তিনিই হলেন অভিভাবক। যতদিন তাঁর অভিভারকত্বে থাকব ততদিন সামলে চলতে হবে। নতুবা আমার কাজের জন্য কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ দাবি করবে। কিন্তু যাঁর সকলের থেকে বেশি উদ্বিগ্ন হবার এবং অনুযোগ করার কথা সেই মা-র কাছে থেকে কোন তিরস্কার বা বাধাই এল না। ছেলের বিপদের আশঙ্কা এবং বিচ্ছেদের সম্ভাবনাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে বরং আশীর্বাদই জানালেন।

তারপরে দেখা দিল কলেজে ভর্তি হওয়ার সমস্যা। যে ধরনের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছি তাতে কলকাতার কোন কলেজে ভর্তি হওয়ার পথে অনেক বাধা। বিদ্যাসাগর কলেজ এবং সেদিনের রিপন কলেজের অধ্যক্ষ কিছুটা সহানুভূতিসম্পন্ন হলেও কয়েকটি শর্ত আরোপ করেন। হয় আমাকে নতুবা আমার অভিভাবককে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, কলেজের নিয়মশৃঙ্খলা মেনে ভাল ছেলে হয়ে চলব। নির্মলের কাছে শুনি তারও সেই অবস্থা। প্রতিশ্রুতি দিতে আমরা রাজী নই। শর্তাধীনে ভর্তি হওয়াকে অসম্মানজনক বিবেচনা করি। এই রকম একটা পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে ভেবে রাজশাহী কলেজের সেই প্রবীণ অধ্যাপকটি পরামর্শ দিয়েছিলেন: "যদি অন্য কোথাও ব্যবস্থা না হয় তাহলে বঙ্গবাসী কলেজে যেও। অধ্যক্ষ গিরীশ বসুর কাছে সরাসরি চলে যাবে। অসঙ্কোচে সব কথা বলবে। তিনি যদি কড়া জবাব দিয়ে বসেন সেটাকে তাঁর প্রকৃত মনোভাব বলে ভুল করবে না।"

সেদিন বঙ্গবাসী কলেজ ছিল রাজনৈতিক কারণে নির্যাতীত ছাত্র এবং

অধ্যাপকদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। শহীদ যতীন দাস ছিলেন এই কলেজেরই ছাত্র। শুনেছি আচার্য গিরীশ বসু ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা এবং ছাত্র-দরদী। তবে বাইরে একটা কঠিন গাম্ভীর্যের আবরণে নিজের স্নেহকোমল হৃদয়টিকে ঢেকে রাখতেন। আমি আর নির্মল সরাসরি তাঁর দরবারে হাজির হই। শুভ্রকেশ গম্ভীর আনন অধ্যক্ষের সামনে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। তবু সাহসে ভর করে বলি যে "স্যার! আর কোথাও আশ্রয় না পেয়ে আপনার কাছে আমাদের শেষ আপিল নিয়ে এসেছি।"

ট্রান্সফার সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে এক নজরে দেখে তিনি তেমনি গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলেন: "এতে যেসব কথা লেখা আছে তাতে আমি কি করে তোমাদের নিতে পারি?"

আমরা বলি: "তাহলে কি আমরা কোথাও স্থান পাব না?"

উত্তর পেলাম: "আমি অস্থায়ীভাবে ভর্তি করে নিচ্ছি। পরে সিনেটের অনুমোদন পেলে স্থায়ীভাবে করা হবে। এখন অফিসে যেয়ে টাকা জমা দাও।"

মনে যে প্রশ্ন জাগে তা প্রকাশের সাহস হয় না। অফিসে এসে হেডক্লার্কের কাছেই তা ব্যক্ত করি: "যদি সিনেটের অনুমোদন না পাওয়া যায় তাহলে কি হবে?" প্রবীণ হেডক্লার্ক হেসে বলেন: "গিরীশ বোস যখন বলেছেন কলেজে ভর্তি করে নিচ্ছি তখন জেনে রাখুন যে, সেটাই স্থায়ী সিদ্ধান্ত। সিনেটে তাঁর কথার বিরুদ্ধে কেউ কোন মতামত প্রকাশ করবে না।"

কলকাতাতেও তখন কলেজগুলিতে ধর্মঘটের অবসান হয়েছে। এ. বি. এস. এ. সরকার কর্তৃক বে-আইনী সংস্থা বলে ঘোষিত না হলেও সংগঠনের কর্মীদের উপর পুলিসী হামলা চলেছে। কর্মকর্তাদের অনেকে জেলে। অফিস প্রায়ই খানাতল্লাশী হয়। অবশেষে পুলিস তা বন্ধ করে দিয়েছে। ছাত্র-নেতারা যাঁরা বাইরে আছেন তাঁরা গোপনে মিলিত হয়ে আলোচনা করেন। এই পরিস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আর একটি কনভেনশন ডেকে ধর্মঘট প্রত্যাহার সম্ভব নয়। কলেজগুলির সামনে থেকে পিকেটিং তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা ক্লাসে যোগ দিই বটে, তবে ভাঙ্গা মন নিয়ে। আমার আর নির্মলের দুজনেরই অবস্থা অনেকটা ডাঙায় তোলা মাছের মতন ছিলাম। পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোকের সামনে দাঁড়িয়ে। এখানে অধ্যাপকদের কাছে

আমরা অচেনা, ছাত্রদের কাছেও তাই। রোল নম্বরের পরিচয়ই আমাদের পরিচয়। তার উপর বিগত মাস দুইয়ের বিরামহীন কর্মব্যস্ততার পর এই নিষ্ক্রিয় দিনগুলিকে বড় একঘেয়ে, ক্লান্তিকর বোধ হয়। অথচ উপায় নেই। বি. এ. পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত এইভাবেই কাটাতে হবে।

পরীক্ষা না দিলে বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কের ইতি। পার্টির নেতারাও নির্দেশ দিয়েছেন আপাতত কিছুদিন প্রকাশ্য রাজনীতি হতে দূরে সরে থাকতে। ক্রমে ক্রমে তাঁরা আমাদের উপর অন্য গুরুদায়িত্বভার দেবেন। অভিভাবকেরা ভাবেন বোধহয় আমাদের সুমতির উদয় হয়েছে। সুবোধ ছেলে হয়ে গিয়েছি। চেনাশোনা লোকদের মধ্যে মধ্যে কেউ কেউ ভুল বোঝে। তাদের ধারণা আমরা হুজুগে মেতেছিলাম, হুজুগ কেটে যেতে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছি। কেউ বা ইঙ্গিত করে আমরা জেলের ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছি। সব মন্তব্য, ইঙ্গিত মুখ বুজেই শুনে যাই।

নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। অস্থায়ী সম্পাদক সুধাংশু বোসের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল। তিনি অনুশীলনের কর্মী। সুধাংশুবাবুর মারফতে যোগাযোগ হয় অমর রায়ের সঙ্গে। অমর বাবুকে অনুশীলনের পক্ষ থেকে ছাত্র সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ছাত্র সমিতির অফিস পুলিসের হাতে। তাই মিলিত হওয়ার স্থান হয় কলেজ স্কোয়ারের পূর্ব দিকে গৌরাঙ্গ প্রেসের বাড়িতে নতুবা স্কোয়ারের ভিতরে দক্ষিণ দিকের দেবদারু গাছগুলোর তলায়। যে সব ছাত্রনেতা জেলের ভিতরে ছিলেন, দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর মুক্তি পেয়ে তাঁরাও একে একে এসে এখানে মিলিত হন; শচীন মিত্র, অজিত দত্ত, অরুণাংশু দে, নারায়ণ লাহিড়ী, সুধীন মজুমদার প্রভৃতির সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় ঐ দেবদারু গাছের তলাকার আড্ডায়।

কলকাতার বুকে তখন আইন অমান্য আন্দোলনে ভাঁটার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে এক একটা উপলক্ষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কারাবরণ ছাড়া অন্য কোন কর্মসূচী নেই। আমরা এখানে আসার কিছুদিন পরে সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের আগমন উপলক্ষ্যে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে হাজার হাজার মানুষের মিছিল। হাওড়া স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু মিছিল যখন হ্যারিসন রোড (আজকের মহাত্মা গান্ধী রোড) ধরে কলেজ

স্কোয়ারের অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে তখন পুলিসের হিংস্র আক্রমণ শুরু হয়। দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য লাঠি চালনাকে উপেক্ষা করে জনতা কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত এগিয়ে আসে। তারপর বাধ্য হয় ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে।

এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে আশুতোষ বিল্ডিংয়ের উপর থেকে ছাত্রেরা "শেম শেম" ধ্বনি করে ওঠে। তাদের স্পর্ধায় ক্ষিপ্ত হয়ে লালমুখ গোরা সার্জেন্টরা ঐ বিল্ডিংয়ের উপর উঠে ছাত্রদের যাকে সামনে পায় নৃশংসভাবে মারপিট করে। কয়েকটি ছাত্রী সাহস করে বাধা দিতে এগিয়ে না গেলে ওখানেই দু-তিন-জন ছাত্রের প্রাণহানি ঘটত। প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ক্লাস সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। খবরটা ছড়িয়ে পড়তে না পড়তে সমস্ত কলেজগুলিতে হল স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট। উপাচার্য এসে গভর্নরকে পুলিসের আচরণের প্রতিবাদ জানালেন। গভর্নর দুঃখ প্রকাশ করে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, ভবিষ্যতে. আর কখনও উপাচার্যের বিনা অনুমতিতে পুলিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করবে না।

কিন্তু পুলিসী নির্যাতনের ঘটনা ত একটি নয়। জেলের ভিতরেও সত্যাগ্রহী বন্দীদের উপর চলেছে নিদারুণ লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন। জেল কর্তৃপক্ষ বন্দীদের শুধু শারীরিক কষ্ট দিয়েই ক্ষান্ত নয়, তাদের আত্মমর্যাদাবোধকে প্রতিপদে অপমান করে মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে চায়। এই পরিস্থিতিতে অনেকের মুখেই শুনি একটি প্রশ্ন "বিপ্লবীরা কোথায়? তারা নির্মম অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে না?"

দেশবাসীর ধূমায়িত বিক্ষোভকে সংগঠিত রূপদানের উপযোগী কোন কর্মসূচী যদি সামনে থাকত তাহলে সম্ভবত প্রশ্নটি এভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠত না। দুই একটি ছোট বিপ্লবী দল দেশের মানুষের মনের জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়ার জন্যই যেন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আরম্ভ করে দেয়। ডালহাউসী স্কোয়ারে পুলিস কমিশনার মিঃ টেগার্টের উপর বোমা নিক্ষেপের সংবাদে সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। লোকের মনে যুগপৎ ক্ষোভ এবং উত্তেজনার সঞ্চার হয়। ক্ষোভ ঐ চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার দরুন, আর উত্তেজনা এই ভরসায় যে, গভর্নমেন্টের দমন-নীতির উত্তর দেওয়ার মত শক্তির অস্তিত্ব এখনও আছে।

ঢাকায় পুলিসের ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যানকে এবং কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কারাবিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেলকে হত্যা বিরাট চাঞ্চল্য

সৃষ্টি করে। অন্যদিকে সরকারের পক্ষ থেকে সংগঠিত হয় সুপারিকল্পিত পাল্টা সন্ত্রাস অভিযান। ধরপাকড় এবং খানাতল্লাশের হিড়িক পড়ে যায়। রোজ সকালে উঠে দেখা যায় কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে কোন মেস বোর্ডিং বা ছাত্রাবাস লালপাগড়ীতে ঘেরাও করে রেখেছে।

বড়দিনের সময় ভাইসরয়ের কলকাতা আগমনের পূর্বে, সপ্তাহ দুই আগে থেকে পুলিস ছাত্রাবাস এবং বিপ্লবীদের আড্ডা বলে সন্দেহভাজন স্থানগুলিকে বেড়াজাল ফেলে ছেঁকে নেয়। বিনা বিচারে আটক আইন নির্বিচারে প্রযুক্ত হচ্ছে। কোন বিপ্লবী দলের কর্মীকেই রেহাই দেওয়া হচ্ছে না। অনুশীলনের যেসব নেতৃস্থানীয় কর্মী এতদিন আত্মগোপন করে সমিতির হাল ধরেছিলেন তাঁরা একের পর এক পুলিসের কবলে পতিত হচ্ছেন। প্রথম সারির নেতাদের কেউ বাইরে নেই। সমস্ত জেলগুলি রাজনৈতিক বন্দীতে ভরে উঠেছে। তাছাড়া সত্যাগ্রহী বন্দীদের জন্য স্থাপিত হয়েছে কয়েকটি বিশেষ জেল আর বিপ্লবীদের জন্য বন্দিশিবির। চার দেয়ালের বাইরে গোটা দেশটাও পরিণত হয়েছে বৃহত্তর কারাগারে।

ঠিক ঐ সময়টিতে কলকাতার একটি রঙ্গমঞ্চে মাসের পর মাস ধরে চলেছিল মন্মথ রায়ের "কারাগার" নাটকের অভিনয়। নাটকটি হয়ে দাঁড়ায় দেশবাসীর মর্মবেদনা এবং স্বাধীনতার কামনার জীবন্ত জাগ্রত প্রতীক। কংসের নিষ্ঠুর উৎপীড়নে অতিষ্ঠ যাদবকুল ব্রিটিশের অত্যাচারে নিস্পিষ্ট ভারতবাসীরই প্রতিচ্ছবি। যাদবদের কণ্ঠে ভাষা পায় ভারতের অগণিত মানুষেরই প্রার্থনা "অনাগত দেবতা জাগো"। তাদেরই অন্তরের অনুভূতি রূপ পায় গানের সুরে—

"বন্দীর মন্দিরে জাগো দেবতা।
ভাঙো পাষাণ কারার নীরবতা।"

পরীক্ষার তিনচার মাস বাকী আছে। তারপর? আমার এবং নির্মলের উপর সমিতি থেকে এখনও কোন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। সুরেন দাশগুপ্ত ইতিমধ্যে কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষে মুক্ত হয়ে কলকাতায় এসেছে। নেতারা তাকে প্রকাশ্য রাজনীতি থেকে একেবারে সরিয়ে এনে মধ্য কলকাতার গোপন সংগঠনের ভার দিয়েছেন আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে তারই সঙ্গে। সুরেনের অভিজ্ঞতা আমাদের মনে বেশ খানিকটা হতাশা

সৃষ্টি করে। সে বলে: "রাজশাহীতে আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে এসেছি এখানে সেই অনুযায়ী চলতে গেলে প্রতিপদে সংঘাত বাধে। পার্টির কর্মীদের মধ্যে রোম্যান্টিক উন্মাদনাটাই প্রধান। তারা চায় পার্টি আর কালবিলম্ব না করে কিছু একটা শুরু করে দিক। গণবিপ্লব, শ্রমিক-কৃষক, সাম্যবাদ—এসব কথা শোনার মতন ধৈর্যও তাদের নেই।"

ঐসব অসহিষ্ণু তরুণ কর্মীদের মনে একটি প্রশ্নই অন্য সব চিন্তাভাবনাকে ছাপিয়ে উঠেছে। ছোট ছোট দলগুলি যাহোক একটা কিছু করে দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও মনোযোগ আকর্ষণ করছে। আর আমরা কি কিছু না করেই ধরা পড়ে যাব? তারা বলে: "ইংরেজ বা দেশীয় সরকারী কর্মচারীদের হত্যা করেই স্বাধীনতা আসবে না জানি। কিন্তু নিরস্ত্র দেশবাসীর উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। সুতরাং আমরাই বা কাজের এই অঙ্গটিকে একেবারে বর্জন করব কেন?" বেশ বুঝি যে, দলের নেতৃত্ব এখনও যদি কোন কর্মপন্থা নির্দেশ না করেন তাহলে কর্মীরা স্থানীয় ভিত্তিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাসবাদী কাজে জড়িয়ে পড়বে।

রাজশাহীতে বটব্যালদের অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে ডাক লুটের ব্যর্থ প্রচেষ্টায়। ঐ সময়টাতে আশু কাহিলী ছিলেন সমিতির সর্বোচ্চ দায়িত্বে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আমাদের প্রশ্নগুলি নতুনভাবে উত্থাপন করি। তিনি বলেন সমিতির প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে অন্যতম কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হওয়ার দরুন বন্দীশিবির থেকে মুক্তিলাভ করে স্বগ্রামে অন্তরীণ হয়ে আছেন। শীগগিরই তিনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শের অজুহাতে কলকাতায় আসবেন। কেদারদা এলে তাঁর কাছেই আমরা নির্দেশ পাবো। তাই আপাতত প্রশ্নগুলি মুলতুবী রেখে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। অগত্যা পরীক্ষার প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করি।

কলকাতায় আসার পর ডঃ ভূপেন দত্তের সঙ্গে আবার যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। তিনি বলেন: "সামনে পরীক্ষা। যাতে ভাল ফল করতে পার এখন কিছুদিনের মত সেইদিকে মন দাও। জেনে রেখো, এটাই শেষ সংগ্রাম নয়। সুদীর্ঘকাল ধরে নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। ভবিষ্যৎ জীবনে যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পার তার প্রস্তুতিও সেই সংগ্রামের অঙ্গ।" জীবনটাকে তখন রঙীন চশমা দিয়ে দেখছি। সুতরাং ডঃ দত্তের কথাগুলির

তাৎপর্য পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারিনি। তবু পরীক্ষা যখন আসন্ন এবং তা দিতেই হবে—দু-তিন মাসের মত পড়াশুনার মধ্যে ডুবে যাই।

সেজন্যও কম অসুবিধার মোকাবিলা করতে হয় নি। ইংরেজীতে অনার্স নিয়েছি। অথচ প্রায় বছর দেড়েক হল পাঠ্য পুস্তকের দিকে মন দিতে পারিনি। এখন দুই তিন মাসে সেই কাজটি সম্পূর্ণ করতে হবে। সময় সংক্ষিপ্ত। বইয়েরও অভাব। বঙ্গবাসী কলেজ রাজনৈতিক কারণে নির্যাতীত ছাত্রদের আশ্রয়স্থল হলে কি হবে। অন্য সব দিকে সুবিধার অভাব। লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় বই বিশেষ পাওয়া যায় না। পাঠাগারের পরিসর এত সঙ্কীর্ণ যে, অল্প কয়েকজন বসলেই স্থানাভাব হয়। অধ্যয়নের জন্য যে নিরিবিলি পরিবেশ চাই তা আশা করাই বৃথা।

এই সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ পেলাম কয়েকজন অধ্যাপকের সস্নেহ সহযোগিতায়। রাজশাহী কলেজের সেই প্রবীণ অধ্যাপক বদলী হয়ে এসেছেন সংস্কৃত কলেজে। তিনি নানা জায়গা থেকে বই সংগ্রহ করে দিলেন। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতার জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর যেদিন তিনি কলেজে যোগদান করেন সেইদিনই অনার্স ক্লাসে নতুন দুটি মুখ দেখে আমার ও নির্মলের পরিচয় খুঁটিয়ে জেনে নিলেন। আমরা রাজনৈতিক কারণে নির্যাতীত শুনে কাছে টেনে নিলেন পরম স্নেহভরে। সমস্ত বিবরণ শুনে সহপাঠিরাও বিস্মিত। এতদিন আমরা বহু ছাত্রের মুখের ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম। এখন আবার এসে দাঁড়াই সকলের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে। ক্রমে অধ্যাপক বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। পরীক্ষার প্রস্তুতিতে নানাভাবে তাঁর কাছে সাহায্য লাভ করি।

এদিকে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার সম্পর্কে গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তদানীন্তন ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি লর্ড আরউইন নিজে উদ্যোগী হয়ে একটা সম্মানজনক মীমাংসার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে আহ্বান করে-ছিলেন। বেশ কিছুদিন আলোচনা চলার পর কয়েকটি শর্তাধীনে সাময়িক-ভাবে সত্যাগ্রহের কর্মসূচী প্রত্যাহৃত হল। কিন্তু এই চুক্তি তরুণদের মনে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব ও মর্যাদাকে প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। যে 'উলজ

ফকীরকে রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত করা হয়েছিল তাঁকেই ভাইসরয়ের প্রাসাদে আমন্ত্রণ করে এক টেবিলে বসে আলোচনা এবং সমান মর্যাদার সঙ্গে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়েছে।

আইন অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিত বন্দীরা দলে দলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই মুক্তিলাভ করছেন। মুক্ত বন্দীরা দেশের মানুষের চোখে যুদ্ধ ফেরত সৈনিকের অনুরূপ শ্রদ্ধা ও বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। একদিক থেকে আন্দোলনের পক্ষে মস্ত বড় সাফল্যলাভ হয়েছে বৈকি! কিন্তু বিজয়ের গৌরব ম্লান হয়ে যায় কয়েকটি কারণে। আন্দোলন স্থগিত করার পূর্বশর্ত হিসাবে দেশের মানুষ যে যে দাবি তুলেছিল তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি পূরণ হয় নি। এমনকি মহাত্মাজী সেগুলিকে পূর্বশর্ত হিসাবে উত্থাপন করতেও সম্মত হন নি। বন্দীমুক্তির নীতি প্রযোজ্য হবে শুধু অহিংস আন্দোলনে দণ্ডিত-দের সম্বন্ধে।

তথাকথিত হিংসাত্মক অপরাধে দণ্ডিত বা বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নকে গান্ধীজী এড়িয়ে গিয়েছেন। ঠাকুর চন্দ্রসিংয়ের নেতৃত্বে যে গাড়োয়ালী সৈনিকেরা নিরস্ত্র জনতার উপর গুলী চালাতে অস্বীকার ক'রে দেশবাসীর অভিনন্দন লাভ করেছেন তাঁদের দণ্ডমকুবের দাবিও উত্থাপিত হয় নি। জনতার উপর পুলিসী অত্যাচারের সম্বন্ধে তদন্তের দাবি প্রথমে তোলা হলেও পরে সেটিকে পূর্বশর্তের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেব লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে রয়েছেন। আমরা আশা করেছিলাম যে, অন্ততঃ তাঁদের প্রাণদণ্ড মকুবের জন্য গান্ধীজী ভাইসরয়ের উপর চাপ দেবেন। কিন্তু হতাশ হয়েছি এই দেখে যে, তিনি হিংসা বনাম অহিংসার চুলচেরা তর্ক তুলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

স্বাধীনতার এইসব বীর সেনানীদের কারাগারে রেখে বিজয়ের উৎসব আমাদের চোখে অর্থহীন বলে প্রতিভাত হয়েছে। ভগৎ সিং এবং তাঁর সঙ্গীরা তখন দেশের নয়নের মণিতে পরিণত। তাঁদের আলেখ্য জাতীয় নেতাদের সঙ্গে এক সারিতে ঘরে ঘরে শোভা পায়। আন্দোলনের এত শক্তি সত্ত্বেও ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট তাঁদের ফাঁসীকাঠে ঝোলাবে এ চিন্তা অসহ্য। তাঁদের প্রাণদণ্ডাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে আ-সমুদ্র হিমাচল মুখর হয়ে ওঠে। তরুণ

সমাজের প্রচণ্ড বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে চুক্তির সমর্থক নেতারা বলেন : "ঐ দাবিকে পূর্বশর্ত করা না হলেও এখন গান্ধীজী সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।"

গান্ধীজী ভাইসরয়ের নিকট আবেদন করেন বলে আমরা শুনতে পাই। আমাদের মনে ক্ষীণ আশা জাগ্রত হয়। কিন্তু ধূর্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট হঠাৎ এক গভীর রাত্রে অত্যন্ত সঙ্গোপনে বীর যোদ্ধাদের ফাঁসী কাঠে ঝুলিয়ে দেয়। তাঁদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করে সেই রাত্রেই লাহোর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে শতদ্রু নদীর তীরে, যাতে পূর্বাহ্নে কেউ টের না পায়। পরের দিন সংবাদপত্রে সেই খবর পড়ে সারা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। কিন্তু যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। বিক্ষুব্ধ তরুণদের শান্ত করার জন্য চুক্তির সমর্থক নেতারা বোঝাতে চান যে "এটা ত truce অর্থাৎ সাময়িক যুদ্ধবিরতি মাত্র। সংগ্রাম স্থগিত রাখা হয়েছে, প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় নি। আমরা গভর্ণমেন্টের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় এক ধাপ অগ্রসর হয়েছি। এই অবকাশটিকে আগামী পর্যায়ের প্রস্তুতির জন্য কাজে লাগাতে হবে।

ইতিমধ্যে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে বাংলার গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। তাঁকে বকসা শিবিরে বন্দী নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুবিধাও দেওয়া হয়েছিল। ক্ষণিকের জন্য ভেবেছিলাম হয়ত বিপ্লবী দলগুলির নেতারা বাইরে আসার সুযোগ পাবেন। ভগৎ সিং-দের ফাঁসীর পরে উপলব্ধি করি যে, সে আশা নেহাৎ মরীচিকা মাত্র। হলও তাই শেষ পর্যন্ত। গভর্ণরের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। বামপন্থী নেতারা বললেন : "লর্ড আরউইন যে কংগ্রেসের সঙ্গে মীমাংসায় উদ্যোগী হয়েছিলেন সেটা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দুর্বলতারই প্রমাণ। ভারতে ব্রিটিশ শাসন এক অভাবনীয় সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল। তার পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য কিছুটা সময় লাভ করা। এখন গভর্ণমেন্ট সেই লক্ষ্য নিয়েই অগ্রসর হবে।" মোটের উপর কর্মীরা প্রায় সবাই উপলব্ধি করছে যে, আবার সংগ্রাম অনিবার্য।

এমনি পটভূমিতে কেদারদার সাথে বহু প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি যে বাসাটিতে আছেন তার সামনে গোয়েন্দা পুলিসের সতর্ক পাহারা। তাঁর কাছে পৌঁছাতে আমাদের নানা কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। তিনি জানালেন যে,

বক্সার বন্দিশিবিরে বসে বিস্তৃত আলোচনার পর বিদ্রোহী গ্রুপের সঙ্গে দাদাদের একটা মিটমাট হয়ে গিয়েছে।

দলের পক্ষ থেকে জঙ্গী কার্যকলাপের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। সেই কর্মপন্থা সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা না করলেও এটুকু আভাস পাই যে, যা কিছু করা হবে তা বড় আকারেই করা হবে। যাতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে একটা বড় রকমের আঘাত দেওয়া যায়। বিদ্রোহী গ্রুপ সেই ভিত্তিতে পার্টির ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সম্মত হয়েছে। বিভিন্ন বন্দিশিবির থেকে সুড়ঙ্গপথে তাদের কর্মীদের নিকটে নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে মূল সংগঠনের নেতৃত্বাধীনে কাজ করতে। স্থির হয়েছে প্রভাত চক্রবর্তী গ্রামের অন্তরীণ থেকে পালিয়ে এসে আত্মগোপন করে সংগঠনের দায়িত্ব নেবেন। তিনি ছিলেন বিদ্রোহী গ্রুপের প্রথম সারির নেতা। তাঁকে দলের কর্ণধার নির্বাচনের ফলে দলের নব-প্রতিষ্ঠিত ঐক্যের শক্তিবৃদ্ধি হবে। সমিতির ভিতরে যে নানা ধরনের রাজনৈতিক চিন্তা মাথা তুলেছিল সেগুলির মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টাও হয়েছে বুঝতে পারি। কেদারদা জানালেন নেতারা সমাজতন্ত্রবাদকে লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করেছেন। শুধু বিদেশী শাসনের অবসান নয়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমাদের কাম্য। জনগণের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তি-সাধনের জন্য ধনতন্ত্রের অবসান ঘটাতে হবে।

জনসাধারণের অর্থনৈতিক সংগ্রামকেও জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের অঙ্গীভূত করতে হবে। তবে আশু কর্মসূচী হিসাবে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের উপর জোর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ এখন গভর্নমেণ্টকে একটা চূড়ান্ত আঘাত দেওয়ার প্রশ্নটিই এই মুহূর্তে সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। সমস্ত প্রচেষ্টা সংহত করতে হবে সেই কাজে। এদিকটা গুছিয়ে নেওয়ার পর জঙ্গী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে গণসংগঠনের বিভাগ খোলা হবে। তার কর্মীরা শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে কাজে আত্মনিয়োগ করবে। কেদারদার কথা থেকে বুঝতে পারি যে, গণবিপ্লবের ধারণাকে আরো স্পষ্ট করা হয়েছে বটে কিন্তু আপাত কর্মসূচীরূপে গ্রহণ করা হয়েছে সেই গণসংস্রবহীন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাকে। দেখা করতে গিয়েছিলাম আমি আর সুরেন। আমরা বলি: "কয়েক মাসের মধ্যে আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবে নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছে। যদি এখন থেকে প্রস্তুতি শুরু করি তাহলে হয়ত সেই আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে আমরা তাকে গণ-অভ্যুত্থানের রূপ দিতে সমর্থ হব"।

কেদারদা বললেন : "তোমরা যে ধরনের গণঅভ্যুত্থানের কথা ভাবছো তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দুই এক জায়গায় ঘটতে পারে। কিন্তু তাকে একটা ব্যাপক বিদ্রোহের রূপ দেওয়ার জন্য যে রকম সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি প্রয়োজন সে সময় কই? সংগঠনের এখন ভাঙা হাটের অবস্থা। সম্বলের দিক থেকেও ঐ ধরনের কিছু করার শক্তি আমাদের খুব সীমিত। অথচ এই অধ্যায়ে যদি আমরা অনুশীলনের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিল রেখে একটা বড় রকমের অ্যাকশন করে যেতে না পারি তাহলে ভবিষ্যতে দলের অস্তিত্ব থাকবে না। বিদ্রোহী গ্রুপের সঙ্গে যে বোঝা-পড়া হয়েছে তা ভেঙ্গে যাবে।"

দলের ঐক্য, দলের ঐতিহ্য, অস্তিত্ব এই সব কথার আবেদনকে উপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কেদারদার কথাই শেষ পর্যন্ত মেনে নিই। শেষ চেষ্টা হিসাবে বলি শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠনের জন্য যে বিভাগ খোলা হবে তার দায়িত্ব আমরা নিতে পারি।

কেদারদা বল্লেন : "তোমাদের সেকাজের জন্য ঠিক এই মুহূর্তে ছেড়ে দেওয়া যাবে কি না তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রভাত আসুক। সংগঠনকে আবার নতুনভাবে সঞ্জীবিত করে তুলতে তাকে তোমরা সাহায্য কর। তারপরে যদি সম্ভব হয় তাহলে তোমাদের দুইজনের একজনকে এদিককার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারি।" তাঁর কাছে শুনি পরীক্ষার পর হিমাদ্রিকে পাঠানো হবে উত্তর ভারতে। সে হিন্দুস্থান সোশিয়ালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করবে।

শুনে মনে মনে ভাবি হিমাদ্রির সেই ভবিষ্যদ্বাণীই অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে গেল। অতীতের জের টেনেই শেষ হবে এই অধ্যায়। নতুন পথের সূচনা করে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হল না।

পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর যাই ডঃ ভূপেন দত্তের সঙ্গে দেখা করতে। ৩নং গৌরমোহন দত্ত স্ট্রীটের সেই ঐতিহাসিক বাড়িটির তখন জীর্ণ দশা। রাস্তার উপর একটি প্রায় অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ডঃ দত্ত অভ্যাগতদের সঙ্গে বসে আলাপ করেন। ততদিনে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক অনেক সহজ হয়ে এসেছে। কথায় কথায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রসঙ্গ ওঠে। আমি তাঁকে জানাই তরুণদের মনে সরকারী অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার সঙ্কল্প কি রকম দুর্বার হয়ে উঠেছে। তিনি বল্লেন : "নিছক আবেগের জোরেই কোন দেশের বিপ্লব সম্ভব হয় নি।

রাশিয়াতে লেনিনের বড় ভাই জার আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করার চেষ্টার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। আলেকজাণ্ডারের দলের কর্মীরা লেনিনকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, তুমি কি ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে না? উত্তরে তিনি কি বলেছিলেন জান? তিনি বলেছিলেন যে, আমি এমন ধরনের প্রতিশোধ নেব যাতে শুধু একজন জার বা কয়েকজন সরকারী কর্মচারী নয়, গোটা জারতন্ত্রকেই শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলা সম্ভব হয়। তখন তাঁর বয়স তোমাদের চেয়ে বেশি ছিল না। কিন্তু তিনি ইতিহাসের বিকাশের ধারাকে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই ধৈর্য হারান নি।"

কথাটা আমার মনে গভীর সাড়া জাগায়। তবে ডঃ দত্তকে কিভাবে বলি যে, দলের শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের মুখ চেয়ে আমাকেও অসহিষ্ণু কর্মপন্থা মেনে নিতে হচ্ছে! অনুশীলনের সঙ্গে সংযোগের ব্যাপারটি তাঁর কাছে তখনও গোপন রেখেছি। তিনি বলেন: "পরীক্ষা ত দিলে। এম. এ. পড়বে নিশ্চয়ই। তাহলে আগামী বার যখন কলকাতায় আসবে তখন আমার সঙ্গে ভিড়ে পড়। শহরে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করবে। আমি গ্রামে কৃষকদের মধ্যে ঘোরার সময় আমার সাথী হবে। দেখবে এক নতুন জগতের দরজা খুলে গিয়েছে তোমার চোখের সামনে!" তাঁকে তৎক্ষণাৎ কোন প্রতিশ্রুতি দিই না। শুধু বলি: "ফিরে ত আসি।"

ডঃ দত্ত পরামর্শ দিলেন পরীক্ষার ফল বার হওয়ার আগে যে কয়েক মাস হাতে পাব সেই সময়টা যেন আমাদের অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কাজে লাগাই। এই প্রসঙ্গে তিনি আমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা আমার উত্তর জীবনে একটি অমূল্য পাথেয় হয়ে রয়েছে। তিনি বলেন যে, পার্বত্য অঞ্চলের জনসমষ্টি এবং হিমালয়ের পাদ-দেশে চা-বাগানে ও ক্ষেত-খামারে কাজ করে যে জনসমষ্টি তাদের জীবনটাকে যেন আমি গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করি। নিছক উপর উপর ভাবে না দেখে যেন সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অধ্যয়নের কাজে ব্রতী হই। এ সম্বন্ধে পরেও তাঁর সঙ্গে বহু আলাপ হয়েছে। জাতি-বিকাশের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভ করি এমনি সব আলোচনারই মাধ্যমে।

এবার শিলিগুড়িতে ফিরে কংগ্রেস এবং ছাত্র সমিতির মারফত প্রকাশ্যে কাজ শুরু করি। রাজশাহীতে ধর্মঘট পরিচালনার সংবাদ এই ছোট্ট শহরে বেশ

ভালভাবেই জানাজানি হয়েছে। অনেক অতিরঞ্জিত কাহিনীরও সৃষ্টি হয়েছে আমার সম্বন্ধে। ফলে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী এবং তরুণদের চোখে আমি একটা খুব উচ্চ আসন দখল করেছি। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর শহরের মান্যগণ্য ব্যক্তিদের দুই একজন কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। বড়দা তাঁদের অন্যতম। শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়েছে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কমিটি। অভিভাবকের দিক থেকে আগের মত বাধা আর নেই। তাছাড়া তাঁরা যতটুকু জানার জেনেই গিয়েছেন। এতে সুবিধাই হয়েছে। আমার আসল কার্যকলাপের জন্য ঘোরাফেরার একটা কৈফিয়ত পেয়ে গিয়েছি।

নিখিলবঙ্গ ছাত্র সমিতির তৃতীয় বার্ষিক প্রাদেশিক সম্মেলনে অন্যতম সহ-সভাপতি রূপে নির্বাচিত হয়েছি। সেই পদাধিকার বলে এখানে গড়ে তুলি ছাত্র সমিতির একটি শাখা সংগঠন। দার্জিলিং জেলায় তখন যতটুকু সামান্য রাজনৈতিক কাজকর্মের অস্তিত্ব আছে তার কর্মকেন্দ্র শিলিগুড়ি। সুতরাং ঐ সংগঠনটিকেই নাম দিই দার্জিলিং জেলা ছাত্র সমিতি। এমনিভাবে জননেতার মর্যাদা নিয়ে কাজ শুরু করি। বয়সে অনেক ছোট হলেও বয়োজ্যেষ্ঠরা আপনা থেকেই আমাকে সামনের সারিতে আসন ছেড়ে দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে সেনগুপ্ত-সমর্থক ও সুভাষ-সমর্থক—এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুটো পাল্টা বি. পি. সি. সি। খানিকটা আমার এবং খানিকটা পাশের জেলা জলপাইগুড়ির কংগ্রেস নেতাদের চেষ্টায় আমাদের কমিটি সেনগুপ্ত-সমর্থক বি. পি. সি. সির সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে।

প্রতিনিধি নির্বাচিত হই মঙ্গল সিং আর আমি। বড়দার অবশ্য ইচ্ছা নয় যে, আমি এইসব কাজে খুব বেশি জড়িয়ে পড়ি। অথচ বাধা দেওয়ার উপায় নেই। তাছাড়া প্রায়ই জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ভাইয়ের নাম ছাপা হচ্ছে। মফস্বল শহরের মানুষের চোখে সে গৌরব তুচ্ছ করার মত নয়। তরাইয়ের হাটেবন্দরে স্বাধীনতার বাণী প্রচারে মঙ্গল সিং আর ব্রজেনবাবুর সঙ্গী হই। কৃষকদের বস্তিতেও মাঝে মাঝে রাত্রিযাপন করি। মোহন ইতিমধ্যে কৃষকের ঘরের একটি ছেলেকে আমাদের গুপ্ত সমিতিতে টানতে পেরেছে। নাম গান্ধী সিং, রাজবংশী সম্প্রদায়ের কিছুটা অবস্থাপন্ন চাষীর ছেলে। স্কুলে সে আমার কয়েক ক্লাস নীচে পড়ত। হাসিখুশি বুদ্ধিদীপ্ত

চেহারার ছেলেটি। ঘরের বাঁধন কম, প্রকৃতিও খানিকটা বে-পরোয়া। এক স্কুলের ছাত্র হিসাবে আমরা পরস্পরকে আগে থেকেই চিনি। নতুন পরিচয়ে আমি যেন তার চোখে রূপকথার রাজপুত্রে পরিণত হয়ে যাই। এতদিন আমি সমিতির নেতাদের বীরপূজার অর্ঘ দিয়ে এসেছি। এখন নিজেই গান্ধী সিংয়ের মনে পূজার বেদীতে স্থানলাভ করি। সৌভাগ্যক্রমে তার বাবা ছিলেন আমার দাদার মক্কেল। সেই সূত্র ধরে মাঝে মাঝে গান্ধী সিংহের ঘরে রাত্রিযাপনে অসুবিধা হয় না। বে-আইনী বই মোহনের কাছে যেগুলি ছিল সে ইতিমধ্যেই পড়ে শেষ করে ফেলেছে। তাতে তার কৌতূহল তৃপ্ত হয় নি বরং আরো উদ্দীপ্ত হয়েছে। তার জানার আগ্রহ মিটাবার জন্য দাদাদের মুখে শোনা অগ্নিযুগের নানা কাহিনী বর্ণনা করি। বলি নানা দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস। কত রাত তাদের ঘরে বাঁশের মাচার উপরে বিছানো চাটাইয়ের উপর শুয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। কথার শেষে গান্ধী সিং গাঢ়নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে।

আমার চোখে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম নামে না। মানস নেত্রে যেন মায়ার অঞ্জন লেগেছে। গান্ধী সিংয়ের মনের পাপড়িগুলি আমার সামনে ধীরে ধীরে শতদল পদ্মের মত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে। নিশুতি রাতের বনমর্মর আর নদীর কুলুকুলু ধ্বনির সঙ্গে এই অভিজ্ঞতার অনুভূতি মিলে যেয়ে এক অপরূপ ঐক্যতানের জন্ম দেয়। অরণ্য বলয়িত প্রান্তরে, কলস্বনা গিরি-নদীর তীরে, মানুষ সমান উঁচু পাটক্ষেতের ধারের কুটিরটি যেন কোথায় হারিয়ে যায়। কল্পনার দৃষ্টিতে দেখি গান্ধী সিং নদী পার হয়ে, মাঠের সীমানা পেরিয়ে কত দূর এগিয়ে চলেছে। এক বৃহত্তর জীবনের স্বপ্নের ঘোর লেগেছে তার দৃষ্টিতে। না-বোঝা এক হাতছানির ডাকে পাগল হয়ে সে চলতে শুরু করেছে। আমার জীবনের পথচলাও ত আরম্ভ হয়েছিল এমনিভাবে।

একেবারে গরীব কৃষকের ঘরের দুটি ছেলেকেও সঙ্গে পাই। একজন চৈতন, অপর জন ভুঁইচালু। ভূমিকম্পের ক্ষণটিতে জন্ম হয়েছিল বলে তার বাপ-মা ঐ নাম রেখেছে। দুজনের কেউ লেখাপড়া শেখে নি। চৈতন কথা বলে অত্যন্ত কম। ভুঁইচালু ঠিক উল্টো। কি পেয়েছে তারা আমার কাছে তা আমিও ভাল করে বুঝতে পারি না। গণবিপ্লব সম্বন্ধে সেদিনের অস্পষ্ট ধারণাকে সম্বল করে কতটুকু সাড়া জাগাতে পেরেছিলাম তাদের মনে, সেকথা

আমার নিজের কাছে আজও স্পষ্ট নয়। তারাই বা কিসের প্রেরণায় এই পথে পা বাড়িয়েছে তা নিজেরাও হয়ত ভাল করে জানে না। তবু ত ঘন অন্ধকারের মধ্যে বসেও তারা আলোকের দিকে মুখ তুলে চেয়েছে। মহত্তর এক জীবনের স্বপ্নে বিভোর হয়েছে। হোক্ না কেন তা অস্পষ্ট, অব্যক্ত। আমারই হাত ধরে ওরা এগিয়ে এসেছে। এই ত পরম পুরস্কার। গান্ধী সিং আর ভুঁইচালু যেন আমার মানস সৃষ্টি! ভাস্কর যেমন কঠিন পাষাণ কেটে মূর্তি গড়ে তোলে তেমনিভাবে আমি ওদের গড়ে তুলব। পরক্ষণেই আবার ভাবি, কোন কাজে লাগাব তাদের? আমাকে ফিরে যেতে হবে কলকাতায়। দেশ-ব্যাপী সশস্ত্র "অ্যাকশনের" যে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে তাকে সার্থক করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এখানে থাকবে মোহন। তার রাজনৈতিক চেতনা এত উন্নত নয় যে, নিজের পায়ে দাড়িয়ে স্বীয় বুদ্ধিতে মেহনতী মানুষের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলবে। এক এক সময় অনুভব করি আমার মনের ভিতরটা যেন দুটো সম্পূর্ণ আলাদা কুঠুরিতে ভাগ হয়ে গিয়েছে।

মাস দুই তরাইয়ের গ্রামাঞ্চলে ঘুরে উপলব্ধি করেছি যে, এই পায়েরতলায় পড়া দুঃখী বোবা মানুষগুলির ঘুম ভাঙ্গানোর কাজেও বিরাট উন্মাদনার সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের কুটিরের বেড়া পেরিয়ে অন্তরের আঙ্গিনায় প্রবেশ করতে পারাটাও এক অনাবিষ্কৃত জগতের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। কিন্তু সেজন্য সুদীর্ঘ সময় চাই। ওদের জীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। হতে হবে দুঃখ-বেদনার অংশীদার। অথচ সময় ত আমার হাতে নেই। অ্যাকশনের পরিকল্পনায় যে উন্মাদনা রয়েছে সেটাই এই মুহূর্তে সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। কেদারদাকে যখন কথা দিয়েছিলাম তখন পার্টির প্রতি আনুগত্য বোধটাই ছিল তার মূলে প্রধান কারণ। তারপর ধীরে ধীরে নিজের অজানিতে রোম্যান্টিক স্বপ্নের জালে জড়িয়ে পড়েছি। ভেবেছি যে, বিপ্লবের মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে অংশ-গ্রহণের সুযোগ থেকে আমার জেলাই বা বঞ্চিত হবে কেন? এখানেও কি এমন কিছু করা যায় না যা দেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের পাতায় আগুনের অক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে?

দুই ধরনের কাজের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব নয়। এক কুঠুরি থেকে অন্যটিতে যাতায়াতের কোন রাস্তা নেই। অতএব অনাগতের অঙ্কুরের লালন-পালনের দায়িত্ব ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিয়ে অতীতের ঋণ শোধ করার দিকটাই প্রাধান্য

লাভ করে। পরামর্শ করার জন্য হিমাদ্রিকে চিঠি দিই। লিখি, "শুনেছি তুমি দূরে চলে যাবে। আর কোন দিন দেখা হবে কিনা জানি না। তাই একবার এই অঞ্চলটা ঘুরে যাও। পাহাড় দেখাও হয়ে যাবে।"

আমার ডাকে সাড়া দিয়ে সে কয়েকদিনের মধ্যে এসে হাজির হয়। মনের ভিতরে দুটি ঝোঁকের মধ্যে যে টানাপোড়েন চলেছে সে কথা তাকে খুলে বলি। সে বলে তারও একই অবস্থা। সেও নিজের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়ার পর দলের সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছে। একবার ভেবেছিল যে, উত্তর ভারতে বিশেষত পাঞ্জাবে গেলে হয়ত নিজের ইচ্ছানুরূপ ক্ষেত্র তৈরি করে নিতে পারবে। কিন্তু পরে বুঝেছে সে সম্ভাবনা নেই। আশু কর্মসূচীকে সফল করার কাজেই সমস্ত শক্তি ও মনোযোগ সংহত করতে হবে। পার্বত্য অঞ্চলে কোন অ্যাকশনের পরিকল্পনার যে অস্পষ্ট রূপরেখা আমার মস্তিষ্কে উঁকিঝুঁকি মারছিল সে সম্বন্ধে হিমাদ্রিকে আভাস দিই। যতটা সম্ভব বিশদভাবে ছকটাকে তৈরি করে জঙ্গী বিভাগের সামনে পেশ করতে হবে। সেজন্য সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এর আগে দার্জিলিং গিয়েছি ট্রেনে। হাঁটাপথে এসেছি বড় জোর রংটং স্টেশন পর্যন্ত। সেটুকু মোটেই যথেষ্ট নয়। তাই দার্জিলিং জেলার একটা নকশা-মানচিত্র সংগ্রহ করে হিমাদ্রিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। সবাইকে বলি আমরা দু-জন পদব্রজে দার্জিলিং যাব।

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পঞ্চাশ মাইল পথ। পায়ে হেঁটে পরিক্রমায় তার প্রায় প্রত্যেকটি মোড়, প্রতিটি 'চোরবাটো' এবং হিলকার্ট রোডের বিকল্প ঘোড়ায় চলার রাস্তাগুলি চেনা হয়ে যায়। ছোটবেলা থেকে হিমালয়কে কেন্দ্র করে অ্যাডভেঞ্চারের কত স্বপ্ন দেখেছি। হয়ত তারই সূচনা হচ্ছে এই ভাবে। এযাত্রা কোন বিপদের সম্মুখীন হতে না হলেও অভিজ্ঞতা কম অর্জন করি নি। পার্বত্য প্রকৃতিকে অন্তরঙ্গভাবে জেনেছি। তেমনি পাহাড়ের কঠোর পরিশ্রমী সরল মেহনতী মানুষদের জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় ঘটেছে।

হিমাদ্রি স্বস্থানে ফিরে যায়। সেখান থেকে শুরু হবে তার নিরুদ্দেশের যাত্রা। উত্তর ভারতে অনুশীলনের অভিজ্ঞ কর্মী সীতানাথ ব্রহ্মচারী সংগঠনের ভগ্নাবশেষগুলিকে জোড়া দিয়ে নতুনভাবে খাড়া করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছেন। হিমাদ্রি হবে তাঁর সহকর্মী।

এদিকে বি. এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। যতটা খারাপ হবে আশঙ্কা করেছিলাম তা হয় নি। ইংরেজীতে অনার্স পেয়েছি, স্থান সেকেণ্ড ক্লাসের উচু'র দিকেই আছে। বড়দা খুশি হয়ে বলেন, এম. এ. পড়তে হবে। সামনে যে দিন আসছে তাতে পড়াশুনা কতদূর হবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পরীক্ষা যে শেষ পর্যন্ত দিতে পারব তার নিশ্চয়তা আদৌ নেই। তবে কলকাতায় থাকার একটা অজুহাত চাই বলে বড়দার কথায় সম্মতি জানাই। কলকাতা এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হই। তারপর জড়িয়ে পড়ি সেই কর্মের আবর্তে। আমাদের পরিকল্পনাটার কথা যথাস্থানে পৌঁছে দিই।

সমিতি থেকে আমার উপরে দেওয়া হয় উত্তর কলকাতা সাংগঠনের দায়িত্ব। সকাল আর সন্ধ্যা কাটে সেই কাজে। দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস। বেশ রাত করে মেসে ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে তবে অধ্যয়নের অবসর পাই। পাঠ্যপুঁথি নয়, রাজনৈতিক বিশেষত সাম্যবাদী সাহিত্য।

সেই সময়টাতে বর্মণ পাবলিশিং হাউস সাম্যবাদের উপর কিছু কিছু বই বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশের কাজে হাত দিয়েছে। আরো দু-একটি ক্ষুদ্র প্রকাশন-সংস্থা সীমিত সম্বল নিয়ে এদিকে উদ্যোগী হয়েছে। আমার এক বন্ধু এমনি একটি সংস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। তিনি আমাকে অনুরোধ করেন বাংলায় লেনিনের জীবনী লিখে দিতে।

লেনিনের সম্বন্ধে প্রামাণ্য বই খুব সুলভ ছিল না। বহু সন্ধানের পর মিরস্কির লেখা 'লেনিন' বইটি হাতে পাই। তারই ভিত্তিতে লিখতে শুরু করি। কিন্তু বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দেখা গেল যে, প্রকাশক বন্ধু যা চেয়েছিলেন তা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। তিনি চেয়েছিলেন প্রচলিত অর্থে জীবনী অর্থাৎ লেনিনের জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী। আর আমি লিখেছি রুশ বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকা। মিরস্কির বইটিকে অবলম্বন করায় স্বভাবতই ব্যক্তির চেয়ে বিপ্লবের পটভূমিটাই অনেক বড় হয়ে উঠেছে। লেনিনের ব্যক্তিত্ব হয়েছে সেই বিপ্লবের ঘনীভূত রূপ। বন্ধুর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত মনোমালিন্য হ'ত কিনা জানি না। তার আগেই পুলিস তাঁকে আটক আইনে গ্রেপ্তার এবং প্রকাশন-সংস্থাটি বন্ধ করে দেয়। বর্মণ পাবলিশিং হাউসের মালিকও ততদিনে বিনা বিচারে বন্দী হয়েছেন। অগত্যা রচনাটিকে

পাঠাই ঢাকায় নলিনী কিশোর গুহর সম্পাদিত "বাংলার বাণী" পত্রিকায়, রাজশাহী থাকা কালেই ঐ পত্রিকার সঙ্গে আমার সংযোগ।

নলিনীবাবু যেভাবে কাঁচা হাতের লেখাকে সমাদরে "বাংলার বাণী"র পৃষ্ঠায় স্থান দিয়েছিলেন সেই ভরসায় এবারও তাঁর শরণাপন্ন হই। প্রায় এক বৎসর ধরে প্রতি সংখ্যায় লেখাটি প্রকাশিত হয়। নলিনীবাবু সেটিকে পুস্তক আকারে মুদ্রণের দায়িত্ব যেচেই নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বইয়ের আকারে ভূমিষ্ঠ হতে পারে নি। পুলিস "বাংলার বাণী"র প্রকাশ বন্ধ করে দেয় এবং নলিনীবাবুকেও রাজঅতিথি হতে হয়।

আমার গ্রন্থ রচনার প্রথম প্রয়াস লেনিনকে নিয়ে। এই ঘটনাটিও চিন্তার বিকাশে একটি উজ্জ্বল দিক্‌চিহ্ন হয়ে আছে। এই ত খুঁজে পেয়েছি সেই মহান ব্যক্তিত্ব যার মধ্যে হয়েছে জ্ঞান ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয়। রুশ বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকা এবং মতবাদ অধ্যয়নের যতটুকু সুযোগ পাই তাতে অনেক প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেয়েছিলাম। সহকর্মীদের মধ্যে যারা কমিউনিস্টদের বিরোধী তাদের মুখে একটা অভিযোগ প্রায়ই শোনা যেত। সাম্যবাদী আদর্শ নেওয়া মানেই নাকি রুশ বিপ্লবের অন্ধ অনুকরণ। এই অভিযোগ যে কতখানি ভিত্তিহীন তা বুঝতে ঐ বইটি বিশেষ সাহায্য করে। লেনিনের লেখা আরো কয়েকটি প্রবন্ধ সঙ্কলন ঐ সময়ে হাতে এসেছিল। সেগুলির সাহায্যে এইটুকু বুঝেছিলাম যে, সাম্যবাদ শুধু আদর্শমাত্র নয়। তা হল বিপ্লবের বিজ্ঞান। নিজ দেশের বাস্তব ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়েই সেই বিজ্ঞানের মূল শিক্ষাকে প্রয়োগ করতে হবে। ডঃ ভূপেন দত্তর সঙ্গে আলোচনার ফলে এই ধারণা আরো স্পষ্ট হয়। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমাদের দেশের তখনকার গোঁড়া কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গির যে বেশ কিছুটা পার্থক্য আছে তাও বুঝতে পারি। তিনি বুর্জোয়া নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করেন বটে কিন্তু জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকার পক্ষপাতী মোটেই নন। ভারতের বিপ্লব সংগ্রামের জাতীয়মুক্তির চরিত্রটি সব সময়ই তাঁর দৃষ্টিতে যথোচিত গুরুত্ব লাভ করেছে।

ডঃ ভূপেন দত্তের সঙ্গে যখন আলোচনা করি তখন মনের অপর কুঠুরিটির দরজা খুলে যায়। এক এক সময় ইচ্ছা হয় তাঁর সহকর্মীরূপে নতুন অধ্যায় শুরু করি। কিন্তু পিছুটান কাটিয়ে ওঠা সহজ হয় না। দলের প্রতি

আনুগত্য ত আছেই। রয়েছে সহকর্মীদের সম্বন্ধে মমতাবোধ। যাদের হাত ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ব বলে পথ চলা শুরু করেছিলাম তারা আজ আত্মদানের বহ্ন্যুৎসবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এই সময়ে তাদের ছেড়ে সরে আসাটা হবে বন্ধুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। সে গ্লানির জের হয়ত সারা জীবন টেনে চলতে হবে। তার চেয়ে অনেকগুণে শ্রেয় সাথীদের নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া। যদি বেঁচে থাকি তখন তাদের বুঝিয়ে আমার মতে এনে আবার এক সঙ্গে নতুন ভাবে যাত্রা শুরু করা যাবে।

১৯৩১ সাল শেষ হয়ে আসে। বছর যত এগিয়ে চলে ততই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আর একটা গণসংগ্রাম আসন্ন। মহাত্মাজী গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে এলে তাঁকে নতুন ভাবে আন্দোলনের ডাক দিতেই হবে। গভর্নমেণ্ট গান্ধী-আরউইন চুক্তির শর্তগুলি ভঙ্গ করে প্রদেশে প্রদেশে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, যুক্ত প্রদেশে জনতার উপরে দমননীতির রথচক্র চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। হিজলীর বন্দিশিবিরে বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীদের উপর কারারক্ষীদের নির্বিচারে গুলিবর্ষণের সংবাদে সারাদেশ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সন্তোষ মিত্র এবং তারকেশ্বর সেন গুলিতে নিহত হয়েছেন। আরো কুড়িজন বন্দী গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। সংবাদ পেয়ে সেনগুপ্ত এবং সুভাষচন্দ্র হিজলীতে ছুটে যান। শহীদদের শবদেহ কলকাতায় নিয়ে আসা হবে।

হাওড়া স্টেশন থেকে কেওড়াতলা মহাশ্মশান পর্যন্ত সেই বিশাল শোক-মিছিলে দেখি কালবৈশাখীর সুস্পষ্ট আভাস। মৌন কিন্তু বজ্রগর্ভ। ঝড়ের পূর্বমুহূর্তের নিস্তব্ধতা। বন্দীহত্যার প্রতিবাদে ময়দানের জনসমাবেশে পৌরোহিত্য করতে এগিয়ে আসেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অসুস্থতা তাঁকে পিছনে টেনে রাখতে পারে নি। মনুমেন্টের সোপানের উপর কবির দুই পাশে দাঁড়িয়ে সেনগুপ্ত এবং সুভাষ। নিদারুণ শোক আর ক্রোধ আজ সমস্ত দলাদলিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। কবিগুরু সভায় ভাষণের বদলে পড়ে শোনান তাঁর সেই বিখ্যাত "প্রশ্ন" কবিতাটি। আমাদের বয়সের ছেলেরা কেউই বোধ হয় সেদিন প্রশ্ন করেনি। তারা ঐ সমাবেশে দাঁড়িয়ে শপথ নিয়েছে—যে যেভাবে পারি এই অত্যাচারের জবাব দিতে হবে। আর কিছু না পারি, মাতৃভূমির "রাঙা চরণ রাঙিয়ে দেবো মোদের বুকের রক্ত দিয়ে"।

১৯৩২ সালের গোড়াতেই আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। গভর্নমেন্ট এবার আগে থেকেই তৈরি ছিল। প্রবর্তিত হয় অর্ডিনান্স রাজ। মহাত্মা গান্ধী সহ সমস্ত জাতীয় নেতা কারাগারে নিক্ষিপ্ত। কংগ্রেস সংগঠন বে-আইনী ঘোষিত। নিষিদ্ধ হয় আরো অনেক সংগঠন, ছাত্র-যুব-সমিতি, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভেবেছিল নেতাদের গ্রেপ্তার করে দমননীতির সাহায্যে অল্প কিছুদিনের মধ্যে আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবে। কিন্তু দেশের মানুষ ত এই সংগ্রাম-ঘোষণার জন্যই প্রতীক্ষা করে ছিল। সমস্ত বিধিনিষেধ-অত্যাচার-নির্যাতনকে তুচ্ছ করে সংগ্রাম এগিয়ে চলে। নিখিল বঙ্গ ছাত্র-সমিতি আগে থেকেই প্রস্তুতি করে রেখেছিল। এবার আর বিদ্যায়তনে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান নয়। ছাত্র-সমিতির নেতৃত্বে সংগঠিত ছাত্ররা দলের পর দলে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করবে। এজন্য একটি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পূর্বাহ্নেই গঠিত হয়েছিল। এ. বি. এস. এ. এবং সংগ্রাম পরিষদ দুটোকেই গভর্নমেন্ট বে-আইনী সংস্থা বলে ঘোষণা করে। সমিতির অফিস পুলিস তালাবন্ধ করে দেয়। তবু স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্রেরা এগিয়ে আসে। ছাত্র-সমিতির সহসভাপতিদের একজন হিসাবে আমাকেও কারা-বরণের জন্য নাম লেখাতে হবে। আমি নিজেও সেজন্য উৎসুক হয়ে আছি। ১৯৩০ সালে পরিচিত বন্ধুদের অনেকে জেল খেটে এসেছে। দেশের জন্য দণ্ডভোগ করাটা তখন হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা বিশেষ সম্মানের চিহ্ন।

গান্ধী-আরউইন চুক্তির পরে মুক্ত বন্দীরা জনতার কাছে যে বিপুল অভিনন্দন লাভ করেছিলেন তা অনেককে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। কারাগার হয়ে দাঁড়ায় তীর্থক্ষেত্র। সে তীর্থ ঘুরে না এলে একটা হীনমন্যতাবোধ কাঁটার মত বিঁধতে থাকে। তাই আমি পা বাড়িয়েই আছি। বাদ সাধেন কলকাতা সংগঠনের নেতা, যিনি আমাদের প্রত্যক্ষ উপরওয়ালা। তিনি বলেন : "তোমাকে এখন সত্যাগ্রহে যোগদানের জন্য ছেড়ে দিতে পারি না।"

অথচ নিখিল বঙ্গ ছাত্র-সমিতির পিছনে অনুশীলনের কর্মীরাই প্রধান সংগঠিত শক্তি। আমি যে পদে অধিষ্ঠিত আছি তাতে কারাবরণ এড়িয়ে গেলে সেইসব কর্মীদের বড় বে-কায়দায় পড়তে হবে। নানারকম মন্তব্য শুনতে ও কৈফিয়ত দিতে হবে। গুপ্ত সমিতির কাজের জন্য আন্দোলনে যোগ দিতে

পারছি না একথা বলাও যাবে না, কেউ মানবেও না। তারা ধরে নেবে ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছি।

সুরেন দাশগুপ্তের সঙ্গে পরামর্শ করে আপিল করি কেদারদার দরবারে। কেদারদার সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে অবস্থাটা বুঝিয়ে বলি। সব শুনে তিনি শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিলেন। তার আগে যেন মনে মনে কি একটা হিসেব-নিকেশ করে নিয়ে বললেন, "সত্যাগ্রহ করে জেলে গেলে হয়ত 'বি-সি-এল-এ'র (বিনা বিচারে আটক আইনের) ফাঁড়াটা কিছুদিনের জন্য এড়াতে পারবে। তবে জেলের মধ্যেও সতর্ক হয়ে চলবে। ওখানে ত অনেক ছেলেকে সবসময় একত্রে পাবে। তাদের 'রিক্রুট' করার লোভও হবে। কিন্তু সেটা সামলানো চাই। জেলেও কথা চালাচালি হয়। পুলিসের ইনফর্মার থাকে। যদি তোমার আসল পরিচয় পুলিস জেনে ফেলে তাহলে মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গেটেই আবার আটক করবে।" ঠিক হয় আমার হাতে যে সাংগঠনিক দায়িত্ব আছে তা সাময়িকভাবে সুরেনকে বুঝিয়ে দিয়ে যাব। তবে জেলে যাওয়ার আগে আর একটা কাজ করে দিয়ে যেতে হবে। কেদারদা অনুমতি দিয়েছেন সেই শর্তে। আমাদের জেলায় অ্যাকশনের যে পরিকল্পনাটি দিয়েছিলাম তার সূত্রগুলি গুছিয়ে পার্টির হাতে তুলে দিতে হবে। তিনি বলেন, আইন অমান্যের জন্য আদালত তোমাকে কতদিন সাজা দেবে তার ত নিশ্চয়তা নেই। ছয়মাসও হতে পারে, একবৎসরও হতে পারে। ইতিমধ্যেই হয়ত ঐ পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করার সময় এসে যাবে। এখান থেকে একজন বিশেষ দক্ষ কর্মীকে শিলিগুড়ি পাঠানো হবে। তার সঙ্গে ওখানে দায়িত্বশীল দুই একজন কর্মীর যোগাযোগ করে দেব, এইটুকু হবে আমার কাজ। কে যাবে—সেটা জঙ্গী বিভাগ দুই একদিনের মধ্যেই স্থির করবে। সেই কর্মীটি দু'তিন মাস জেলায় ঘোরাঘুরি করে রাস্তাঘাট ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি ভালভাবে বুঝে নেবে। অ্যাকশনে স্থানীয় সংগঠনের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকবে না। পরোক্ষ কাজ হবে আশ্রয়ের ব্যবস্থা এবং আনুষঙ্গিক যা প্রয়োজন তাই করা। কেদারদা বিশেষভাবে বলে দিলেন যে, আমাকে যেতে হবে অত্যন্ত গোপনে। নিতান্ত বিশ্বস্ত দু'একজন ছাড়া আর কেউ যেন আমার উপস্থিতি টের না পায়।

আমার প্রস্তাবে দলের নেতৃত্বে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন দেখে উৎসাহিত হই।

এতদিন কোন খবর না পেয়ে ভেবেছিলাম যে, বুঝি ওটা ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে। পরিকল্পনাকে আরো একটু বিশদ রূপ দেওয়ার জন্য একদিন জঙ্গী বিভাগের বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আমার আলোচনার ব্যবস্থা হয়। হরিপদ দের সঙ্গে এই ভাবেই হয় প্রথম পরিচয়। তিনি ইতিপূর্বে কয়েক বৎসর টাটার কারখানায় মেকানিক হিসাবে কাজ করে এসেছেন। বিস্ফোরক সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। প্রথম পরিচয়ের সময় অবশ্য তাঁর আসল নাম জানতে পারি নি। জেনেছি 'টেক' নামে। তিনি অনেক খুঁটিনাটি তথ্য জেনে নিয়ে অ্যাকশনের একটা খসড়া ছক খাড়া করলেন। আমার সঙ্গে যে ছেলেটি যাবে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

সঙ্গী নির্বাচন খুব উপযোগী হয়েছে। তাদের আদি বাসস্থান ছিল বিহারে। কয়েক পুরুষ ধরে বাংলায় বাস করে পুরোপুরি বাঙ্গালী হয়ে গেলেও প্রয়োজন মত বিহারী সেজে থাকতে পারবে। এমন একটা ট্রেন বেছে নিই যাতে সন্ধ্যার পর শিলিগুড়িতে পৌঁছানো যায়। আশৈশব পরিচিত শহরে যখন প্রবেশ করি তখন প্রধান পথগুলিতেও সূচীভেদ্য অন্ধকার। শীতের রাত হওয়াতে লোক চলাচল নেই। উত্তরের দিকে তাকালে চোখে পড়ে হিমালয়ের আ-দিগন্ত বিস্তৃত একটা আবছা রূপরেখা আর শিঙ্কা পাহাড়ের নীচে বাঁদিকে কার্শিয়ং-পাঙখা-বাড়ি রোডের আলোকমালা। মঙ্গল সিংয়ের বাসায় যেয়ে উপস্থিত হই। তাঁকে শুধু বলি যে, সমিতির কাজে এসেছি দুই এক দিনের জন্য। আমার আসার কথা যাতে কেউ না জানতে পারে সেই রকম একটা গোপন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

সিংজী প্রথমটায় একটু চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। কোন ভদ্র পরিবারে আশ্রয় পাওয়া সম্ভব নয়। শহরে জানাজানি হয়ে যাবে। নিজেদের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র কেন উঠেছি তাই নিয়ে দেখা দেবে অনেকের মনে নানা সন্দেহ, কৌতূহল। খবরটা পুলিসের কানে পৌঁছাতে দেরি হবে না। সিংজী জিজ্ঞাসা করেন একেবারে মুটেমজুরের বস্তিতে থাকতে পারব কি না? আমি ত সব কিছুর জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছি। আমার সঙ্গী পুরুষোত্তমের জন্য কোন অসুবিধা নেই। সে বিহারী পরিচয়ে কয়েকদিন মঙ্গল সিংয়ের আস্তানায় থাকতে পারে। তারপর তাকে একটা ডেরা খুঁজে দেবেন। সে সমিতির কাজে এসেছে, এর বেশি কিছু সিংজীকে জানাই না। তিনিও জানতে কৌতূহলী নন। শীতের সময়

কমলা লেবুর ব্যবসায় উপলক্ষে নানা জায়গা থেকে অনেকে এখানে আসে। তাই পুরুষোত্তম "কমলাওয়ালা' সেজে থাকতে পারবে।

সিংজী বার হন আমার আশ্রয়ের খোঁজে। ফিরে আসেন ঘণ্টা খানেক পরে। ব্যবস্থা একটা করে এসেছেন। শহরের এক প্রান্তে, একেবারে খেটে-খাওয়া মানুষদের বস্তি। দিন-আনা দিন-খাওয়া মানুষ। চেরা বাঁশের বেড়া ঘেরা আঙ্গিনায় খড়ছাওয়া কয়েকটি মাটির ঘর। বাড়ির মালিক বর্ষীয়সী হিন্দুস্থানী মুসলমান মহিলা। তাঁর এক বিপদের দিনে মঙ্গল সিং খুব উপকার করেছিলেন। তাই সিংজীর কথায় বৃদ্ধা প্রাণ দিতেও রাজী। আমাকে পৌঁছে দিয়ে মঙ্গল সিং সেদিনকার মত চলে যান।

আমি প্রথম আলাপেই বৃদ্ধাকে "মায়ী" সম্বোধন করে সম্পর্কটি কাছের করে নিতে চাই। মায়ী বলেন: "তুমি যখন বেটা, তখন তোমার যাতে কোন বিপদ না হয় তা আমাকে দেখতেই হবে।" আঙ্গিনার মাঝখানে একটি ঘরে বৃদ্ধা নিজ পরিজন নিয়ে বাস করেন। আর দুপাশে দুটি লম্বা চালা ঘরে অনেকগুলি ছোট ছোট খুপরি। ওরই একটির কোণের খুপরিতে আমার সাময়িক আস্তানা। অন্যগুলিতে বাস করে নানা ধরনের লোক, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাহাড়ী। কেউ বিড়ি বাঁধে, কেউ চানাওয়ালা, কেউ দিনমজুর। খাওয়ার বন্দোবস্ত কি হবে তাই নিয়ে মায়ীর ভাবনা।

আমি বলি: "বেটা বলে যখন মেনে নিয়েছেন তখন আপনার রান্না ছাড়া আর কারুর রান্না খাব না।"

তিনি বললেন: "গরীবের ঘরের রোটি-দাল কি খেতে পারবে?" খাওয়ার সময় দেখি ভাতেরই ব্যবস্থা করেছেন। মাংসের সুরুয়াও রয়েছে। খাওয়া সেরে নিজের খুপরিতে যেয়ে চারপাইয়ের উপর শুয়ে পড়ি। কম্বল বিছানো আছে। মেঝে থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ ওঠে।

বাড়িটির পিছনেই কাদার কুণ্ড। তারপরে একটি বদ্ধ জলা শ্যাওলার পুরু আস্তরণে সবুজ হয়ে রয়েছে। ভাগ্যিস এটা শীতকাল। বর্ষায় নরকে পরিণত হবে। নিজের মনের রাশ শক্ত হাতে চেপে ধরি। বিপ্লবীদের অনেকে ত এর চেয়েও শতগুণ নোংরা পরিবেশে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। রাতে বহুক্ষণ ঘুম আসে না। পাশের খুপরিতে পাহাড়ী দিনমজুরটি 'রক্সি' খেয়ে মাতাল হয়ে আবোলতাবোল বকছে। তার বৌটি কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলে স্বামীকে ভর্ৎসনা

করে। সকালে উঠে টের পাই যে বাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে আমার সম্বন্ধে জানাজানি হয়ে গিয়েছে। আমি স্বদেশীওয়ালা বাবু, ফেরারী। শুনে বড় উৎকণ্ঠা বোধ করি। এমনিভাবে কানাকানি হলে পুলিসের কাছে খবর পৌঁছাতে আর কতক্ষণ দেরি হবে। তাহলে কর্মজীবনে দাঁড়ি পড়বে এখানেই।

মায়ী 'চা-নাস্তা' নিয়ে আসতে তাঁকে আমার উৎকণ্ঠার কথা জানাই। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, কেউ তাঁর কথার বিরুদ্ধে যাবে না বা তাঁকে বিপদে ফেলার মত কোন কাজ করবে না। তবু আমি আশ্বস্ত হই না দেখে আমাকে বোঝান যে, ভুখা মেহনতী মানুষ হলেও তারাও স্বরাজের কথা কিছু বোঝেন বই কি। স্বরাজ এলে হয়ত তাদের দুঃখকষ্টের কিছুটা লাঘব হবে। আমার মতন কত ঘরের ছেলে গরীবের জন্য জান বিলিয়ে দিচ্ছে সে কথা কি তাঁরা বোঝেন না! শুনে মনে অভূতপূর্ব আনন্দ বোধ করি। তবু উৎকণ্ঠা যায় না। সারাদিন উৎকর্ণ হয়ে থাকি। সদর দরজায় শব্দ শুনলেই আশঙ্কা হয় বুঝি পুলিস এসেছে। এমনিভাবে সারাদিন কাটে। সন্ধ্যায় বার হয়ে পড়ি পাহাড়ী দিনমজুরের বেশে। মঙ্গল সিংয়ের বাসায় আসার জন্য মোহনকে খবর দেওয়া ছিল। পুরুষোত্তমের সঙ্গে তার পরিচয় করে দিই। ক্ষীরোদ কলকাতায় ডাক্তারী পড়ছে। সে এখানে উপস্থিত থাকলে সবচেয়ে ভাল হত। তাই মোহনকেই ভার দিতে হয়। তাকে অবশ্য সব কথা খুলে বলি না। শুধু জানাই যে, এখন থেকে পুরুষোত্তমই তোমাদের পরিচালনা করবে।

এর পরের কাজটিই কঠিন। পুরুষোত্তমকে সীমানায় নিয়ে সরযূ সিংদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিতে হবে। যাওয়া-আসা দুটোই দিনের বেলায়। অন্য উপায় নেই। অগত্যা পাহাড়ীদের পোশাকের উপর ভরসা রেখে পা বাড়াই। দাওরা-সুরুআল মাথায় পাহাড়ী টুপি। এ বেশে সহজে আমাকে কেউ চিনতে পারবে না। তবু শিলিগুড়িতে ট্রেনে না চড়ে উঠি ৩।৪ মাইল এগিয়ে গিয়ে পঞ্চনই স্টেশনে। পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় তিনধারিয়া স্টেশনে। প্ল্যাটফরমে ঠিক আমার কামরার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছোট-বেলার সহপাঠী সুধীর দাস। সুধীর রেল কর্মচারী। কিন্তু সে যদি আমাকে চিনতে পেরে কথা বলতে এগিয়ে আসে তাহলে সেটা কার নজরে পড়ে যাবে কে জানে! ঝুঁকি নেওয়া চলে না। বুঝতে পারি যে, সুধীর আমাকে চিনি

চিনি করেও পাহাড়ী বেশের দরুন নিশ্চিত হতে পারে না। আমি তার দুই চোখের উপরে চোখ রেখে নির্বিকারভাবে তাকিয়ে থাকি। ফলে তার মনের অনিশ্চিত ভাবটাই দৃঢ় হয়। সে এগিয়ে না এসে বরং অন্যত্র চলে যায়। আমি ভাবি ফাঁড়া কেটে গেল।

সীমানায় পৌঁছাবার পরে সরযু সিংরাও প্রথমে হতচকিত হয়ে যায়। পরে টুপি খোলায় চিনতে পেরে হেসে বলে, "আপনে তো কামাল কর দিয়া"। পরের দিন ফিরতি পথে পঞ্চনই স্টেশনেই নেমে পড়ি। অন্ধকার হতে দেরি আছে। এই সময়টা কাটাতে হবে মাল্লাগুড়ি বস্তিতে, আমাদের সমর্থক কিশোরী দত্তের মুদীর দোকানে। সেখানেও হয় প্রথমে একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি, পরে খানিকটা হাস্যহাসি। আত্মগোপন করে চলাফেরার এই দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা প্রথম বারের তুলনায় নিজের কাছেই অনেক রোমাঞ্চকর মনে হয়। জীবনের আর একটা শক্ত-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছি।

সেদিনই শেষ রাত্রের ট্রেনে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করি। কলকাতায় ফিরে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে আলোচনার পর আমার কারাবরণের দিন স্থির হয় ২৬শে জানুয়ারি, স্বাধীনতা দিবসে। হাতে দিনসাতেক সময় আছে। মার সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে। মা তখন রয়েছেন রাণাঘাটে, মেজদার কাছে। রাণাঘাটে যেয়ে বিপাকে পড়তে হয়। মেজদা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। এ অবস্থায় তাঁকে ফেলে আসতে মনে ব্যথা লাগে। অথচ উপায় নেই। দেশজননীর আহ্বান সব কিছুর উপরে। সৈনিকের জন্য যখন যুদ্ধক্ষেত্রের ডাক আসে সে কি পিছিয়ে থাকতে পারে? প্রথমে ভেবেছিলাম যে, মাকে একান্তে বলে আসব। শেষ পর্যন্ত না বলাই সমীচীন মনে হয়। কলকাতায় যেয়ে মেসের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে সুটকেশ-বিছানা নিয়ে ফিরে আসব বলে চলে আসি।

২৫শে সন্ধ্যায় সব কথা খুলে লিখে মার নামে একখানা চিঠি ডাকে দিই। চিঠি যখন তাঁর হাতে পৌঁছাবে তখন আমি থাকবো লালবাজারে পুলিস লক-আপে। তিনি ব্যথা পাবেন ঠিকই। তবে এও জানি চোখের জল মুছে আশীর্বাদও জানাবেন।

২৬শে জানুয়ারি। ছাত্র সমিতির অস্থায়ী সভাপতি এবং সংগ্রাম পরিষদের 'ডিক্টেটর' হিসাবে এক ছাত্র মিছিলের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে তদানীন্তন ক্লাইভ

স্ট্রীটে ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল বার করি। ঐদিন যারা আমার জেল-যাত্রার সাথী হবে তারা পূর্ব-নির্দিষ্ট একটি স্থানে দু'তিনজনের ছোট ছোট দলে এসে সমবেত হয়েছে। পুলিসকে কিছু বোঝার অবকাশ না দিয়ে মোটা খদ্দরের চাদরের নীচে থেকে ত্রিবর্ণ পতাকা বার করে রাজপথে নেমে পড়ি। মুহূর্তের মধ্যে অন্যেরাও আমার পিছনে সমবেত হয়। বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলি, "বন্দে মাতরম্" "ইনক্বিলাব জিন্দবাদ", "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক", "Down ! Down ! Union Jack", "Up ! Up ! National Flag !"

দিশেহারা কনস্টেবলরা ছুটে এসে মিছিলের গতিরোধ করে। তাদের বাধা ঠেলে এগিয়ে চলি। ততক্ষণে দৈত্যাকৃতি লালমুখো গোরা সার্জেণ্টের দল ছুটে এসে আমাদের ঘিরে ফেলে। বেটন দিয়ে নির্মমভাবে পিটাতে পিটাতে সবাইকে ঠেলে নিয়ে যায় রাইটার্স বিল্ডিংয়ের গাড়িবারান্দার নীচে। দু'দিকের ফুটপাথে ভিড় জমে গিয়েছিল। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিস বেপরোয়া লাঠিচালনা করে। উত্তেজনা আর প্রহারের মুখেও লক্ষ্য করেছিলাম যে, গোরা সার্জেন্টগুলি আসার আগে পর্যন্ত দেশীয় কনস্টেবলরা আমাদের বা জনতার গায়ে হাত তোলে নি। অভিজ্ঞ বন্ধুরা পরামর্শ দিয়েছিলেন মোটা খদ্দরের চাদর গায়ে জড়িয়ে নিতে। তাতে বেটনের আঘাত কিছু কম লাগবে। আর রাত্রে পুলিস লক-আপে ওটাকে গায়ে দিয়ে শোয়া যাবে। মারটা অবশ্য কিছু কম যন্ত্রণাদায়ক বোধ হয়নি। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের তলা থেকে প্রিজন ভ্যানে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল হেয়ার স্ট্রীট থানায়। সেখানে ভারপ্রাপ্ত অফিসার খুব দুর্ব্যবহার করে নি। এক এক জনের নাম, বাপের নাম, ঠিকানা, পেশা, সঙ্গে টাকাপয়সা কি আছে, পরিধেয় ইত্যাদি সব কিছুর বিবরণ একটা মোটা খাতায় লিখে নিয়ে সবাইকে লক-আপে বন্ধ করে। থানার সার্জেণ্টটি আমাদের সঙ্গে অযাচিতভাবে ভদ্র ব্যবহার করায় প্রথমে বিস্মিত হই। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে "আমি হলাম আইরিশ। আমার কান্ট্রিও স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এখনও সে লড়াই শেষ হয় নি।"

ক্রমে আরো বহু সত্যাগ্রহী বন্দী এসে পৌঁছায়। বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির স্বেচ্ছাসেবক তারা। লক-আপটা যেন সারা ভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণে পরিণত হয়। গুজরাটী, বিহারী, হিন্দুস্থানী, রাজস্থানী, মাদ্রাজী নানা ভাষাভাষী। একই সংগ্রামের সৈনিক। একে একে সবার সঙ্গে প্রথমে পরিচয় পরে সৌহার্দ্য

পড়ে ওঠে। রাত বারোটার সময় আবার প্রিজন ভ্যানে লালবাজার লক-আপ। গায়ের চাদরটা এবার কাজে লাগে। প্রকৃতির তাগিদ মিটাবার ব্যবস্থা ঐ ঘরেরই এক কোণে। ভোর না হতে দুর্গন্ধে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। . বেলা নয়টার সময় প্রত্যেকের ভাগ্যে জোটে একটা করে পোড়া রুটি আর মাটির ভাঁড়ে চা নামক জলীয় পদার্থ। তারপর ব্যাঙ্কশাল কোর্ট। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সবাইকে পাইকারী হারে হাজির করা হয়। আদালতের প্রশ্নের উত্তরে বলি: "আমরা স্বেচ্ছায় আইন ভঙ্গ করেছি। সুতরাং আত্মপক্ষ সমর্থনের কথাই ওঠেনা।" কয়েক মিনিটের মধ্যে বিচার শেষ। সবাইকে পাইকারী হারেই ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল। আমরা কয়েকজন ছাত্র ছিলাম বলে কিনা জানিনা, ম্যাজিস্ট্রেট সেদিনকার আসামীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীরূপে গণ্য করার নির্দেশ দিলেন। কোর্টের জালঘেরা হাজত থেকে বার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্রিজন ভ্যানে ওঠা পর্যন্ত গোরা সার্জেন্টরা প্রত্যেককে বেটনের গুতো দিয়ে আপ্যায়িত করে। মুখে বলে "Bloody six months in jail for your bloody country।" নেহাৎ আদালত প্রাঙ্গণ বলেই মারটা গতকালের মত বে-ধড়ক হয় নি। সেদিনকার মত থাকার ব্যবস্থা হয়েছে প্রেসিডেন্সি জেলের সামনে ছোট্ট দেওয়ানী জেলটিতে। এক সঙ্গে ষাট সত্তর জন বন্দীর খাওয়ার ব্যবস্থা করতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পেটে ভাত পড়ে। তারপর ব্যারাকে বন্ধ হয়ে সবাই কম্বল-শয্যার আশ্রয় নিই। অভিজ্ঞতাটা নতুন। ভালই লাগে। এতগুলি লোক একসঙ্গে দেশের জন্য বন্দী-দশা স্বেচ্ছায় বরণ করেছি। আরো কত কষ্টের জন্যই ত প্রস্তুত হয়ে এসেছি। অ্যাডভেঞ্চারের সবে শুরু। নগদ লাভ কত অজানার সঙ্গে পরিচয়। এই অনুভূতির জোরেই প্রহারের বেদনা ভুলে গিয়েছি। এক রাত একদিনের উপবাসের ক্লেশ একেবারে টের পাই নি। পরদিন সকালে ব্যারাকের মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে গানের মজলিস বসে। সঙ্গীদের মধ্যে কয়েকজন গায়ক আছেন তা থানা লক-আপেই টের পাওয়া গিয়েছিল। মজলিস ভঙ্গ হয় সমবেত কণ্ঠে তখনকার একটি বহুল প্রচলিত গান দিয়ে—

"ছিন্নমস্তা আয় দেখি মা, বিভীষণার রূপ ধরে।
রাঙিয়ে দেবো রাঙা চরণ মোদের বুকের রক্ত দিয়ে।"

আজ এত বছর পরেও সে সুরের রেশ যেন কানে বাজে।

সেদিন বিকেলে সান্ত্রী পরিবেষ্টিত হয়ে আমরা সবাই যাই আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে এক রাত কাটিয়ে পরের দিন বিকেলে দমদম স্পেসাল জেল। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ত বহু ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি-বিজড়িত। বহু খ্যাত এবং অখ্যাতনামা রাজনৈতিক কর্মীর বন্দী-জীবনের দিনগুলি কেটেছে এখানে। এই ফাঁসীর মঞ্চে শহীদেরা গেয়ে গিয়েছে জীবনের জয়গান। তীর্থযাত্রীর মতই শ্রদ্ধা বিস্ময় আর কৌতূহলভরা দুই চোখ মেলে সব কিছু দেখি। দমদম স্পেশাল জেলটি স্থাপিত হয়েছে অ্যামিউনিশান ফ্যাক্টরীর পরিত্যক্ত সুবিশাল প্রাঙ্গণে। চার দেয়ালের বেষ্টনীর মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে স্থাপিত হয়েছে দুটি অস্থায়ী বন্দিশিবির—স্পেশাল জেল এবং অ্যাডি-শনাল স্পেশাল জেল। স্পেশাল জেলে বেশির ভাগ হলেন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী। পরেরটি শুধু তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের জন্য। দুটির মধ্যে কোন সংযোগ নেই। মাঝখানে খানিকটা ব্যবধান। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে মানুষগুলিকে চলাফেরা করতে দেখা যায়, চেনা যায় না।

দমদম স্পেশাল জেলের সেই দিনগুলি! প্রথম বন্দী-জীবন। ছয়টি মাসের প্রায় প্রতিটি দিনের ছোট-বড় কত ঘটনার স্মৃতি এতকালের ব্যবধানেও অম্লান হয়ে আছে। বহু পরিচিত বন্ধুকে কাছে পাই। কত অপরিচিতের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সারা বাংলার সমস্ত জেলার প্রথম ও দ্বিতীয় সারির জাতীয়তাবাদী নেতা ও কর্মীর সাহচর্য লাভ করি। খ্যাতনামা নেতাদের মধ্যে রয়েছেন অশীতিপর বৃদ্ধ হরদয়াল নাগ, ক্যাপ্টেন ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, চারু ভাণ্ডারী, ঢাকার বীরেন রায়, হাওড়ার বিজয় ভট্টাচার্য, ময়মনসিংহের জ্ঞান রায়, বগুড়ার যতীন রায়, নদীয়ার বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাদের মধ্যে রয়েছেন আশরাফউদ্দীন আমেদচৌধুরী সৈয়দ নৌশের আলি, মণিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকি, আবুল হায়াত প্রভৃতি।

আমাদের লক-আপের সঙ্গী সেই গুজরাটী, বিহারী, মাদ্রাজী বন্ধুরাও এসেছেন এখানে। বন্দীদের মধ্যে কয়েকজন গোঁড়া নিষ্ঠাবান হিন্দু আলাদা হেঁসেলে রন্ধন ও ভোজনের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। বাদবাকি সকলের রান্না হয় একই রন্ধনশালায়। টালির চালের নীচে সিমেণ্ট বাঁধানো প্রকাণ্ড চত্বরে সকলে মিলে দুবেলা পঙ্‌ক্তিভোজন করি। প্রায় হাজারখানেক লোক একসঙ্গে

খেতে বসে। রোজই মহোৎসব। ছোঁয়াছুঁয়ি বা জাত-বিচারের চিহ্নও নেই। জাতীয় স্বাধীনতার প্রেরণা সব বেড়া ভেঙ্গে দিয়েছে।

নানা মত ও পথের, নানা দলের কর্মীরা আছেন। গোঁড়া গান্ধীবাদী, বামপন্থী জাতীয়তাবাদী; অনুশীলন ও যুগান্তরের কর্মী, দুই একজন কমিউনিস্ট। তবু রাজনৈতিক ঝগড়াঝাঁটি নেই। দলাদলি একেবারে নেই বলাটা ভুল হবে, তবে তা খুব প্রকট নয়। এ. বি. এস. এ. এবং বি. পি. এস-এর নেতা ও কর্মীরা এখানে গলাগলি করে বেড়ান। মোটের উপর সবাই মিলে সম্প্রীতির এক সুন্দর পরিমণ্ডল সৃষ্টি করছেন। শুনেছি ত্রিশ সালের আন্দোলনের সময় খ্যাতনামা শ্রমিক নেতা বঙ্কিম মুখার্জী ছিলেন এখানে। তিনি 'কমিউনিজম' সম্বন্ধে ক্লাস নিতেন। এবার তেমন কেউ নেই। তবু পড়াশুনার পরিবেশ আছে। অনেক বন্দীদের বাড়ি থেকে নানা ধরনের বই আসে। বন্দীদের বেশিরভাগ বয়সে তরুণ। তারা দল মত বা পথ নিয়ে মাথা ঘামায় না। দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে সংগ্রামের জোয়ারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

জেলের দিনগুলিকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে ছাত্রবন্ধুদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় তারা মিলে অন্যদের জন্য অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, আলোচনাচক্র নানাভাবে ব্যবস্থা করেছি। একটা 'স্টুডেণ্টস পার্লামেণ্ট' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অধ্যাপক বিজয় ভট্টাচার্যকে করা হয়েছে স্পীকার। বিতর্কের সুবিধার জন্য বিভিন্ন দল গঠন করা হয়েছে। যথা, রক্ষণশীল, উদারনৈতিক, চরমপন্থী। পরে চরমপন্থী বা র‍্যাডিক্যাল নাম বদলে 'কমিউনিস্ট' রাখা হয়।

আমি শেষোক্ত দলের মুখ্য প্রবক্তা বা দলনেতা নির্বাচিত হই। শ্রমিক-নেতা এম. এ. জামান তখন ঐ জেলে ছিলেন। আর ছিলেন 'টোভারিশ নেপাভস্কি।' তাঁর আসল নাম নৃপেন চৌধুরী। কোন এক শ্রমিক ধর্মঘটের অন্যতম নেতা হিসাবে দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। হাসি-খুশি মিশুক প্রকৃতির সাদাসিধে মানুষটি। নিজের মতামতের কথা যুক্তি দিয়ে কাউকে বোঝাবার চেষ্টা করেন না, পারেনও না। তাঁর আন্তরিকতার জন্য সবাই তাঁকে ভালবাসে। ঠাট্টাচ্ছলে নেপাভস্কি নাম দিয়েছে বটে তবে তাতে বিদ্বেষ বা বিদ্রূপের রেশটুকু নেই। এঁদের কথা লিখছি কারণ এঁরা দু জন স্বাভাবিকভাবেই 'কমিউনিস্ট' ব্লকে যোগ দিয়েছিলেন। জামান সাহেব তখন

নিজেকে কমিউনিস্ট বলেই পরিচয় দিতেন। কিন্তু তাঁরই উৎকট অসহিষ্ণুতার জন্য শেষ পর্যন্ত 'স্টুডেন্টস্ পার্লামেন্টের' কমিউনিস্ট ব্লকটি ভেঙ্গে গেল।

একদিন বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ সম্বন্ধে। অনেক বক্তাই অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমি বলেছিলাম লেনিনের 'ইম্পিরিয়ালিজম' বইটি পড়ে সেদিন যতটুকু বুঝেছিলাম তাকে ভিত্তি করে। আলোচনা শেষে বর্ষীয়ান নেতাদের কেউ কেউ ডেকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বগুড়ার যতীন রায়ের অনুরোধে বক্তৃতার সারমর্ম তাঁর খাতায় লিখে দিতে হল। আবুল হায়াত সাহেব বললেন : "এই দৃষ্টিভঙ্গি যদি আমাদের জাতীয় আন্দোলন গ্রহণ করে তবে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সামনে এক নতুন পরিপ্রেক্ষিতে উন্মুক্ত হবে।"

এতগুলি তরুণের যেখানে একত্র সমাবেশ ঘটেছে সেখানে পঠন পাঠন ছাড়াও প্রাণের উচ্ছল আনন্দকে প্রকাশের জন্য নানা ব্যবস্থা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে। দণ্ডিত বন্দীদের বেলায় নাটক অভিনয়ের বিশেষ সুযোগ সুবিধা নেই। তবে গানের আসর, আবৃত্তি, প্রভাতফেরী ইত্যাদিকে কে ঠেকিয়ে রাখবে? জেল-কর্তৃপক্ষ ক্যাম্প-জেলের বন্দীদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিশেষ হস্তক্ষেপ করত না। ফলে কলেজ-হোস্টেলের মধুময় দিনগুলি যেন নতুন পরিবেশে নতুন রূপ ধরে ফিরে আসে। যেসব ছেলেরা শান্তিনিকেতনে ছিল তারা এক একদিন ভোরে উঠে গীতকণ্ঠে জেল পরিক্রমা করে—

"ভেঙ্গেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ময়।
তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়।
তোমারি হউক জয়।"

কোনদিন বা গায় 'কারাগার' নাটকের জন্য নজরুল রচিত সেই গানটি—

"তিমির বিদারী অলকবিহারী কৃষ্ণ মুরারী আগত ঐ।
টুটিল আগল, নিখিল পাগল, সর্বহারা আজি সর্বজয়ী।"

সেইসব স্মৃতি আজও মনে ঐকতানের মূর্চ্ছনা জাগায়। কিন্তু তার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করতে গেলে মূল কাহিনী থেকে অনেকটা দূরে সরে যেতে হয়। তাই জীবন-খাতার এই কয়টি পাতার উপর সংক্ষেপে চোখ বুলিয়েই ডিঙিয়ে যেতে হচ্ছে।

কারাদণ্ড শেষে বেরিয়ে আসতেই বুঝি এখন কাজের চাপে নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত পাওয়া যাবে না। সুরেনের কাছে শুনি, প্রভাত চক্রবর্তী

অন্তরীণ থেকে পালিয়ে এসে গোপন সংগঠনের হাল ধরেছেন। সুদূর ভুটান সীমান্তের বকসা শিবির থেকে উধাও হয়েছিলেন জিতেন গুপ্ত আর কৃষ্ণ চক্রবর্তী। কৃষ্ণ চক্রবর্তী এর মধ্যেই আগরতলায় একটা ডাকাতি উপলক্ষে পুলিসের হাতে ধরা পড়েছেন। জিতেন গুপ্ত আমাদের পূর্ব পরিচিত। গত বৎসর ডিসেম্বরে ধরা পড়ার আগে পর্যন্ত তিনিই ছিলেন কলকাতা সংগঠনের উপরওয়ালা। এখন তিনি জঙ্গী বিভাগের অধিনায়ক। অন্তরীণ থেকে পালিয়ে এসেছে আরো অনেকে। নেতাদের কাছে অনুমতি চেয়ে পাঠাই দুই একদিনের জন্য মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসব। মা বলেন: "দেশের জন্য জেল খেটে এলে। এবার এম. এ. পরীক্ষার প্রস্তুতি কর। তুমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাবে সেই ভরসায় দিন গুণছি।" মাকে কি করে জানাব আমরা আগুন নিয়ে হোলি খেলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। তবু বলি: "কয়েক মাস সময় হাতে আছে। আশা করি, পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে পারব।" বড়দা এবং মেজদা দুজনেই খুব অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। তাদের ইচ্ছা নয় কলকাতায় ফিরে যাই। আমাকে যেতেই হবে। তাঁদের বলি, কলকাতায় থাকার খরচ আমি নিজেই ব্যবস্থা করে নিতে পারব। গোটা দুই টিউশনি যোগাড় হয়ে যায়। রাজসাহী কলেজে যারা আমার জুনিয়ার ছিল তাদের কেউ কেউ এখন কলকাতার বিভিন্ন কলেজে বি. এ. পড়ছে। ইংরাজি সাহিত্য পড়বার জন্য তারা আমাকে অনুরোধ করে। আমারও সুরাহা হয়ে যায়।

কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে একটা পাইস হোটেলে ঘর ভাড়া নিই। আমার উপর আবার উত্তর কলকাতা সংগঠনের দায়িত্ব এসে পড়ে। প্রভাতবাবু জিতেন বাবু দুজনের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয়েছে। প্রভাতবাবুর পার্টি-নাম হয়েছে মাস্টার মশায়। তিনি নির্দেশ দিলেন প্রকাশ্য রাজনীতির সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নয়। এমন কি এ. বি. এস-এর কার্যকরী কমিটির বৈঠকেও যাওয়া চলবে না। ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে আনতে হবে লোকচক্ষুর অন্তরালে। আত্মগোপন না করা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে যেতে পারি। তাতে ভালই হবে। সবাই ভাববে এখন পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ডুবে গিয়েছি। ছাত্র সমিতির বন্ধুরা কিছুটা ভুল বোঝেন। খবর দেওয়া সত্ত্বেও তাঁদের বৈঠকে যাই না। পথে কারুর সঙ্গে দেখা হলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। তাঁদের ধারণা হয় আমি একবার জেল খেটেই রাজনীতির সংস্রব ত্যাগ করেছি। দু-একজন মুখ-

ফুটে বলেও ফেলে। নিরুপায়! জানি ভুল তাদের একদিন ভাঙ্গবেই। ততদিন এ অপবাদের বোঝা বইতে হবে। এদিকে কাজের অন্ত নেই। জঙ্গী বিভাগ কি প্রস্তুতি করছে জানি না। জিজ্ঞাসা করাও চলে না। আমার ও সুরেনের উপর দায়িত্ব 'চালুনির' কাজ করা। ছেলেদের নানাভাবে যাচাই করে কে কোন্ কাজের পক্ষে উপযুক্ত হতে পারে সে সম্বন্ধে উপরে সুপারিশ করি। কেউ হয়ত নিষ্ক্রিয়, কিন্তু বিশ্বস্ত সমর্থক হয়ে থাকবে। ফেরারীদের আশ্রয় যোগাবার ব্যবস্থা করবে তারা। কেউ বার্তাবহের কাজের পক্ষে খুব উপযোগী। কেউ বা কিছু পরিমাণে বিপজ্জনক কাজের ঝুঁকি নিতে পারবে। সব শেষের শ্রেণীতে ধরা হল যাদের তারা হবে "অ্যাকশন স্কোয়াডে"র সদস্য। প্রথম বাছাইটা করে দেয় আমার অধীনস্থ বিভিন্ন গ্রুপের নেতারা। তাদের পরামর্শ অনুসারে এক একটি ছেলের সঙ্গে পৃথকভাবে দেখা করি। বেশির ভাগই ছাত্র, নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেও আছে বেশ কয়েকজন। তারা অভিজাত ছাত্রাবাসে থাকে। সাক্ষাতের স্থানও রকমারি। কারুর সঙ্গে দেখা করি ছাত্রাবাসে, কারুর সঙ্গে গড়ের মাঠে অথবা গঙ্গার ধারে, কখনও বা পার্কে অথবা চায়ের দোকানে। পুলিসের চোখে ধুলো দেবার জন্য যেটুকু সতর্কতা অবলম্বন করি সেটুকুতেই ছেলেদের মনে রোম্যান্টিক আমেজ লাগে বেশ বুঝতে পারি। সবার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব। আমরা শীগগিরই একটা বড় রকমের কিছু করতে যাচ্ছি এরকম একটা আভাস তারা পেয়ে গিয়েছে। গ্রুপের নেতারা বলে ওটুকু আভাস না দিলে ছেলেরা উৎসাহিত হবে কি করে? কেউ কেউ তাগিদ দেয় রিভলবার ব্যবহারের কায়দা শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে। উপযুক্ত পাত্র হলে জঙ্গী বিভাগকে খবর দিয়ে তার আয়োজনও করতে হয়। সেজন্য কয়েকটি গোপন আড্ডা নির্দিষ্ট করা আছে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার নেতারা কলকাতায় এলে প্রথমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারপর উপরওয়ালার নির্দেশ পেলে গোপন কেন্দ্রের সঙ্গে তাদের সংযোগের ব্যবস্থা করি। গ্রুপের নেতাদের মধ্যে যারা একটু 'চিন্তাশীল বলে মনে হয় তাদের রাজনীতির আলোচনায় টেনে আনার প্রয়াস পাই। দুই একজন আগ্রহ দেখায়। বেশির ভাগ তত্ত্ব আলোচনায় সাড়া দেয় না। সুরেনের কাছে শুনি, আমরা দুজন যে কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন সে কথাটা এর মধ্যেই পার্টির ভিতরে মুখে মুখে ছড়াতে শুরু করেছে। আশ্চর্য হয়ে ভাবি

সর্বোচ্চ নেতারা যে নির্দেশ দিয়েছেন তার বিপরীত কোন কাজ ত আমরা করি নি! সুরেন বলে: এতে অবাক হওয়ার কি আছে। দাদারা সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্য হিসাবে নিয়েছেন বটে। তবে তা ভবিষ্যতের জন্য। আপাতত তা শিকেয় তোলা রয়েছে। এই মুহূর্তে বড় হয়ে উঠেছে জঙ্গী কাজের পরিকল্পনা। তরুণদের ত ভবিষ্যতের কথা ভাবতে শেখানো হয় নি। তারা বর্তমানকেই বড় করে দেখছে।"

বাংলার বুকের উপরে চলেছে তখন সরকারের বলগা-ছেড়া হিংস্র সন্ত্রাস। গভর্নর হয়ে এসেছেন স্যার জন অ্যাণ্ডারসন। আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে নৃশংসভাবে 'কৃষ্ণপিঙ্গল' (Black and Tan) নীতি প্রয়োগ করে কুখ্যাত এই জাঁদরেল গভর্নর বাংলার গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়ার জন্য কৃতসঙ্কল্প। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ও প্রতিহিংসায় উন্মত্ত। মেদিনীপুরে পর পর দুজন ম্যাজিস্ট্রেট নিহত হয়েছে। স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক এবং ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এই দুইজনের উপরও আক্রমণ হয়েছিল। তারা অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছে। ইউরোপীয়ান অ্যাসো-সিয়েশন সভা ডেকে প্রস্তাব গ্রহণ করে, আওয়াজ তোলে "we want action"। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। নতুন নতুন অর্ডিনান্স জারী হয়। হত্যা-প্রচেষ্টা সফল না হলেও শুধুমাত্র প্রচেষ্টার অপরাধে প্রাণদণ্ড দেওয়া যেতে পারে। কারুর কাছে লাইসেন্সবিহীন রিভলভার বা পিস্তল পাওয়া গেলে সাত থেকে দশ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে। কোন অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হলে পাইকারী জরিমানার ব্যবস্থা হয়। ফেরারীদের আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে দীর্ঘ কারাদণ্ড। মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট নিহত হওয়ার পর খানাতল্লাশের নামে পুলিস ঘরে ঘরে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছে। চট্টগ্রামে ত গোটা জেলা জুড়ে চলেছে পুলিস ও সামরিক বাহিনীর মিলিত বিভীষিকার রাজত্ব। সমস্ত জেলে চলেছে বিপ্লবী বন্দীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন। দীর্ঘ মেয়াদে দণ্ডিত বন্দীদের আবার পাঠানো শুরু হয়েছে আন্দামানের নির্বাসনে। সরকারী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠ রুদ্ধ। দেশের নেতারা সবাই কারাগারে। সংবাদপত্রের উপর সেন্সর ব্যবস্থার অজস্র বিধিনিষেধ। হিংসাত্মক কার্যকলাপের অপরাধে অভিযুক্ত আসামীদের মামলায় পক্ষ সমর্থনের জন্য উকীল ব্যারিস্টার পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে। বিপ্লবীদের

সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে মাত্র এইটুকু সন্দেহে কতজনকে বিনাবিচারে আটক করা হয়েছে। পুলিসের হাতে ধরা পড়ার পর প্রথম চোটে লর্ড সিংহ রোডের হাজতে পৈশাচিক উৎপীড়ন ত প্রায় সবার জন্যই বরাদ্দ করা আছে। তবু ত সব কিছু জেনেশুনে তরুণেরা দলে দলে এগিয়ে আসছে। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বহ্নিশিখাকে তারা প্রজ্বলিত করে রেখেছে এখনও, নিভে যেতে দেয় নি। তাদের দৃষ্টি যদি অব্যবহিত বর্তমানের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে সেজন্য দোষ দিই কি করে ?

সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে মাস্টার মশায় আমাকে আর সুরেনকে ডেকে পাঠান। দেখা হতে তাঁদের একটি সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর, হিজলীর বন্দী-নিবাসে নিহত শহীদদের স্মৃতি-বার্ষিকী দিবসে বে-আইনী "স্বাধীন ভারত" ইস্তাহার বিলি করা হবে। সারা বাংলায়, কলকাতা ও মফস্বলের সমস্ত শহরে, একই রাত্রে। ইস্তাহারে দেশবাসীকে আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা বুঝিয়ে বলা হবে। তাদের জানিয়ে দেওয়া হবে কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। এখন বিপ্লবের রক্তরাঙা পথ ছাড়া অন্য পন্থা নেই।

একটা প্রশ্ন ওঠে এর ফলে পুলিস আগে থাকতে সতর্ক হয়ে যাবে। তাদের ধারণা আমাদের সংগঠনের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে পেরেছে। কিন্তু একই রাত্রে সারা বাংলা জুড়ে বে-আইনী ইস্তাহার বিলি বুঝিয়ে দেবে যে সে ধারণা ভুল। তখন তারা আরো মরিয়া হয়ে উঠবে। মাস্টার মশায় বলেন : "অন্য দিকটাও ভেবে দেখা দরকার। দেশের মানুষ বুঝবে যে, আমাদের সংগঠনের শক্তি এখনও মোটের উপর অক্ষুণ্ণ আছে। তাহলে তারা ইংরাজের বিরুদ্ধে নতুনভাবে লড়াই করার মত মনোবল ফিরে পাবে।" তাঁর কথাই আমরা মেনে নিই।

ইস্তাহার রচনা করার ভার পড়ে আমার উপরে। আবেগদীপ্ত অগ্নিক্ষরা রক্তঝরা ভাষায় আবেদন জানাই "লাঞ্ছিত দেশের বঞ্চিত নরনারীর" উদ্দেশে। তার মধ্যেই যতটুকু সম্ভব আমাদের চিন্তাধারাকে প্রকাশের চেষ্টা করি। তাদের বলি :

> "আমাদের লক্ষ্য যুগ যুগ ধরে শোষিত নিপীড়িত জনগণের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। আমরা চাই সমস্ত রকম শোষণের অবসান। দেশের স্বাধীনতা

হল সেই লক্ষ্যের পথে প্রথম পদক্ষেপ। আমাদের সংগ্রাম পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। তাই এখন আমাদের সর্বশক্তি এই সংগ্রামে নিয়োজিত। কিন্তু তার উদ্দেশ্য মুষ্টিমেয় বিত্তবানের স্বার্থসিদ্ধি নয়। জনগণের জীবনকে সুন্দর সুখী করে তোলার পথে যে সব বাধা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে সে সব কিছুকে চূর্ণ করে প্রগতির পথ রচনাই আমাদের কাম্য। বহুকাল ধরে অগণিত মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদের আত্মাহুতি দানের মহিমায় ভাস্বর এই বিপ্লবের পথ। তার লক্ষ্য সমস্ত জনগণের মুক্তি।"

জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে কংগ্রেসের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েও তার সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতাকে তুলে ধরার কিছুটা প্রয়াস পেয়েছিলাম। লিখেছিলাম : "অহিংস পন্থায় আসতে পারে না পূর্ণ স্বাধীনতা। সে পথে বড় জোর ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস মিলতে পারে। কিন্তু তার দ্বারা জনগণের জীবনের সমস্যার সমাধান হবে না। উপরন্তু কংগ্রেসের পিছনে পরিচালিকা শক্তি হিসাবে রয়েছে বণিক শ্রেণীর স্বার্থ। তারা চায় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস। পূর্ণ স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাদের প্রকৃত উৎসাহ নেই। জনগণের মোহনিদ্রা ভাঙ্গাবার জন্যও কোন আগ্রহ নেই তাদের। মুক্তি-সংগ্রাম যখন বণিক শ্রেণীর স্বার্থের গণ্ডি অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হবে তখন তারা সর্বপ্রকারে বিরোধিতায় দ্বিধা করবে না। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের লড়াই চালাতে হবে যুগপৎ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে। সেই সংগ্রামে অহিংস সত্যাগ্রহের সম্ভাবনা খুবই কম। ওগো ভারতের মুক্তিকামী নরনারী! তাই তোমাদের জানাই সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে এগিয়ে চলার আহ্বান। আজকার দিনের গাঢ় তমিস্রা ভেদ করে এগিয়ে চলেছে স্বাধীনতার জয়যাত্রা। মৃত্যুর উত্তাল বিক্ষুব্ধ সাগর পার হয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়েছে আমাদের পথ। সেই যাত্রায় আমাদের সাথী হও তোমরা।"*

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইস্তাহারের খসড়া যে রূপ নেয় তাতে দলের তখনকার

* আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার রায়ের মুদ্রিত কপি থেকে অংশবিশেষের বঙ্গানুবাদ।

চিন্তার জোড়াতালি দেওয়া চেহারাটা প্রকট হয়ে ওঠে। মাস্টার মশায় শেষের দিকে কয়েকটি অনুচ্ছেদ যোগ করে দিলেন। তাতে গোয়েন্দা বিভাগ, রয়্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, অত্যাচারী দেশী ও ইউরোপীয় সরকারী কর্মচারী, গভর্ণমেন্টের খয়েরখাঁ প্রভৃতি সকলকে সতর্ক করে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তাদের কারুর পরিত্রাণ নেই। "প্রতিশোধ নেওয়ার মত শক্তির অস্তিত্ব দেশে এখনও আছে। তাদের কুকর্মের শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। সমস্ত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে প্রাণের বিনিময়ে। কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না।" এই অংশ যোগ করায় আমার আপত্তি থাকলেও তা টেঁকে না।

১৫ই তারিখ সন্ধ্যায় পূর্বনির্দিষ্ট গোপন আড্ডায় বার্তাবহেরা এসে মুদ্রিত ইস্তাহারের বাণ্ডিলগুলি পৌঁছে দিয়ে যায়। মোড়ক খুলে আমিও রোমাণ্টিক উত্তেজনা অনুভব করি বৈ কি! লাল ইস্তাহারের উপরের অংশের মাঝখানে উদীয়মান সূর্য, দুপাশে দুটি রিভলভার অগ্নিশিখা উদ্গীরণ করছে। সূর্যের ঠিক নীচে বড় বড় হরফে ছাপা "স্বাধীন ভারত।" এই নাম ও প্রতীক অনুশীলনের সেই প্রথম যুগ থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিভিন্ন গ্রুপের নেতাদের এক একটি দলকে এসে এগুলি নিয়ে যাওয়ার জন্য পর পর সময়সূচী বেঁধে দিয়েছি। যাতে এক দলের সঙ্গে অন্য দলের সাক্ষাৎ না ঘটে। সামরিক শৃঙ্খলায় ঘড়ির কাঁটা ধরেই তারা আসে, বাণ্ডিলগুলি নিয়ে যায়। যতক্ষণ কাজ শেষ না হয় ততক্ষণ বসে থাকতে হবে। এতেও বিপদের আশঙ্কা কম নয়। কোন কারণে যদি পুলিস টের পেয়ে থাকে তাহলে হাতেনাতে ধরা পড়তে হবে। যারা বাণ্ডিল নিয়ে যায় তারাও বিপদের সম্ভাবনা মাথায় নিয়েই কাজ করে।

গ্রুপের নেতারা ঐগুলি ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দেবে। তারা শহরের বিভিন্ন স্থানে দেয়ালে দেয়ালে টাঙিয়ে দেবে আগামী কাল রাত্রে। মফস্বলের জেলাগুলিতে লোক মারফত পাঠানো হচ্ছে। মাস্টার মশায়ের খাস কুরিয়ার (বার্তাবহ) বলে যে সংবাদপত্রের অফিসগুলিতেও পাঠানো হবে ডাকযোগে। এই গোটা ব্যবস্থার কোথাও যদি এতটুকু ত্রুটি ঘটে তাহলে সব কিছু বানচাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। পূর্বাহ্নে যদি কেউ অসাবধানতার দরুন পুলিসের কবলে পড়ে যায় তাহলে ১৬ই রাত্রে অনেকের হাতেনাতে ধরা পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আমাদের উপর দায়িত্ব শুধু সমগ্র আয়োজনের এক ভগ্নাংশের। সেটুকু যাতে নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করি।

প্রায় পুরো দুটো দিন কাটে উৎকণ্ঠায়। ১৭ই তারিখের সকালে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির পৃষ্ঠা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখি। সেখানে ইস্তাহারের উল্লেখ নেই। স্টেটসম্যান পত্রিকা সংক্ষেপে ইস্তাহার প্রাপ্তির খবর দিয়ে মন্তব্য করেছে, "আমরা সন্ত্রাসবাদীদের প্রচারকার্যের সুবিধা করে দিতে চাই না। তাই তাদের বক্তব্যের মর্ম প্রকাশে বিরত থাকছি।" চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে সান্ধ্য দৈনিক স্টার অফ ইণ্ডিয়া। প্রথম পৃষ্ঠার প্রায় সবখানি জায়গা জুড়ে মোটা মোটা হরফে শিরোনামা দিয়েছে "Terrorists Call for Massacre" অর্থাৎ গণহত্যার জন্য সন্ত্রাসবাদীদের আহ্বান। আমাদের বক্তব্যের যে অংশে সরকারী খয়েরখাঁ, গোয়েন্দা বিভাগ ইত্যাদিকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছিল সেইটুকুকে বিশদ ভাবে প্রকাশ করেছে। অন্য অংশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, বিকৃত।

ধীরে ধীরে খবর আসতে থাকে ইস্তাহারের বাণ্ডিল ও মাস্টার মশায়ের পত্র সহ একজন বার্তাবহ শিয়ালদ স্টেশনে ধরা পড়ে ১৪ই রাত্রিতে। পুলিস এত ব্যাপক আয়োজনের কথা ভাবতে পারে নি। তাই ১৬ই রাত্রে বেড়াজাল ফেলার কোন চেষ্টা করে নি তারা। কিন্তু মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতায় দেয়ালে ইস্তাহার টাঙাতে যেয়ে দুই একজন ধরা পড়েছে। এর পর থেকেই গোয়েন্দা বিভাগ অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠে। স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ঐ বিভাগের কঠোর সমালোচনা সহ মন্তব্য করে, "সন্ত্রাসবাদীদের সংগঠন এখনও মজবুত রয়ে গিয়েছে। নতুবা একই রাত্রে সারা বাংলায় বে-আইনী ইস্তাহার বিতরণ সম্ভব হত না। অবিলম্বে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া চাই।" নানা জায়গা থেকে বন্ধুদের গ্রেপ্তার হওয়ার খবর আসছে। সুরেন দাশগুপ্তকেও একদিন পুলিস ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায়। ছোঁ মারাই বটে। সুরেন প্রেসিডেন্সী জেল থেকে সুড়ঙ্গপথে যে খবর পাঠায় তাতে বোঝা যায় পুলিসের খরদৃষ্টি কত প্রখর হয়ে উঠেছে। সুরেনকে সন্ধ্যার পর কলেজ স্কোয়ার এবং মির্জাপুর স্ট্রীটের মোড়ে কয়েকজন সাদা পোশাকের গোয়েন্দাপুলিস হঠাৎ পিছন থেকে জাপটে ধরে বলে, "আপনাকে বি-সি-এল-এতে অ্যারেস্ট করা হল।" তারপর নিকটে অপেক্ষমান পুলিস-ভ্যানে তুলে নিয়ে যায়। পুলিসের চর কতরকম ছদ্মবেশে ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করেছিল!

আমার উপরে নেতাদের নির্দেশ আসে আত্মগোপন করতে হবে। যাঁদের নামে গ্রেপ্তারী পারোয়ানা আছে তাঁরা দিনে পথে বার হন না। তাঁরা হলেন

পুরোপুরি নিশাচর। আমাকে তা হলে চলবে না, গোপন কেন্দ্রের সঙ্গে সংগঠনের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাই চলাফেরা করি আধা-আত্মগোপন-কারী অবস্থায়। আস্তানা বদলাই। নতুন আস্তানার হদিস জানবে শুধু দুই একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহকারী এবং গোপন কেন্দ্রের বার্তাবহ। দিনের বেলাতে বড় বড় রাজপথ ও মোড়গুলিকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলি। মোড়গুলিতেই সাদা পোশাকে বা ছদ্মবেশে গুপ্তচর মোতায়েন থাকে। মধ্য কলকাতা সংগঠনের দায়িত্বও এসে পড়েছে আমার উপরে। সরকারী 'ছায়া'কে এড়িয়ে চলার জন্য উত্তর ও মধ্য কলকাতার অলিগলি চিনে চষে ফেলি।

সুরেন পাশে না থাকায় বড় নিঃসঙ্গ বোধ করি। এতদিন দুজনে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখে কাজ করেছি। অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছি। কিছুদিন থেকে নেতাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিচ্ছিল। তখন একে অন্যের সমর্থনে দাঁড়িয়েছি। এখন পরিস্থিতি যখন আরো জটিল হয়ে উঠেছে তখন একলা পড়ে গেলাম। নেতারা ক্রমে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের কর্মসূচীর দিকে ঝুঁকে পড়ছেন টের পাই। সংবাদপত্রে দেখি রাজসাহীতে জেল সুপারিন্টেডেন্ট মিঃ লিউকের প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছে। লিউক আহত হলেও প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। ঘটনাস্থলেই একজন ধরা পড়েছে। এই চেষ্টায় লিপ্ত ছিল সন্দেহে পুলিস অন্য যাদের সন্ধান করছে তাদের একজনের নাম প্রকাশিত হয়েছে। তাকে আমি চিনি। সত্য চক্রবর্তী রাজসাহী কলেজে ভর্তি হয় আমি চলে আসার পরে। কিন্তু সে যার 'রিক্রুট,' সেই শচীন্দ্র চক্রবর্তী ছিল আমার অত্যন্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত সহকর্মীদের একজন। সুতরাং এ কাজ যে আমাদের সমিতির স্থানীয় শাখাই করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কলকাতার নির্দেশ ছাড়া তারা নিশ্চয়ই এ কাজে হাত দেয় নি।

দিন কয়েক পরে উত্তরবঙ্গের একজন সহকর্মী সত্যকে আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে যায়। তার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। সত্যর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনার পর আর সন্দেহ থাকে না যে, সমিতির উচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশেই এই কাজটি সংঘটিত হয়েছে। তখন রাজসাহী জেলে সমস্ত ধরনের রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অমানুষিক উৎপীড়ন চলেছে। বিপ্লবী বন্দীরা সে উৎপীড়নের প্রধান শিকার। জেল থেকে বন্ধুরা কোনমতে বাইরে খবর পাঠিয়ে এর প্রতিকারের উপায় করতে বলে। তাই কলকাতা থেকে নির্দেশ যায়।

বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে কাজটি অসঙ্গত হয় নি ঠিকই। কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন ওঠে যে, এর ফলে কি বড় ধরনের অ্যাকশনের পরিকল্পনাকে বানচাল করে দেওয়া হবে না? একে ত ইস্তাহার বিতরণের পর থেকে পুলিস হন্যে হয়ে উঠেছে। এখন এই ঘটনার সূত্র ধরে তাদের হিংস্র থাবা আরো প্রসারিত হবে। অথচ প্রশ্নকে উপরতলায় পৌঁছে দেওয়ার উপায় নেই। মাস্টার মশায় এবং জিতেনবাবু দুজনে এমনিতে খুব সাদাসিধে অমায়িক মানুষ বটে। তবে তাঁরা যে যুগে যে ধরনে শৃঙ্খলা শিক্ষালাভ করেছেন তার মাপকাঠিতে নেতাদের কাজের সমালোচনা দূরে থাকুক, সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাকেও ভাল চোখে দেখেন না। অগত্যা কর্তব্যের খাতিরে রুটিনমাফিক কাজ করে যাই। আর প্রতীক্ষা করি কবে আমার জন্যও এসে যাবে রাজঅতিথি হওয়ায় আহ্বান!

১৯৩২ সাল শেষ হতে চলেছে। বড়দিনে ভাইসরয়ের কলকাতা আগমনের পূর্বাহ্ণে পুলিস যে বেড়াজাল ফেলে তার থাবা এড়িয়ে টিকে যেতে পেরেছি। এবার যারা ধরা পড়েছে তাদের বেশির ভাগই আমাদের দলের কর্মী। আমার অধীনস্থ গ্রুপগুলির দুই একটির ভারপ্রাপ্তরাও আছে তার মধ্যে। বুঝতে পারি আমার দিনও ঘনিয়ে এসেছে। এখন পুলিসের সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় যে কয়দিন টিকতে পারি। ডিসেম্বর শেষ হওয়ার আগেই পুলিস আবার নতুন করে হানা দেয়। আমাদের কয়েকটি গোপন আড্ডা আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে তারা। অস্ত্রশস্ত্র সমেত কয়েকজন ধরা পড়েছে। আমার আস্তানা বদলাবার কথা চিন্তা করছি, কিন্তু মাস্টার মশায়দের সঙ্গে যোগাযোগ করা চাই তার আগে। নতুবা গোপন কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয়ে যাবে। কেন্দ্রের বার্তাবহের অপেক্ষায় থাকি। দু'দিন হল তার দেখা নেই। তবে কি সেও জালে পড়েছে? উত্তর পেলাম ১৯৩৩ সালের ২রা জানুয়ারি শেষ রাত্রে। দরজায় ঘন ঘন করাঘাতের শব্দ শুনে বিছানা ছেড়ে উঠতে হল। দরজা খুলতেই বুকের উপরে উদ্যত রিভলভার। বন্দীশালার ডাক এসে পৌঁছেছে।

সদলবলে পুলিস অফিসার ঘরে ঢোকে। বাক্স বিছানা খানাতল্লাশে আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায় না। আই. বি-র কর্মচারীটি বলে: "আমরা আপনাকেই চাই। আপনার উপর বি. সি. এল-এ অনুসারে আটকের আদেশ আছে।" সেপাইসান্ত্রী পরিবেষ্টিত হয়ে প্রিজন ভ্যানে উঠি। জালের ফাঁক দিয়ে বাইরের জগৎটাকে শেষবারের মত উৎসুক দুই চোখ মেলে দেখে নিই।

চেনা পথঘাট, পরিচিত দিকচিহ্ন, গাছপালা সবকিছুকে পিছনে ফেলে চলেছি। বিদায় নিই কয়েক বৎসরের কর্মকেন্দ্র কলকাতার কাছে। বিদায় উন্মুক্ত আকাশ বাতাস! শীতের ভোরে রাজপথে লোকচলাচল বিরল। তবু মনে মনে সেই অপরিচিত মানুষগুলির উদ্দেশে বলি "বিদায়! আমার লাঞ্ছিত দেশের বঞ্চিত নরনারী! আবার কবে, কতদিন পরে তোমাদের মধ্যে ফিরে আসব কে জানে! ফিরব কিনা তাই বা কে বলতে পারে! আমাদের সংগ্রাম ত শেষ হয় নি। লৌহকারার অন্তরালেও চলেছে বিপ্লবীদের প্রতিরোধ। নতুন রণক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চলেছি।"

কারার ঐ লৌহকপাট

প্রেসিডেন্সী জেল গেটে এসে পৌঁছালাম ৩রা জানুয়ারি সন্ধ্যায়। সারাটা দিন কেটেছে লর্ডসিংহ রোডের হাজতে। ডেটিনিউ হিসাবে গ্রেপ্তার হয়েছি বলেই সম্ভবত সেখানে অভ্যর্থনাটা সাংঘাতিক রকমের হয় নি। জেল গেটের খাতায় নাম, বাপের নাম ইত্যাদি বিবরণ লিখে গোরা সার্জেণ্ট শরীর তল্লাশী করে ভিতরে নিয়ে যায়। পিছনে লোহার অতিকায় ফটকটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। তখন কি জানি যে মুক্তিলাভ করব সেই ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে? দীর্ঘ তের বৎসরের একটানা বন্দীজীবন নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামেরই ইতিহাস।

সংগ্রাম চলেছে বিদেশী রাজশক্তির নির্মম পীড়নযন্ত্রের সঙ্গে, নানাভাবে, প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে। চলেছে জেলখানার বিরামহীন রূঢ় রিক্ততায় ভরা পরিবেশের সঙ্গে। দ্বন্দ্ব চলেছে নিজের অন্তরে। সংঘাত বেধেছে অতীতের পিছুটান আর ভবিষ্যতের পথ-সন্ধানের ভিতরে। কত ক্ষতচিহ্নে চিহ্নিত সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি! কত বেদনার, কত রুদ্ধ আবেগের নিঃশব্দ সমাধিলাভের কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে তার পাতায় পাতায়। রয়েছে কত জিজ্ঞাসার, মনের বিকাশে কত অবিস্মরণীয় দিকচিহ্নের স্বাক্ষর। সন্ধানের শেষে সম্মুখে ভাস্বর হয়ে উঠেছে মুক্তির নবদিগন্ত। সেই কথাই লিখতে বসেছি। জেলের অভিজ্ঞতার খুঁটিনাটি বিবরণ নয়, বন্দী-জীবনের পটভূমিতে বন্দী মনের কাহিনী।

আমার সঙ্গী ছিল আরো তিনজন। লর্ডসিংহ রোডের হাজত থেকে একই প্রিজন ভ্যানে এসেছি। সুশীতল রায়চৌধুরী, বিজয় মোদক; অপর জনের নাম মনে নেই। এঁরা স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদকের হত্যা প্রচেষ্টার মামলায় আসামী হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রমাণ অভাবে ম্যাজিস্ট্রেট মুক্তি দিলেও পুলিস সঙ্গে সঙ্গে বিনা বিচারে আটক আইনে গ্রেপ্তার করেছে। ডেপুটি জেলার জিজ্ঞাসা করে 'কে কোন্ কিচেনে যাবেন'? জেলের ভিতরে অনুশীলন এবং যুগান্তর দলের বন্দীদের হেঁসেল যে আলাদা অর্থাৎ খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা

পৃথক সে কথা বাইরেই শুনেছিলাম। থার্ড কিচেনও একটা আছে। তার সভ্য হল দলছুট এবং কমিউনিস্টভাবাপন্ন বন্দীরা। ডেপুটি জেলারের প্রশ্নের জবাব দিই নি। ভিতরের অবস্থা সম্বন্ধে বিশদ ধারণা নেই। তাছাড়া তখন পর্যন্ত নিজেকে খোলাখুলিভাবে অনুশীলনের সভ্য বলে পরিচয় দিতে অভ্যস্ত হইনি। জেলের অন্দরমহলে পা দিতেই পুরানো বন্দীরা এগিয়ে এলেন নতুন অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে। আমাদের সবারই পরিচিত লোক রয়েছে। তাঁরাই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। আমি গেলাম অনুশীলন কিচেনে এবং সুশীতল বাবুরা যুগান্তর কিচেনে। আশা করেছিলাম সুরেন দাশগুপ্তকে এখানে দেখতে পাব। নিরাশ হতে হল। পক্ষকাল পূর্বে একদল বন্দীর সঙ্গে তাকে পাঠানো হয়েছে দেউলীর বন্দীশিবিরে। অনুশীলনের খ্যাতনামা নেতাদের কেউ নেই।

প্রেসিডেন্সী জেলের অবস্থাটা 'ট্রানজিট ক্যাম্পে'র মতন। ডেটিনিউদের এখান থেকে বিভিন্ন বন্দিশিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়। আবার অন্য শিবির থেকে আগত কাউকে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। প্রবীণদের অনেকে আছেন, যাঁদের জীবনের বড় অংশটাই অতিবাহিত হয়েছে লৌহকারার অন্তরালে। তাঁদের সঙ্গে চেনাজানার পালা শেষ হতে না হতে ওয়ার্ডের দরজায় তালা পড়ে। মোটা লোহার গরাদে দেওয়া দরজা-জানালা ঘেরা ব্যারাকে রাত্রের মত বন্ধ হয়ে থাকার অভিজ্ঞতা ত ইতিপূর্বেই হয়েছে। দমদম স্পেশাল জেল থেকে মুক্তিলাভ করেছি মাত্র পাঁচ মাস আগে।

ডেটিনিউ জীবনের প্রথম কিছুদিন একটা স্বপ্নের ঘোরের মতই কেটে যায়। বিভিন্ন দলের হেঁসেল আলাদা হলেও এখানে সুন্দর একটা প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে উঠেছে। এতগুলি গৃহবিরাগী আত্মভোলা মানুষের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। অপরিচিতকে কাছে টেনে নেওয়ার ক্ষমতা তাদের অপরিসীম। একেবারে গোড়ার কয়েকটি দিন কাটাই তীর্থযাত্রীর মনোভাব নিয়ে। এই ত আমাদের তীর্থ। বহু সংগ্রামের আগুনে পোড়খাওয়া কত অভিজ্ঞ সৈনিক রয়েছেন এখানে। তাঁদেরই একজন হয়ে বাস করছি। তাঁদের মুখে শুনি পুরানো দিনের কথা এই জেলের চার দেওয়ালের মধ্যে রয়েছে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের স্মৃতিবিজড়িত কত স্থান। কুখ্যাত চুয়াল্লিশ ডিগ্রী। হাসপাতালে প্রবেশ পথের ঠিক সামনেই সেই জায়গাটি—যেখানে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাই বীর কানাইলালের গুলিতে নিহত হয়েছিল। প্রবীণেরা বলেন, দেশ স্বাধীন হলে

এই সব জায়গায় স্মারকস্তম্ভ স্থাপিত হবে। নতুন পরিবেশে নতুন অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে করতে মাসখানেক কোথা দিয়ে কাটে টের পাই না।

দণ্ডিত বন্দীদের তুলনায় ডেটিনিউরা কিছু কিছু সুবিধা বেশি পেয়ে থাকে। দৈনিক আহার্য ভাতা, মাসিক পকেট খরচ। নিত্য ব্যবহার্য জিনিস ছাড়া বই পত্রিকা কেনা চলে। অবশ্য যে সব বই আই. বি. কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করে শুধু সেইগুলি আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়। দিনের বেলাটা সমস্ত রাজবন্দী অবাধে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। জেল কর্তৃপক্ষ যে গণ্ডিটা নির্দেশ করে দিয়েছে তার মধ্যে অনেকটা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করি। একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অভিনয়, নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন আমাদের গুণী বন্ধুরা। কিন্তু যত দিন যায় ততই সময়ের বোঝা ভারী হয়ে উঠতে থাকে। সেই একই রকমের বিস্বাদ দিনগুলি একটির সঙ্গে অপরটির কোন তফাত নেই। সজীব মন ও প্রথম যৌবনের বুকভরা উৎসাহ কাজের জন্য উদ্‌গ্রীব। অথচ নিষ্ক্রিয়তার গ্লানিতে তিলে তিলে হবে তার অপচয়? ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি বাইরের কোন অসমাপ্ত কাজ শেষ করায় উদ্যোগী হয়েছি। ঘুম ভেঙ্গে গেলে বন্দী-দশার সত্যটা রূঢ়ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সেদিন সারাটা বেলা মন বিষণ্ণ হয়ে থাকে। যে পরিকল্পনার রূপায়ণে আমরা সবাই ব্রতী হয়েছিলাম তার কতটুকু করতে পেরেছি?

বাইরের অবস্থা জানার জন্য ছটফট করি। সুড়ঙ্গপথের যোগাযোগ-কেন্দ্রটিও সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। যেটুকু খবর পাওয়া যায় তা সংবাদপত্রের মারফতে। সংবাদপত্র বলতে স্টেটসম্যান। জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির জেলখানায় প্রবেশের অধিকার নেই। ধরপাকড়ের খবর কিছু কিছু জানতে পারি ঐ পত্রিকাটিরই মারফত। মাস্টার মশায় ধরা পড়ে গিয়েছেন। জিতেন বাবু গ্রেপ্তার হয়েছেন তার ২।৩ দিন আগে। মাস্টার মশায়ের আস্তানা তল্লাশী করে পুলিস অনেকগুলি পরিচয়পত্র আর সাঙ্কেতিক লিপিতে লেখা একটি তালিকা হস্তগত করেছে। পরিচয়পত্রগুলি দলের একজন সভ্য কর্তৃক অন্য সভ্য বা সমর্থকের নামে লেখা। সংগঠনের ছেড়া সূত্রগুলিকে জোড়া দেওয়ার জন্যই সেগুলির প্রয়োজন হয়েছিল। মাস্টারমশায় দরকার মত সেগুলিকে বার্তাবহ মারফত বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে দিতেন।

সাঙ্কেতিক লিপির মর্ম উদ্ধার করে পুলিস বিভিন্ন প্রদেশে অনুশীলন সমিতির সভ্য, সমর্থক ও সহযোগীদের নাম-ঠিকানা পেয়েছে। তার ভিত্তিতে চলেছে সারা দেশ জুড়ে তল্লাশী এবং গ্রেপ্তার। বর্মা, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, গুজরাট, বিহার আর বাংলায়—যেখানে যেখানে সমিতির শাখা-প্রশাখার বা যোগসূত্রের অস্তিত্ব ছিল তার উপরে হেনেছে প্রচণ্ড আঘাত। যেটুকু বিবরণ পাই তাতেই সন্দেহ দৃঢ়মূল হয় যে, মাস্টার মশায় এবং জিতেন বাবুর গ্রেপ্তারের মূলে নিশ্চয় দলেরই কোন বিশ্বাসঘাতকের হাত আছে।

এঁদের দুজনের আস্তানা ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত। যারা আগে ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে কি কেউ পুলিস হাজতে উৎপীড়ন সইতে না পেরে স্বীকারোক্তি করেছে? অথবা কোন গুপ্তচর সমর্থ হয়েছে আমাদের গোপন সংগঠনের মর্মস্থলে অনুপ্রবেশ করতে? তবে কি অভ্যুত্থানের বিরাট পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি হবে বিরাট ধ্বংসস্তূপে? এক এক সময় মন রুদ্ধ আক্রোশে চঞ্চল হয়ে ওঠে। আবার আপনিই শান্ত হয়ে যায়। কি ফল আক্রোশে? হাত পা বাঁধা। সত্যিকারের লৌহশৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে নি এখনও, তবে পাঁচিলঘেরা এই ছোট্ট জগৎটুকুই ত হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের জগৎ। ওর বাইরে রয়েছে যে পৃথিবী তা যেন দূরবর্তী কোন একটি গ্রহ।

অগত্যা ঐ সঙ্কীর্ণ গণ্ডিঘেরা দুনিয়ার বৈচিত্র্যহীন দিনগুলির জন্য কাজের একটা রুটিন করে নিই। এখানে অধ্যয়নের জন্য আছে প্রচুর অবকাশ। রাজনীতির বই পাওয়া না গেলেও সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতির বই যথেষ্ট পাওয়া যায়। অনেকখানি সময় নিয়োজিত করি অধ্যয়নে আর অধ্যাপনায়। গল্প-আলোচনা ত আছেই। শরীরকে কর্মঠ রাখার জন্য করি নিয়মিত ব্যায়াম। সন্ধ্যায় ওয়ার্ডের দরজায় তালাপড়ার পরও একটা ব্যারাকের মত ঘরে ১৭।১৮ জন একত্রে থাকি। নিঃসঙ্গ বোধ করি না। বরং এক এক সময় যখন একলা থাকার ইচ্ছা প্রবল হয় তখন অতিষ্ঠ লাগে। ঘুমিয়ে পড়ার আগে কিছুক্ষণ গরাদে দেওয়া জানালার ধারে চেয়ার নিয়ে বসে থাকি। মাঝখানের মাঠটি চাঁদের আলোয় ঝলমল করে। অশ্বত্থ গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না এসে পড়ায় নীচেটায় আলোছায়ার বিচিত্র সমাবেশ। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় অথচ মধ্যে আছে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। এক একদিন অনেকক্ষণ ঘুম আসে না চোখে। তখন কত রকমের চিন্তা মাথায় এসে ভর করে। যে অধ্যায়টাকে

পিছনে ফেলে এসেছি তার কত স্মৃতির টুকরো জীবন্ত হয়ে ওঠে। হিমাদ্রি, নির্মল, এরা সবাই কোথায়, কি করছে কে জানে? এক একদিন মনে পড়ে শুধু মায়ের কথা। হয়ত তিনি আমারই মত বিনিদ্র চোখে ঘরের বারান্দায় বসে আলোয়ভরা উঠোনের দিকে চেয়ে রয়েছেন! তাঁর উদ্দেশে বলি, "অনেক কষ্ট দিয়েছি তোমাকে মাগো! কতদিনের কত ছোটখাটো অপরাধের রেশ আজ বুকে বিঁধছে।"

মা একদিন জেল গেটে এসে ইণ্টারভিউ করে গিয়েছেন। কোন অনুযোগ করেন নি। তবু তাঁর চাপা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজটাকে ভুলতে পারি না। পরাধীন দেশে মুক্তিকামী ছেলেদের মায়েদেরই ত দাম দিতে হয় সবচেয়ে বেশি। মাঝে মাঝে এমনি নিদ্রাহীন চোখে বাইরের দিকে চেয়ে বসে থাকাটা আমার একটা বিলাসে পরিণত হয়। অন্ধকার রাতের নিস্তব্ধতাকে উপভোগ করি। সেই সময়টা নিজের সঙ্গে কথা কই। প্রত্যহের স্পর্শে ম্লান এই জেল-জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার তুচ্ছ উপাদানগুলিকে নাড়াচাড়া করি। সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করি আপন মনে। মানুষের সাদা এবং কালো, দুটো দিকেরই সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় এখানে যেমনটি হয় আর কোথাও বোধ হয় তেমনটি সম্ভব নয়।

প্রেসিডেন্সী জেল দাগী কয়েদীদের জন্য তৈরি। কড়াকড়ির জন্য নামকরা। অথচ সেই বজ্র আঁটুনির আড়ালেই ফস্কা গেরো। দুর্নীতির ছড়াছড়ি। দুর্নীতিতে উৎসাহ দিয়ে থাকেন তাঁরাই যাঁরা নীতির রক্ষক। আমাদের রান্না-বান্না পরিচর্যার কাজ করার জন্য সাধারণ কয়েদীদের মধ্য থেকে কিছু লোক দেওয়া হয়। জেলখানার পরিভাষায় সাধারণ কয়েদীদের নাম হল "ফালতু"। মানুষ হিসাবে তাদের কোন দামই যেন নেই। খাটো জাঙ্গিয়া কুর্তা পরা, কোমরে গামছা, মাথায় টুপি, কুর্তার বুকে অ্যালুমিনিয়ামের চাকতি আঁটা। চাকতিতে খোদাই করা আছে কয়েদীর নাম, দণ্ডবিধির যে ধারায় সাজা হয়েছে, দণ্ডের তারিখ এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ। জেলকোডের নিয়মকানুন এমনভাবে তৈরি যে, প্রতি মুহূর্তে মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা ঘটে। একবার যে কয়েদী হয়ে ঢোকে সে পাকা অপরাধীতে পরিণত না হয়ে পারে না। একটুখানি সহানুভূতি দিয়ে দেখলে এইসব 'ফালতু'দের মধ্যেও মানুষের সাদা দিকটা খুঁজে পাওয়া যায়।

আমাদের পরিচর্যার জন্য যাদের দেওয়া হয় তাদের কারুর সাজা হয়েছে চুরির, কারুর পকেটমারার এবং কারুর বা "চীটিং"এর অপরাধে। অথচ এরাই আমাদের সেবা করে অত্যন্ত মমতার সঙ্গে। "স্বদেশীওয়ালা" বাবুদের তারা শ্রদ্ধা করে। কিছুদিন থাকার পর এরাই অত্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছে। জেলকোডে নির্দেশিত শাস্তির ঝুঁকি মাথায় নিয়ে আমাদের বে-আইনী কাজে, চিঠিপত্র গোপনে চালাচালিতে সাহায্য করেছে। ওদের জীবনের কথা শুনতে চেয়েছি। সহজে বলতে চায় না। অনুকম্পার ভিখারী নয় তারা। কিন্তু একটুখানি দরদের সঙ্গে ব্যবহার করে দেখেছি, শত লাঞ্ছনা আর অধঃপতনের গ্লানি সত্ত্বেও এদের মধ্য থেকে মানবতার দীপশিখা একেবারে নিভে যায় নি। যেমন সাধারণ কয়েদীদের সাদা দিকটা দেখেছি তেমনি অনেক সময় নজরে পড়েছে রাজবন্দীদের কালো দিকগুলি। সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ জীবন মানুষকে বড়ো ছোট করে দিতে চায়। অনেক সময় নিতান্ত তুচ্ছ জিনিস নিয়ে সহবন্দীদের ভিতর ক্ষুদ্রতার মনোবৃত্তি স্থূলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। চায়ের পেয়ালায় তুফান ওঠে। তুফান কেটে গেলে অবশ্য বুঝি যে অস্বাভাবিক পরিবেশে ছোট জিনিসই অতিরঞ্জিত হয়ে দেখা দেয়। ওরই পাশাপাশি প্রবীণদের অনেককে দেখেছি সদা প্রশান্ত, অবিচলিত। প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ তাঁদের আচরণকে মলিন করতে সমর্থ হয় না।

ওঁদেরই একজন আমাকে বলেন : "একটুখানি দরদ, একটু ভালবাসা দিয়ে বিচার করলে দেখবে এইসব ছোটখাটো কুশ্রীতার পরশ কর্পূরের মতনই উবে গিয়েছে।" সঙ্কল্প করি যে, কোন মানুষকেই আমার নিজের প্রয়োজনে আমি ব্যথা দেব না। যত আঘাত আসুক, সব সয়ে যাব। মানুষকে ভালবেসেই ত নীলকণ্ঠ হওয়ার সাধনায় বেদনার পাত্রখানা স্বেচ্ছায় হাতে তুলে নিয়েছি!

রাজবন্দীদের অনেকেই দু-তিন বৎসর আটক রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে নানাধরনের চিন্তা দেখা দিয়েছে। সমস্ত দলেরই ভিতরে পুরাতন এবং নতুনের সংঘাত মাথা তুলেছে। যারা নতুনের পক্ষপাতী তাদের ঝোঁকটা এখন সুস্পষ্টভাবে সমাজতন্ত্রের অভিমুখে। মোড় পরিবর্তনের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তবে নির্দিষ্ট রূপ এখনও নেয় নি। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদ সম্বন্ধে বইপত্রের জেলে প্রবেশ নিষেধ। যারা সেই দিকে চিন্তা অথবা পড়াশুনা করছে তাদের প্রধান সম্বল হ্যারল্ড ল্যাস্কি; বার্ণার্ড শ; জি.

ডি. এইচ. কোল ; এইচ. জি, ওয়েল্‌স প্রমুখ ব্রিটিশ মনীষীদের লেখা বই। তবু সেগুলিকে অবলম্বন করেই এগিয়ে চলেছে সন্ত্রাসবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের প্রক্রিয়া। আমরা যারা বাইরেই সাম্যবাদী সাহিত্যের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত ছিলাম, তারা ঐ বইগুলি থেকে আমাদের অনুকূলে কাজ করার মত যুক্তিগুলি বেছে নিই।

রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি" পড়েছি প্রেসিডেন্সী জেলে বসে। অবশ্য বইটির কিছু অংশ তখন সেন্সর কর্তৃপক্ষের কাঁচিতে কাটা। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণের পাশাপাশি আর একটি বিপরীতমুখী ঝোঁকও মাথা তুলেছে দেখতে পাই। এই ঝোঁকের প্রবক্তারা সমাজতন্ত্রকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে রাজী আছে বটে তবে শ্রেণীদ্বন্দ্বের তত্ত্বকে বর্জন করে। তারা চায় কমিউনিজম এবং ফ্যাসিজমের মধ্যে একটা সমন্বয়। বাইরে থাকতে ডঃ ভূপেন দত্তের মুখে শুনেছিলাম যে, সুভাষবাবু ঐ মতের পক্ষপাতী। সাপ্তাহিক আত্মশক্তি পত্রিকায় মুসোলিনী ও হিটলারকে লৌহমানব এবং যৌবনশক্তির সংগঠক রূপে চিত্রিত করে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে এসে দেখছি যে, শুধু সুভাষ-সমর্থকদের মধ্যেই নয়, সব দলেরই ভিতরে কিছু কিছু লোক এই দিকে ঝুঁকেছে। তাদের তরফ থেকে "ন্যাশানাল সোশিয়ালিজম"কে আদর্শরূপে খাড়া করার চেষ্টা হচ্ছে। অবশ্য এই চেষ্টা বেশির ভাগ বন্দীর মনে রেখাপাত করতে সমর্থ হয় নি। যারা নতুনভাবে মত ও পথের কথা চিন্তা করছে তারা ঐ ঝোঁককে বর্জন করেছে। তবু, তা যে তীব্র মত-সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিভিন্ন দলের মধ্যে যারা সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকছে তাদের ভিতরে একটা মনোগত পারস্পরিক নৈকট্যবোধ গড়ে উঠছে। মুখে মুখে রটে যায় অমুক বন্দী-শিবিরে অমুক দলের অমুক সভ্য কমিউনিস্টভাবাপন্ন। এই নৈকট্যবোধ আগামী দিনে কি রূপ নেবে তা তখনও কেউ জানে না। আমাদের দলের সহবন্দীরা, যারা সাম্যবাদী মতাদর্শের দিকে ঝুঁকছে, তারা তখন পর্যন্ত ভাবে যে অনুশীলন সমিতিকেই বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রী দলে রূপান্তরিত করা যাবে। তারা চায় দাদাদের চিরস্থায়ী নেতৃত্বের বদলে সাধারণ কর্মীদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। নতুন ও পুরাতনের সংঘাতটা যে সব সময় বয়সের হিসাবের সঙ্গে মেলে তাও নয়। প্রবীণ তথা বয়স্কদের কারুর কারুর মনে নতুনকে গ্রহণ করার মত

সজীবতা ও সাহসিকতার পরিচয় পাই। আবার তরুণদের মধ্যে অনেকে রয়েছে যারা কট্টর পরিবর্তন-বিরোধী, তারা বরাবর অনড় হয়ে থাকবে এমন কথাও বলা চলে না।

কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে অবজ্ঞা এবং বিদ্রূপ করতে দেখি কিছুসংখ্যককে। এর জন্য দায়ী কিছুটা পরিমাণে তাদের নিজেদের ধারণার অস্পষ্টতা এবং জ্ঞানের স্বল্পতা। আমরা জিতেশদার উদার মনোভাবের ছায়ায় যতটা পড়াশুনার বা আলোচনার সুযোগ পেয়েছিলাম এদের অনেকেই তা পায় নি। আবার কিছু সংখ্যক হঠাৎ-বনে-যাওয়া কমিউনিস্টের আচরণও এর জন্য আংশিকভাবে দায়ী ছিল বৈকি। এই শেষোক্তেরা নিজেরাও বেশি পড়াশুনা করে নি। শিখেছে কয়েকটা বুলি আর নিজেদের নৈরাজ্যবাদী আচরণকে সমর্থন করার জন্য সেই বুলিগুলি আওড়ায়। ব্যতিক্রম ছিলেন থার্ড কিচেনের ভবানী সেন। তিনি সাম্যবাদ সম্বন্ধে ক্লাস নিতেন। আমি আসার মাসখানেক পরেই ভবানীবাবু দেউলী শিবিরে স্থানান্তরিত হয়ে চলে যান। ঐটুকু সময়ের মধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে, তিনি নিজের পাণ্ডিত্য এবং আচরণের জন্য সবার শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

এই উত্তরণকালীন পরিবেশে একজন বন্ধুর সাহচর্য আমার পক্ষে নানাদিক দিয়ে সহায়ক হয়েছিল।

দ্বিজেন রায় বৈজ্ঞানিক, আমার চেয়ে কয়েক বৎসরের বড়। তিনি ছিলেন আমাদের দলের বিস্ফোরক-বিশেষজ্ঞ। হাসিখুশি মানুষ, আচরণে অত্যন্ত ভদ্র, কিন্তু পার্টির মধ্যেকার পরিবর্তন-বিরোধীদের ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ। আমাকে সমমতাবলম্বী জেনেই একদিন আচমকা জিজ্ঞাসা করেন: "আপনি কি ভারতের বিপ্লবে বিশ্বাস করেন?" করি বলাতে বলেন: "তাহলে মুখ বুঁজে রয়েছেন কেন? ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি কি চিন্তা করছেন সে কথা জোর গলায় প্রকাশ করার সময় এসে গিয়েছে।"

বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও আমাদের ভিতরে একটা আত্মিক সখ্য মঞ্জরিত হয়ে ওঠে। দ্বিজেনবাবুর সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক মন এবং জীবন সম্বন্ধে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আমার চিন্তাবিকাশের প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর সমর্থন পেয়ে খানিকটা সক্রিয় হয়ে উঠি। প্রবীণদের দিক থেকে বাধা পাই নি। আমি যে বাইরে দায়িত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত ছিলাম সে কথা তাঁরা

জানেন। গুঞ্জন ওঠে সেই কট্টর তরুণদের মধ্য থেকে। তবে ক্লাস নেওয়া ও আলোচনায় সরাসরি আপত্তি কেউ করে না। বিভিন্ন দলের যে সব কর্মী সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকছে তাদের উদ্যোগে সে বৎসর প্রেসিডেন্সী জেলে সমস্ত রাজবন্দী সম্মিলিতভাবে 'মে দিবস' উদ্‌যাপন করে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে। আমি ছিলাম প্রধান বক্তা। সুশীতলবাবু আবৃত্তি করেছিলেন "সাক্কো ভানজেত্তি" সম্বন্ধে একটি ইংরেজী কবিতা।

বাইরে থাকতে আমার মনের ভিতরে যে দুটো কুঠুরি গড়ে উঠেছিল তার অস্তিত্ব তখনও পুরোপুরি বিলুপ্ত হয় নি। এক পা বাড়িয়েছি ভবিষ্যতের দিকে। আর এক পা রয়ে গিয়েছে পিছনে ফেলে আসা অধ্যায়ে, অসমাপ্ত কাজের চিন্তায়। খবরের কাগজে দেখি যে, মাস্টারমশায়ের কাছে পাওয়া সাঙ্কেতিক লিপি উদ্ধার করে পুলিস সারা দেশ জুড়ে যাদের গ্রেপ্তার করেছে তাদের নিয়ে শীগগিরই একটা ষড়যন্ত্রের মামলা শুরু হবে। ইতিমধ্যেই মাস্টারমশায় সহ কয়েকজন বে-আইনীভাবে রিভলভার রাখার অপরাধে কয়েক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। সুরেন ধর চৌধুরী, বিমল ভট্টাচার্য, হেম ভট্টাচার্য, জ্যোতিষ মজুমদার। জিতেন গুপ্ত দণ্ডিত হয়েছেন বন্দিশিবির থেকে পলায়নের অপরাধে।

পুলিস যাদের গ্রেপ্তার করেছিল, সবাইকে মামলায় আসামীরূপে জড়িত করার মত সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। তাই অনেককে ম্যাজিস্ট্রেট প্রমাণাভাবে মুক্তি দিলেও পুনরায় ডেটিনিউ হিসাবে আটক করে। যারা প্রেসিডেন্সী জেলে আসে তাদের কাছে যতটা সম্ভব বিশদ তথ্য সংগ্রহ করি। ধ্বংসস্তূপটা বিরাট হলেও সংগঠন একেবারে ধসে যায় নি। এমন সময়ে প্রেসিডেন্সী জেলে আসেন পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত। বক্সা শিবিরের কমাণ্ডান্ট কোট্রাম সাহেবকে জুতো মারার অপরাধে তাঁর আঠার মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। দণ্ডশেষে আবার ডেটিনিউ।

পূর্ণানন্দবাবু দলের সর্বোচ্চ নেতাদের অন্যতম না হলেও এঁদের ঠিক পরের সারিতে তাঁর স্থান। অত্যন্ত দক্ষ সংগঠক ও দৃঢ়সঙ্কল্প মানুষ বলে পরিচিত। এতদিন যেসব বিপ্লবী নেতার সংস্পর্শে এসেছি তাঁদের বাইরেটা খুব শান্ত। পূর্ণানন্দবাবুকেই প্রথম দেখি যাঁর চেহারায় আচরণে চলনে কথাবার্তায় একটা শক্ত ব্যক্তিত্বের পরিচয় সুস্পষ্ট। তার স্বাক্ষর রয়েছে

কঠিন চোয়ালে, চিবুকে, শীর্ণ হলেও মজবুত দেহে, দৃঢ় পদক্ষেপে। মানুষটি বে-রসিক মোটেই নন। বরং ঠিক তার উল্টো—সদা কৌতুকপ্রিয়। কিন্তু এক নজরেই বোঝা যায় যে, এঁর মধ্যে একটা সামরিক মেজাজ চাপা আছে। কথাবার্তায় এঁর সামনে এতটুকু বে-সামাল হওয়া চলবে না। আলিপুর সেন্‌ট্রাল জেলে দণ্ডভোগের সময় তিনি মাস্টারমশায়, জিতেনবাবু প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ করে বাইরে সংগঠনের অবস্থাটা বুঝে নিয়েছেন। প্রেসিডেন্সী জেলে আসার দুচার দিনের মধ্যেই দ্বিজেনবাবুকে আর আমাকে নিভৃতে ডেকে বলেন: "আমরা এত সহজে হার মানব না। যে করেই হোক আমাদের দুই একজনকে বাইরে যেতে হবে। যেটুকু শক্তি এখনও অবশিষ্ট আছে তাকে সংহত করে অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করব। অন্তত যতটুকু সম্ভব হয়।"

আমার একবার বলার ইচ্ছা হয়: "যে অধ্যায় শেষ হয়ে গিয়েছে তার উপরে এবার দাঁড়ি টেনে দিন। সংগঠনের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাকে নির্দেশ দিন শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে কাজ শুরু করতে।" শেষ পর্যন্ত বলা হয়ে ওঠে না। মুখফুটে বলতে ভরসা পাই না। নিজের মনেও একটা সঙ্কল্প উঁকি দেয়: "যদি সম্ভব হয় তবে একবার মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করে দেখাই যাক্ না।"

এমন সময় একদিন খবর পেলাম যশোর জেলার এক গ্রামে আমার অন্তরীণ আদেশ এসেছে। খবর বলা ভুল হবে। জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব প্রাত্যহিক পরিদর্শনে এসে জানিয়ে গেলেন তিন ঘণ্টার নোটিসে তৈরী হতে হবে। আমাদের আদি বাসস্থান ছিল যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত আলোকদিয়া গ্রামে। এখন সেখানে পূর্বপুরুষের ভিটের চিহ্নমাত্র নেই। নেই ঐ তল্লাটে কোন পরিচিত মানুষ। মুক্তির স্বাদ পাব ঠিকই। তবু এই কয় মাসের বন্ধুদের ছেড়ে যেতে দুঃখ হয়।

পূর্ণানন্দবাবু নির্দেশ দিলেন গ্রামে পৌঁছবার কিছুদিন পরেই আত্ম-গোপন করে কলকাতায় পালিয়ে আসতে হবে। তিনি যথাস্থানে খবর পাঠিয়ে দেবেন যাতে বাইরের বন্ধুরা আমার পলায়নে সাহায্য করে। তিনি আরো বললেন: "বকসা বন্দী শিবিরের বন্ধুরা নানা কৌশলে অর্থসংগ্রহ করে প্রেসিডেন্সী জেলে সদ্য স্থানান্তরিত একজন বন্দীর মারফত এক হাজার টাকার একটি নোট পাঠিয়েছেন। সেটা আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।" বন্দীদের নিজের কাছে একটি পয়সা পর্যন্ত রাখার হুকুম নেই। যদি তল্লাশে নোট ধরা পড়ে তাহলে

জের গড়াবে বহুদূর পর্যন্ত। কেঁচো খুঁড়তে সাপও বেরোতে পারে। তবু ঝুঁকি নিতেই হবে। বাইরে যে বন্ধুরা আছে তাদের পক্ষে এই সঙ্কট সময়ে এক হাজার টাকার মূল্য অনেক।

'কালজানা'র একটি খালি কৌটার মোড়ক খুলে তার গায়ে নোটটি জড়িয়ে মোড়কটি আবার লাগিয়ে দেওয়া হল। কৌটায় কয়েকটি নিত্য ব্যবহার্য জিনিস ভর্তি করে সুটকেসে নিলাম। জেলগেটে কর্তৃপক্ষ একবার বাক্সবিছানা শরীর তল্লাশি করে। সেখান থেকে নির্বিঘ্নে পার পেয়ে যাই। সাদা পোশাকে রিভলভারধারী আই. বি-র প্রহরাধীনে সন্ধ্যায় পৌঁছলাম যশোরে পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বাংলায়। গ্রামে অন্তরীণ আদেশপ্রাপ্ত বন্দীর মালপত্র সাধারণত জেলের বাইরে আর তল্লাশী হয় না। তাই আশা ছিল সহজেই এখানকার পালা শেষ করে কাল ভোরে গ্রামের অভিমুখে রওনা হওয়া যাবে। বাদ সাধে আই. বি. অফিসারটি। সে জিদ ধরে যে, সব জিনিসপত্র খুঁটিনাটি ভাবে পরীক্ষা করে দেখার হুকুম আছে। কাজে দেখি সুটকেশ খুলে ঠিক ঐ কালজানার কৌটাটিই খুঁজে বার করে, মোড়ক ছিঁড়ে ফেলে। নোটটি বেরিয়ে পড়ে। ফলে অবস্থাটা বদলে গেল। পুলিস সাহেব অনেক জেরা করলেন। সত্য কথা বললে এবং নোটটি যে আমার তা স্বীকার করলে ফেরত দেওয়া হবে বলে আশ্বাসও দিলেন।

আমি ত জানি স্বীকার করার ফল কি দাঁড়াবে! তাই জবাব দিলাম: "আমার কাছে এটা খুব রহস্যময় ঠেকছে, এর বেশি আমি কিছু জানি না"। গ্রামে যাওয়া আর হল না। সেই রাত থানা হাজতে কাটল। শারীরিক নির্যাতন না হলেও সারা রাত ধরে চলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। চেয়ারে ঠায় বসে। সামনে আই. বি. কর্মচারী জেরা করে চলেছে। চোখের পাতা বোজার অবকাশ পাই না। কর্মচারীই বলে: "আমরা সঠিক খবর পেয়েই তল্লাশী করেছি। দু-ঘণ্টা আগে খবর পেলে প্রেসিডেন্সী জেল গেটেই আপনাকে ধরে ফেলা যেত।

সমস্ত ব্যাপারটা সন্দেহজনক ঠেকে। তবে কি জেলের ভিতর থেকেই কেউ এই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? হয়ত কালজানার কৌটায় নোট ভরা এবং আমাকে দেওয়ার সময় কেউ লক্ষ্য করে থাকবে। ঐদিনই আর একজন বয়স্ক রাজবন্দীকে অন্যত্র গ্রামের অন্তরীণে পাঠানো হয়। পূর্ণানন্দবাবু আমার আগে তাঁকেই অনুরোধ করেছিলেন নোটটি বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। উক্ত

বন্দীটির মধ্যে যে মানসিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে এরকম একটা কানাঘুষা বন্ধুদের মধ্যে চলছিল। কিন্তু দুর্বলতা দেখা দেওয়া এক জিনিস আর বিশ্বাসঘাতকতা আর এক জিনিস। এত প্রবীণ কর্মীর উপর সন্দেহ করতে মন চায় না। অথচ আমি জেল গেটে আসার ঘণ্টাখানেক আগেই ত তিনি আই. বি. প্রহরায় যাত্রা করেছেন। আমার প্রশ্নকর্তা জানায় যে, কলকাতা লর্ডসিংহ রোডের অফিস থেকে টেলিগ্রাম যোগে যশোরের ডি. আই. বি. অফিসে পাওয়া নির্দেশের বলেই তারা আমাকে ধরতে সমর্থ হয়েছে। সন্দেহ মনেই চেপে রাখি। জেরার কোন উত্তর দেব না সে কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়ে নির্বাক হয়ে থাকি।

পরের দিন আমাকে হাজির করা হল মহকুমা হাকিমের সামনে। হাকিম বললেন: "আপনাকে আবার ডেটিনিউ করা হবে। তবে গভর্নমেন্টের হুকুম না আসা পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর বিচারাধীন বন্দী হিসাবে কয়েকদিন থাকতে হবে জেল হাজতে।

যশোর জেল গেটে এসে দেখি একটা মিথ্যা চার্জ দেওয়া হয়েছে—চোরাই মাল রাখার অপরাধ। জেল জীবনের কঠোরতার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় এখান থেকেই শুরু হল। আমাকে নিয়ে গেল সোজা সেলে। চারদিকে উঁচু প্রাচীর ঘেরা জগৎ। তার মধ্যে আবার অপেক্ষাকৃত কম উঁচু পাঁচিল বেষ্টিত অনেকগুলি ছোট ছোট আঙিনা। ওরই নাম এখানকার পরিভাষায় ইয়ার্ড। তার মধ্যেটা আবার নানা অংশে বা ওয়ার্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক ইয়ার্ডের ফটকে তালাচাবি এবং সান্ত্রী মোতায়েন। এক কথায় জেলের ভিতরে জেল। সেলগুলি যে ইয়ার্ডে তার পাঁচিল বেশ উঁচু। জেলা জেলের সেলে রাখা হয় ফাঁসির আসামী অথবা দুর্দান্ত স্বভাবের কয়েদীদের। পঁচিশ বা ত্রিশ হাত লম্বা এবং চার পাঁচ হাত চওড়া একফালি উঠোনের একধারে পাঁচটি সেল। এখানে ডিগ্রী নামে অভিহিত। ডিগ্রীর ভিতরটা লম্বায় ৫।৭ হাত এবং চওড়ায় ৪।৫ হাতের বেশি নয়। সামনে লোহার গরাদে দেওয়া দরজা। পিছনের দেয়ালে নাগালের অনেক উপরে ছোট্ট একটি জানালা। তাও লোহার গরাদ দিয়ে সুরক্ষিত।

লক-আপের সময় হয়ে গিয়েছে। এখন ত ডেটিনিউ নই। দিনের আলো মিলিয়ে যাওয়ার আগেই দরজায় তালা পড়ে। এক কোণে মলমূত্র ত্যাগের

জন্য ছোট্ট একটি লোহার গামলা বসানো। জেলের পরিভাষায় ওটির নাম 'টুকরি'। এতকাল পূর্বসূরীদের কারাস্মৃতিতে 'টুকরি'র কথা পড়েছি। এখন তাই হল রাতের সঙ্গী। ভোরের আগে তালা খুলবে না। এর মধ্যে প্রকৃতির তাগিদ মেটাতে হলে ওটা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। দু-ঘণ্টা পর পর সান্ত্রীর ডিউটি বদল। নতুন সান্ত্রী এসে তালা ও দরজা নেড়ে দেখে, তারপর লণ্ঠন তুলে দেখে নেয় ভিতরের লোকটি ঠিক আছে কিনা। সেলে বা ব্যারাকে সর্বত্র এই নিয়ম। প্রেসিডেন্সী জেলে কয়েক মাস এই নিয়মের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। তবে এখানে ছোট জায়গা। সিপাহীর ভারী বুটের আওয়াজ আর তালা নাড়ার শব্দ ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। প্রেসিডেন্সী জেলের ব্যারাকে প্রকৃতির তাগিদ মেটাবার ব্যবস্থা ছিল লম্বা হলের এক প্রান্তে। কাজেই ততটা গায়ে লাগে নি।

এখানে ছোট্ট পরিসর গণ্ডির ভিতর নিঃসঙ্গ অন্ধকারে মশার কামড় খেতে খেতে সময় কাটানো দুঃসহ হয়ে ওঠে। প্রথম শ্রেণীর বন্দী হওয়াতে কর্তৃপক্ষ লোহার খাট, বিছানা, মশারি সরবরাহ করেছে ঠিকই। তবে মশারির ভিতরে প্রবেশ করলে শোয়া ছাড়া উপায় নেই। অথচ শুয়ে ঘুম আসে না চোখে। কিছুক্ষণ পর পর জমাদার রাউণ্ডে আসে। সান্ত্রী চিৎকার করে আসামী দরজা জানালা তালা বাতির নিরাপত্তা সংবাদ জানায়, "পাঁচ আসামী, দরজা জানলা তালা বাতি সব ঠিক হ্যায় হুজুর"। উত্যক্ত হয়ে এক এক সময় ঐ কয়েক হাত জায়গার মধ্যে পায়চারি করি। আর মাঝে মাঝে গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে তার ফাঁকে নক্ষত্রখচিত আকাশের টুকরোটুকুর দিকে লোভীর মত চেয়ে থাকি।

সঙ্গীহীন অবস্থায় দিন কাটাতে হচ্ছে। বই, খবরের কাগজ কিছু নেই। বিচারাধীন বন্দী বাড়ীতে চিঠি লেখার যে সব সুবিধা পায় সেগুলি দেওয়ার বেলায় জেল-কর্তৃপক্ষ নানা অজুহাতে এড়িয়ে যায়। বুঝি যে আই. বি-র নিষেধ আছে। অন্য সেলগুলিতে রয়েছে খুনের মামলায় দণ্ডিত দুজন ফাঁসির আসামী আর দুজন লম্বা মেয়াদের সাজাপ্রাপ্ত সাধারণ কয়েদী। তাদের সঙ্গে কথা বলারও অনুমতি নেই। উপরন্তু জেল কর্তৃপক্ষের কেউ কেউ অকারণে আজগুবি ভয় দেখায়।

ডেপুটি জেলারটি ছিলেন অত্যন্ত সদাশয়। তিনি রোজ সকালে এসে একবার শুনিয়ে যেতেন : "বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। নোট যখন পাওয়া গিয়েছে, তখন সাজা হবেই। কোন রাজনৈতিক ডাকাতির সঙ্গে নাকি আমার বাকসে পাওয়া

নোটের যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া জেল আইনের অনুসারে মামলা ত হবেই।"

মাঝে মাঝে মন বড় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে না তা নয়। বিনা কাজে সময়ের বোঝা দুর্বহ লাগে। কালের গতি যেন হঠাৎ অত্যন্ত মন্থর হয়ে পড়ছে। খাঁচায় বন্দী বাঘ সিংহের মত সেলের এধার থেকে ওধারে পায়চারি করি আর আবৃত্তি করি কবিগুরুর সেই গানের ছত্রগুলি—

"বিঘ্ন বিপদ দুঃখ দাহন তুচ্ছ করিল যারা,
মৃত্যু গহন পার হইল টুটিল বন্ধ কারা।"

সকালে পাঁচটায় উঠি। জেলের নিয়ম অনুসারে বিকাল পাঁচটায় জমাদার কয়েদী পাহারাওলাকে সঙ্গে নিয়ে সবগুলি ব্যারাক আর সেলের গরাদগুলি হাতুড়ি ঠুকে দেখে যাবে ঠিক আছে কিনা। দূর থেকে সেই আওয়াজ ওঠে, ক্রমশ কাছে আসে আর বুঝি জেলের একটি দিন শেষ হল। এক ঘণ্টার মধ্যে খাওয়া সারতে হবে। দরজায় তালা পড়বে। জেলের আইনে কয়েদীদের রাত শুরু হবে। বাইরে তখনও গ্রীষ্মের সূর্যালোক নিষ্প্রভ হয় নি। সময় কাটাবার জন্য পেরেক দিয়ে দেয়ালের পলস্তারার উপরে আঁক কাটি। কখনও লিখি ইনকিলাব জিন্দাবাদ। কখনও লিখি—

"যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর মাঝে,
বর্জিল ভয় অর্জিল জয় সার্থক হল কাজে।"

একদিন শেষ রাতে ঝড় উঠেছে। কতদূর থেকে জানি না কি একটা গাছের তাজা পাতা ঝড়ে ছিঁড়ে এসে বুকের উপর পড়ল। পাঁচ সাত দিন পরে এই বোধ হয় প্রথম সবুজের মুখ দেখতে পেলাম। ছেঁড়া কয়েকটি সবুজ পাতা। ঝোড়ো হাওয়ায় সবে ঘুম ভেঙেছে, বেশ ভাল করে কাটে নি। আধো জাগা আধো ঘুমন্ত অবস্থায় কল্পনা করি : কাল বৈশাখীর ঝড় কি আমাকেও অমনি-ভাবে উড়িয়ে নিতে পারে না দিগন্তের পানে ?

দিন দশেক পরে প্রতীক্ষা শেষ হল। পুলিস কোন কেস খাড়া করতে পারে নি। আবার ডেটিনিউ। ডেটিনিউ ইয়ার্ডে এসে খুব ভাল লাগল। এই-টুকুকেই মনে হয় কত বড় পরিবর্তন। আমি ছাড়া আর পাঁচজন বন্দী রয়েছে। বয়সে একজন বাদে সবাই আমার চেয়ে ছোট। তবু ত কথা বলার সঙ্গী পেয়েছি। দেয়ালের ওপারে তাল নারিকেল গাছের সারি, এপারে সবুজ ঘাসে

ঢাকা লন। ইয়ার্ডের সংলগ্ন আঙ্গিনায় ছোট্ট একটু বাগান। কাঁঠাল গাছের ছায়া, হাস্নুহানার ঝাড়। কয়েকদিনের উপোসী চোখ জুড়িয়ে গেল।

দু-মাস যশোর জেলে অতিবাহিত করি উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষায়। এখান থেকে কি আবার প্রেসিডেন্সী জেল অথবা দেউলী ? কোথায় যেতে হবে ? স্টেটসম্যান পত্রিকায় পড়ি প্রভাত চক্রবর্তী সহ জন চল্লিশেক আসামীকে নিয়ে আন্তঃ প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শীঘ্রই শুরু হবে। এজন্য একটি স্পেশাল ট্রাইবিউনাল গঠিত হয়েছে। ঐ মামালায় আমাকে জড়াবার আশঙ্কা একেবারে নাকচ করে দিতে পারি না। কোথায় কোন্ সূত্র পুলিসের হাতে পড়েছে কে জানে! দুজন রাজসাক্ষী হয়েছে। তাদের স্বীকারোক্তিতে কাকে কাকে জড়িত করেছে তাও জানি না। আগস্টের মাঝামাঝি মামলার শুনানী শুরু হবে। জুলাই মাসটা নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হওয়ায় খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। কিন্তু ফাঁড়া কাটে নি।

আগস্ট মাসের ১লা তারিখ। মাসিক ভাতা থেকে কয়েকটা নিত্য ব্যবহার্য জিনিস সরবরাহ করার জন্য জেল অফিসে লিখে পাঠিয়েছি। এমন সময় অফিসে ডাক এল। কর্তৃপক্ষ সরকারী হুকুম দেখায়, আজই দুপুরের ট্রেনে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বদলি হতে হবে। পথে সঙ্গী আই. বি. অফিসারদের মুখে শুনি ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্তরূপে চালান হচ্ছি। অফিসারটি ভয় দেখায়, বলে : "আপনার বিরুদ্ধে যতটুকু সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তাতে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হবে। তারপর যাবেন আন্দামানে সেলুলার জেলে। সেখান থেকে যদি বেঁচে ফিরতে পারেন তাহলেও দেখবেন স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। চোখের দৃষ্টি এসেছে নিষ্প্রভ হয়ে।"

কি জবাব দেব ? বলি : "দেখা যাবে"।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের মামলা। ভারতীয় দণ্ডবিধির অন্যতম সেরা ধারা ১২১ ক, অর্থাৎ ব্রিটিশ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র অভিযোগে চল্লিশ জন অভিযুক্তকে নিয়ে মামলা শুরু হল। দু-জন রাজসাক্ষী হয়েছে। সুতরাং আসামী ৩৮ জন। স্পেশাল ট্রাইবিউনালের সামনে বিচার। বিচারের পদ্ধতি আধাসামরিক। স্পেশাল ট্রাইবিউনাল গঠিতই হয়েছে দণ্ডবিধি অনুসারে, সাধারণ মামলায় আসামীরা যে সব সুযোগ পেয়ে থাকে সেগুলি এড়িয়ে চলার উদ্দেশ্যে।

ট্রাইবিউনালের সভাপতির হাতে অসাধারণ ক্ষমতা। কোন্ সাক্ষীকে ডাকা হবে, কাকে কতটুকু জেরা করা হবে সবই তাঁর মর্জির উপরে নির্ভর করে। খবরের কাগজে শুনানীর বিবরণ কতটুকু ছাপা হবে তাও তিনি ঠিক করে দেবেন। একে ত তখন সন্ত্রাসবাদ দমন আইন সাংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করে রেখেছে। ফলে অনেক খবর জনসাধারণের কানে পৌঁছাত না। অনেকের উপর কত উৎপীড়ন হয়েছে! আমাদের একজন সহ-অভিযুক্ত ধীরেন ভট্টাচার্য পাঞ্জাবে ধরা পড়ার পর লাহোর দুর্গে ছ-মাস ধরে তার উপর অমানুষিক নির্যাতন চলেছে। আসামী পক্ষের উকীলরা এসব কথা আদালতের সামনে তুলতে গেলে আমল পায় নি। মামলার শুনানী শুরু হয় ১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসে। রায় দেওয়া হয় ১৯৩৫ সালের মে। এই একুশ মাস সময় কালের প্রায় প্রতিটি দিনই আজও স্মৃতির পটে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তথাকথিত ব্রিটিশ ন্যায় বিচারের প্রকৃত রূপটিকে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেছি।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আমাদের কয়েকজনকে অর্থাৎ যারা ডেটিনিউ থেকে বিচারাধীন বন্দী, তাদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। স্থান হয়েছে স্পেশাল ইয়ার্ডে। জাতীয় আন্দোলনের প্রথম সারির নেতারা দণ্ডিত হলে তাঁদের রাখা হত এই ইয়ার্ডে। এখানেই থেকে গিয়েছেন সেনগুপ্ত, সুভাষ এবং আরো অনেকে। স্পেশাল ইয়ার্ডে প্রবেশ করতেই দেখি প্রায় সবাই আগের পরিচিত। দ্বিজেন রায়কেও আসামী হিসাবে চালান দিয়েছে। অন্য বন্ধুদের স্থান হয়েছে কুখ্যাত তের ও চৌদ্দ নম্বর ডিগ্রীতে। প্রভাতবাবু, জিতেনবাবু প্রভৃতি যাঁরা অস্ত্র আইনে বা অন্য অভিযোগে দণ্ডিত হয়েছেন তাঁরা আছেন চৌদ্দ ডিগ্রীতে। অন্য যারা বিচারাধীন বন্দী অথচ প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয় নি তারা আছে তের নম্বরে।

আমাদের সকলের একত্র মিলিত হবার একমাত্র জায়গা হল কোর্ট। সহ-অভিযুক্তদের মধ্যে যারা দণ্ডিত তারা জেল গেটে আসে কয়েদির পোশাকে। সবাইকে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরূপে গণ্য করা হয়েছে। পরনে জাঙ্গিয়া, কুর্তা, কোমরে গামছা। জেলের গুদামে নিয়ে যেয়ে তাদের পরিচ্ছদ বদল করতে দেওয়া হল। কোর্টে যেতে হবে ধুতি জামা পরে। জেলের ভিতরে যাই হোক্, আদালতের সামনে তারা বিচারাধীন।

লোহার মোটা জাল দিয়ে ঘেরা কালো প্রিজন ভ্যানে একে একে সবাই

প্রবেশ করি। তার আগে সান্ত্রীরা প্রত্যেকের শরীর তল্লাশ করে দেখে। ভ্যানের ভিতরে রাইফেল হাতে কয়েকজন কনস্টেবল আমাদের সঙ্গে বসে। সামনে জালের একটা ব্যবধানের ওপারে ড্রাইভারের পাশে বসে রিভলভারধারী গোরা সার্জেন্ট। ভ্যানের দরজায় তালা পড়ে। সামনে ও পিছনে চলে লরী বোঝাই সশস্ত্র গোর্খা পুলিস। পথচারীদের সচকিত করে আমরা সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ তুলি "বন্দেমাতরম্", "ইনকিলাব জিন্দাবাদ", "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক"।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের ঠিক পিছনেই কোর্ট প্রাঙ্গণ। বেকার রোডে পড়ে কতটুকুই বা পথ। কোর্টের পরিবেশ দেখে মনে হয় যেন যুদ্ধ শিবির। চারিদিকে সঙ্গীন উঁচানো গোর্খা পুলিস, আই. বি. চরদের ভিড়। ভ্যানের তালা খোলে একেবারে আদালত গৃহের সন্নিকটে পৌঁছে। সশস্ত্র গোর্খা পুলিসের দুই সারির মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চলি। দোতলার সিঁড়ির নীচে গোরা সার্জেন্টরা আর একবার শরীর তল্লাশ করে। আদালতে আমাদের বসার জায়গাটা তিনদিকে লোহার গরাদে ঘেরা, একদিকে দেয়াল। মাথার উপরে লোহার জালের আচ্ছাদন। ডক নামে পরিচিত এই খাঁচাটির দরজায় ঝোলে প্রকাণ্ড একটি তালা। সামনে সদা সতর্ক দুজন সান্ত্রী।

দুজন জজ এবং একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে স্পেশাল ট্রাইবিউনাল গঠিত হয়েছে। সভাপতি মিঃ জেমসন। সরকার পক্ষে মকদ্দমা পরিচালনার প্রধান কর্মকর্তা হয়েছেন পাবলিক প্রসকিউটর রায় বাহাদুর নগেন ব্যানার্জি। তাঁর সঙ্গে সর্বদা দুজন সাদা পোশাকের পুলিস সশস্ত্র দেহরক্ষীরূপে ঘোরে। আমাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য এসেছেন ব্যারিস্টার স্বর্গত জে, সি, গুপ্ত, শেখর বসু, অ্যাডভোকেট সুকুমার দাশগুপ্ত, পূর্ণেন্দু চৌধুরী, অজিত দত্ত। অজিতবাবু সম্প্রতি অ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ শুরু করেছেন। ছাত্র আন্দোলন উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে আগেই আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি অনুশীলনের একজন অন্তরঙ্গ সমর্থক বলেও জানতাম। জে. সি. গুপ্ত মহাশয় সহ এঁরা সকলেই নামমাত্র দক্ষিণাতে আমাদের মামলা পরিচালনা করতে রাজী হন। অন্য দুজন স্বদেশী মনোভাবাপন্ন খ্যাতনামা ব্যারিস্টার ত দৈনিক দু-শ থেকে তিন-শ টাকা ফী দাবি করেছিলেন। তাঁদের দাবি মিটানো আমাদের সাধ্যের অতীত বলে শেষ উপায় হিসাবে বাইরে বন্ধুরা মিঃ গুপ্তের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। সেই সময়টিতে

বিপ্লবীদের মামলা হাতে নেওয়ায় বিপদের আশঙ্কা কম ছিল না। মেদিনীপুরের খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা ও উকীল মন্মথ দাস মহাশয়কে এইরূপ কয়েকটি মামলায় বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থন করার অপরাধে জেলা থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনিও সামান্য দক্ষিণায় মাঝে মাঝে আমাদের মকদ্দমায় সাহায্য করেন।

সরকার পক্ষ থেকে পূর্ণানন্দবাবুকে প্রথমে আসামীরূপে হাজির করা হয় নি। কিন্তু পাবলিক প্রসিকিউটর ষড়যন্ত্রের যে চিত্রটি আদালতের সামনে উপস্থিত করে তাতে ট্রাইবিউনাল আদেশ দেয় যে, পূর্ণানন্দবাবুকে আসামী হিসাবে উপস্থিত করতেই হবে। ফলে কয়েক দিনের মধ্যে তিনিও আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

শুনানী চলে দিনের পর দিন ধরে। সরকারী উকীল বিভিন্ন প্রদেশে দলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিবরণী প্রকাশ করে। কয়েকজন ধরা পড়ার পর পুলিসের নিকটে স্বীকারোক্তি করার ফলেই গোয়েন্দা বিভাগ মাস্টারমশায় এবং জিতেনবাবুর আস্তানার সন্ধান পায়। আগে থেকেই কিছু কিছু সূত্র আই. বি. এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের হাতে এসেছিল। সেই সূত্রগুলি ধরে কিভাবে তারা সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছে সে সব কথাও ট্রাইবিউনালের সামনে বর্ণনা করা হয়।

আমি যশোরে বদলি হওয়ার পর পূর্ণানন্দবাবু বাইরের বন্ধুদের নিকটে সাঙ্কেতিক লিপিতে লেখা যে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন সেটাও পুলিসের হস্তগত হয়েছে। সাঙ্কেতিকলিপি-বিশেষজ্ঞ কিভাবে মর্মার্থ উদ্ধার করেছে সেকথা ব্যাখ্যা করে বলে। আমি যশোরে ধরা পড়ার পরে পূর্ণানন্দবাবু আর একটি বার্তা বাইরে পাঠিয়েছিলেন। সেটিও পুলিস পেয়েছে। পূর্ণানন্দবাবু নিজে আর একজন সঙ্গী সহ প্রেসিডেন্সী জেল থেকে পলায়নের পরিকল্পনা করেছিলেন। বাইরের গোপন কেন্দ্র যাতে সাহায্য করতে পারে সেজন্য তিনি বিস্তৃত নির্দেশ পাঠান। জিতেন নাহা বলে যে ছেলেটি প্রধান রাজসাক্ষী হয়েছে তারই বিশ্বাসঘাতকতায় আই. বি. কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্ণে এই সংবাদ পেয়ে উক্ত গোপন কেন্দ্রে হানা দেয়। সেখানে তারা একটি কাঠের মই এবং 'Smoke Bomb' (ধোঁয়া সৃষ্টিকারী বোমা) তৈরীর মালমসলা উদ্ধার করে। রায় বাহাদুর নগেন ব্যানার্জি এই ঘটনার বিবরণ দেওয়ার সময়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলেন, "ধুম্রজাল সৃষ্টি করে তার অন্তরালে পলায়নের পরিকল্পনা।"

বাংলা ও নানা প্রদেশে যে সব বোমা, পিস্তল, বোমার খোল, বিস্ফোরক মালমসলা পাওয়া গিয়েছে সেগুলি একের পর এক ট্রাইবিউনালের সামনে উপস্থিত করা হয়। আদালত কক্ষটি যেন অস্ত্রশস্ত্রের একটি প্রদর্শনীর রূপ ধারণ করে। নগেন ব্যানার্জির বিবরণী থেকে জানতে পারি যে, প্রথম দফা ব্যাপক ধরপাকড়ের বেড়াজাল এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে সীতানাথ ব্রহ্মচারী। তিনি কয়েকজন তরুণ সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে পাঞ্জাব ছেড়ে চলে যান প্রথমে গোয়ালিয়রে, সেখান থেকে মাদ্রাজে। মাদ্রাজে পৌঁছবার কিছুদিন পরেই অর্থের প্রয়োজনে ঐ তরুণেরা. উটাকামণ্ডে ব্যাঙ্ক লুঠ করে। ব্যাঙ্কলুঠের মামলায় ধরা পড়ে খুশিরাম মেহতা, শম্ভুনাথ আজাদ এবং নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ হয় এই মামলার রাজসাক্ষী।

নিত্যানন্দর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আদালত খুশিরাম মেহতা এবং শম্ভুনাথ আজাদকে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। নিত্যানন্দের জবানবন্দী পুলিসকে সীতানাথ ব্রহ্মচারীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে বহু তথ্যের সন্ধান দেয়। এখন ব্রহ্মচারীকে ধরার জন্য কয়েকটি প্রদেশের গোয়েন্দা বিভাগ হন্যে হয়ে উঠেছে। ভারত সরকার ঘোষণা করেছে, যে ব্রহ্মচারীকে ধরতে পারবে পুরস্কার দেওয়া হবে দশ হাজার টাকা। সরকার পক্ষ নিত্যান্দকে আমাদের মামলায়ও অন্যতম সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করে। প্রথম কয়েকদিন অতিবাহিত হয় সরকারী উকীলের বক্তব্য উপস্থাপনে। "স্বাধীন ভারত" ইস্তাহারটি ছিল সরকার পক্ষের হাতে ষড়যন্ত্রের প্রমাণ স্বরূপ অন্যতম প্রধান দলিল। "স্বাধীন ভারত" যে সেই আদি যুগ থেকে অনুশীলনের ইস্তাহার রূপে প্রকাশিত হয়ে আসছে সে সম্বন্ধে বহু নজির দেখানো হয়। মাস্টারমশায়ের চিঠি এবং ইস্তাহার সহ যারা ধরা পড়েছে তাদের কথা উল্লেখ করতেও সরকার পক্ষ ভোলে না। ট্রাইবিউনালের সামনে ইস্তাহারটি পড়ে শোনানোর সময় নগেন ব্যানার্জির কণ্ঠস্বর আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। সভাপতি মিঃ জেমসন ঠাট্টাচ্ছলে মন্তব্য করেন, "মিঃ ব্যানার্জি, আপনি যে দস্তুরমত উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।" নগেনবাবু জবাব দিলেন, "এমন শক্তিশালী লেখা যে পড়তে পড়তে রক্তস্রোত উত্তাল হয়ে ওঠে (bloodboils)।" মাস্টারমশায়, জিতেনবাবু, দ্বিজেন রায়, পূর্ণানন্দবাবু প্রভৃতি যাঁদের জানা ছিল যে, ইস্তাহার আমারই রচনা তাঁরা আমার দিকে তাকিয়ে হাসেন। লেখক কে সে খবর পুলিস পায় নি। আজ অতীত

দিনের কথা লিখতে বসে মনে হচ্ছে সেদিন শত্রুপক্ষের কাছে থেকে যে স্বীকৃতি পেয়েছিলাম তা আমার কাছে বাণীর সাধনায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

সরকার পক্ষের বক্তব্য উপস্থাপনের পর শুরু হয় সাক্ষীর বহর। সাক্ষীর সংখ্যা দু-শ'র উপর। পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বর্মা থেকে সাক্ষী আসছে। কখনও পুলিস কর্মচারী, কখনও ম্যাজিস্ট্রেট, কেউ হস্তাক্ষর-বিশেষজ্ঞ, বিস্ফোরক-বিশেষজ্ঞ বা আগ্নেয়াস্ত্র-অভিজ্ঞ, সাঙ্কেতিকলিপি উদ্ধারে বিশেষজ্ঞ। একেবারে সাধারণ মানুষও রয়েছে, যারা সংশ্লিষ্ট কোন না কোন ঘটনা ঘটতে দেখেছে অথবা অভিযুক্তদের মধ্যে কারুর না কারুর সংস্রবে এসেছে। পার্টি কর্মীদের ভিতরে যারা পুলিসের হাতে ধরা পড়ে স্বীকারোক্তি করেছে এমন কিছু সংখ্যককেও রাজসাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করা হয়। অস্ত্র আইনে অথবা অন্য কোন মামলায় দণ্ডিত হয়েছে অথচ আমাদের মকদ্দমার সঙ্গে কিছুটা যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে এমন দুই একজন রাজনৈতিক বন্দীর চেহারা ট্রাই-বিউনালকে দেখাবার উদ্দেশ্যে সরকার পক্ষ তাদের এনে সাক্ষীর কাঠগড়ায় হাজির করে। নানা ভাষাভাষী সাক্ষীর সমাবেশ। নানা ভাষাভাষী সাক্ষীদের জেরা করার জন্য দোভাষীর প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন ধরনের বেশভূষা দেখতে পাই। নানা প্রদেশের পুলিস কনস্টেবল এবং অফিসারদের উর্দীতেও বেশ রকমারির দেখা মেলে। জেরার সময় এক এক দিন কৌতুকের খোরাক পাওয়া যায়। আদালত কক্ষে হাসির তুফান ওঠে। আবার কোনদিন আমাদের পক্ষের কৌঁসুলীর সঙ্গে ট্রাইবিউনালের সভাপতির প্রচণ্ড সংঘাত বাধে। বিশেষ আইনে সরকার পক্ষকে যে সব অসাধারণ সুবিধা দেওয়া হয়েছে তাতেও তারা সন্তুষ্ট নয়। সুবিধার সীমারেখাকে টেনে যতদূর সম্ভব নিজেদের অনুকূলে প্রসারিত করার প্রয়াস পায়। হিলি রেল স্টেশন আক্রমণ ও ডাক লুঠের ঘটনা ঘটে আমাদের মামলার শুনানী আরম্ভ হওয়ার মাস দুই পরে। কিন্তু যেহেতু তা সংঘটিত হয়েছিল অনুশীলন সমিতির সভ্যদের দ্বারা তাই সরকারী উকীল সেই ঘটনাকে এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত করতে চায়। হিলি স্টেশন আক্রমণের প্রধান নায়ক প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী গত বৎসর "স্বাধীন ভারত" ইস্তাহার এবং রিভলভার সহ জলপাইগুড়িতে ধরা পড়ে সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। তাকে মেদিনীপুর জেলে স্থানান্তরিত করার সময় সে প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে ট্রেন থেকে পালাতে সমর্থ হয়।

সরকার পক্ষের মতে হিলি মামলার সঙ্গে আমাদের ষড়যন্ত্র মামলার যোগ-সূত্রের এটা একটা অকাট্য প্রমাণ। জে. সি. গুপ্ত প্রবল আপত্তি করা সত্ত্বেও ট্রাইবিউনাল সরকারী উকীলের যুক্তি মেনে নিয়ে সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদের হাজির করার হুকুম দেয়। বিচারের নমুনা বোঝাই গিয়েছে। আমাদের পক্ষের উকীলেরা বলেন দুই একজন বাদে সমস্ত অভিযুক্তেরই লম্বা মেয়াদের সাজা হবে। কার মেয়াদ কতটা হবে তাই শুধু এখন প্রশ্ন। রাজসাক্ষীদের একজনের জবানবন্দীতে আমাকে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত করেছে তবে গুরুতর কিছু বলতে পারে নি। খবর পাই আমার বিরুদ্ধে আরও কিছু তথ্য পুলিসের হস্তগত হয়েছে। আমি ধরা পড়ার পর আমার অধীনস্থ গ্রুপ-গুলির দুটি ছেলে গ্রেপ্তার হয়ে পুলিসের কাছে স্বীকারোক্তি করেছে। কিন্তু তারা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি করে নি বা রাজসাক্ষী হিসাবে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে রাজী হয় নি। এরা ছিল অভিজাত ঘরের সন্তান। অভিভাবকদের সামাজিক প্রতিপত্তির দরুন পুলিস বেশি চাপ দিতে সাহস পায় নি। অভিভাবকেরা তাদের বিদেশে পাঠিয়ে দেবে এই শর্তে মুক্তি দিয়েছে। ফলে সরকার পক্ষ ঐ স্বীকারোক্তি আদালতের সামনে পেশ করতে পারছে না। তাই সরকারী উকীল আমার বিরুদ্ধে প্রমাণগুলিকে এমনভাবে সাজাতে চেষ্টা করে যাতে সহজে রেহাই না পাই।

আমাদের মকদ্দমা এগিয়ে চলে অলস গতিতে। ইতিমধ্যে অন্যান্য মামলায় দণ্ডিত হয়ে কত লোক আপীল শেষে আন্দামানে গেল। তখন বিপ্লবী বন্দীদের পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড হলেই তাকে পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেলে পাঠানো হচ্ছে। আমরাও রয়েছি দ্বীপান্তরের প্রতীক্ষায়। এর মধ্যে একদিন ট্রাইবিউনালের আচরণের প্রতিবাদে আমাদের পক্ষের ব্যারিস্টার ও উকীলেরা আদালত কক্ষ পরিত্যাগ করে চলে যায়। আমরাও আদালতকে জানিয়ে দিই যে, প্রতিবাদস্বরূপ আমরা কোর্টে হাজির হব না। কোর্টের নির্দেশে জেল-কর্তৃপক্ষ আমাদের হাজির করতে বাধ্য। আমরা স্বেচ্ছায় না গেলে বলপ্রয়োগে নিয়ে যাওয়া হবে। স্ট্রেচার, ব্যাণ্ডেজ, আয়োডিন সব তৈরী করে তারা পাগলা ঘন্টি দিতে যাবে এমন সময় খবর আসে যে, ট্রাইবিউনালের সভাপতির সঙ্গে আমাদের পক্ষের একটি মীমাংসা হয়ে গিয়েছে। সুতরাং জেলকর্তৃপক্ষের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা আপাতত মুলতবী রইল।

দেখতে দেখতে শুরু হয় ১৯৩৪ সাল। কলকাতায় একটি রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আসেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। তাঁর স্থান হয় স্পেশাল ইয়ার্ডেরই সংলগ্ন 'মিস ভ্যামিনা সেলস' নামে পরিচিত ওয়ার্ডে। মাঝখানে ব্যবধান আট ফুট উঁচু দেয়াল। ওপারে যাওয়ার দরজা তালাবন্ধ। আমরা যাতে অন্য কোন বন্দীর সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ না পাই সেজন্য জেল-কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল।

আমাদের ইয়ার্ডগুলিতে পাহারা দেওয়ার জন্য বেশ কিছুসংখ্যক পেন্সন-প্রাপ্ত মিলিটারী সুবেদার জমাদার আমদানি করা হয়েছিল। শিখ আর পাঠান। এরা সবাই মোটামুটি শিক্ষিত, সাধারণ সেপাই-সান্ত্রীদের তুলনায় আচরণে ভদ্র ও মার্জিত। তারা প্রাক্তন সৈনিক, শুনেছে যে আমাদের বিচার হচ্ছে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টার অভিযোগে। অতএব তাদের চোখে আমরা যুদ্ধবন্দীর সমতুল্য। সেজন্য তারা আমাদের দেখে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে। বিশেষ করে শিখ সুবেদার ও জমাদারেরা ছিল খুবই সহানুভূতি-সম্পন্ন। এদের ডিউটির সময় মাঝের দরজাটি খুলে পণ্ডিতজীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ করে দিত।

জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপের এমন সুযোগ কি ছাড়া চলে? কিন্তু এক দ্বিজেন রায় ছাড়া অন্য সহবন্দীদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখি নি। তাঁরা প্রথম দিনটি শুধু সৌজন্য বিনিময় করে ক্ষান্ত ছিলেন। তখনকার দিনে বাংলার জেলে দণ্ডিত বন্দীদের দৈনিক সংবাদপত্র পাঠের অনুমতি ছিল না, এমন কি প্রথম শ্রেণীভুক্ত হলেও। বিচারাধীন বন্দী হিসাবে আমরা পেতাম দৈনিক স্টেটসম্যান, অবশ্য নিজেদের খরচে। আমরা পণ্ডিতজীকে গোপনে স্টেটসম্যান সরবরাহ করি এবং তাঁর কাছে যে সব বিদেশী সাময়িক পত্রিকা আসে সেগুলি নিয়ে এসে পড়ে ফিরিয়ে দিই। তখনকার আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বিশেষ করে ফ্যাসিজমের চরিত্র সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করি এইভাবে। আমার তারুণ্যের কৌতূহলে মাঝে মাঝে নানা প্রশ্ন করেছি। তিনিও ধৈর্যের সঙ্গে জবাব দিয়েছেন। তবে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের তখনকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু বলতে চাইতেন না। আলোচনার অবকাশ যে খুব বেশি পেয়েছি তা নয়। দেখা হত অল্প সময়ের জন্য এবং

জেলার বা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেন্ট রাউণ্ডে আসে কিনা সেদিকে সতর্ক রেখে।

মাস দুই পরে পণ্ডিতজীকে বদলি করা হল নাইনি সেনট্রাল জেলে। এদিকে সহ-অভিযুক্তদের মধ্যে একজন হয়ে এলেন সীতানাথ ব্রহ্মচারী। এতদিন বিচার চলছিল তাঁর অনুপস্থিতিতে। পরে ধরা পড়ায় সাধারণ আইন অনুসারে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা নতুন করে পৃথকভাবে হওয়ার কথা। গভর্নর এক অর্ডিনান্স জারী করে আদেশ দিলেন যে, তাঁকে নিয়েই মামলা যে ভাবে চলছে তাই চলবে। ব্রহ্মচারীকে দেখে সবাই অবাক! হাকিম থেকে শুরু করে সেপাই-সান্ত্রী পর্যন্ত। আমরা যারা তাঁকে আগে দেখি নি তাদেরও বিস্ময় লাগে। বেঁটেখাটো মানুষটি, গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় টাক। এই লোকটি যদি হাঁটুর উপর ময়লা ধুতি পরে, খালি গায়ে, মাথায় গামছা বেঁধে দিনদুপুরে পুলিসের সামনে ঘোরাঘুরি করে তাহলেও কেউ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করবে না। ইনি ধরা পড়েছেন কাশীতে। নিত্যানন্দর স্বীকারোক্তিতে তাঁর সম্ভাব্য আশ্রয় স্থানগুলির সন্ধান না পেলে গোয়েন্দা বিভাগের সাধ্য হত না যে তাঁকে ধরে।

জেলের হিন্দুস্থানী সান্ত্রীদের মধ্যে রটে গেল যে, ব্রহ্মচারীজী অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন, ইচ্ছা করলেই জেল থেকে অন্তর্হিত হতে পারেন। তিনি অন্তর্হিত হন নি বটে, কিন্তু ব্রহ্মচারী আসার পরেই পূর্ণানন্দবাবুর মাথায় নতুন করে পরিকল্পনা এল—জেল থেকে পালাতে হবে। পরিকল্পনাকে রূপ দিতে এবং কার্যকরী করতে দুই তিন মাস সময় লাগবে। শুনানী শেষ হওয়ার পর যখন ট্রাইবিউনাল থেকে আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হবে তখন দুই একজন অব্যাহতি পেতেও পারে। ততদিন অপেক্ষা করতে হবে।

এদিকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন ধর্মঘট শুরু হয়েছে। তাঁদের দাবিগুলি শুধু যে অত্যন্ত ন্যায্য তাই নয়, সেদিকে কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে অনশনের প্রয়োজন হয় এটাই সভ্য মানুষের কাছে আশ্চর্য ঠেকবে। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যতীন দাসের অনশনে মৃত্যুবরণের পর ভারত সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, রাজনৈতিক বন্দীদের সুযোগ-সুবিধাদানের প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করবে। কমিটি যথারীতি নিযুক্ত হয় এবং তা কতকগুলি সুপারিশ করে। কিন্তু কার্যত দেখা

গেল যে, সরকারী প্রতিশ্রুতি একটি ভাঁওতা মাত্র। 'রাজনৈতিক বন্দী' রূপে স্বীকৃতিদানের কোন কথাই নেই।

বন্দীদের সামাজিক স্তর, বাইরের জীবনযাত্রার মান. সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি অনুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। তবে কাকে কোন শ্রেণীভুক্ত করা হবে সেটা প্রথমত বিচারকারী হাকিমের মর্জির উপরে নির্ভর করে এবং এ ব্যাপারে গভর্নমেন্টের সিদ্ধান্তই হল শেষ কথা। প্রথম দুইটি শ্রেণীর বন্দীদের সামান্য কিছু কিছু সুবিধা দেওয়া হলেও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কয়েদীদের জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের পক্ষে দুঃসাধ্য। আহার্য নিকৃষ্ট ধরনের, পরিচ্ছদ বলতে জাঙ্গিয়া, কুর্তা, শয্যা দুটি কম্বল। তাছাড়া শিক্ষিত ভদ্রযুবক ও দেশকর্মীদের পক্ষে সবচেয়ে বড় অসুবিধা, তাঁরা লেখাপড়ার সামান্য সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। এমন কি নিজ খরচে বই পাওয়া গেলেও খাতা এবং লেখার সরঞ্জাম কেনার অনুমতি নেই। যারা সেলে থাকে তাদের পক্ষে বই পড়ার অনুমতিও নিরর্থক হয়ে পড়ে। কেন না রাতে আলোর ব্যবস্থা নেই। খবরের কাগজ পড়ার ত প্রশ্নই ওঠে না। যদি কোন বিচারাধীন বন্দীর কাছ থেকে খবরের কাগজ দণ্ডিত বন্দীর হাতে যেয়ে পৌঁছায় তবে ধরা পড়লে উভয়কেই শাস্তি পেতে হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীরা রাত্রে আলো পায়, কিন্তু সংবাদপত্র বলতে পায় স্টেটসম্যান পত্রিকার সাপ্তাহিক সংস্করণ আর সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী। সাপ্তাহিক স্টেটসম্যান অর্থাৎ সমুদ্র পারের জন্য প্রকাশিত সংস্করণ। ভারত সম্বন্ধে বাছাই করা যেটুকু খবর বিদেশে পাঠানো প্রয়োজন বলে বিবেচিত হয় শুধু সেইটুকু স্থান পায় সেখানে। সঞ্জীবনী পত্রিকাটিতে জাতীয় আন্দোলনের এবং রাজনৈতিক মামলা-মকদ্দমা সম্বন্ধে সামান্য কিছু কিছু খবর থাকত বটে। তবে সেন্সরের দৌলতে প্রায়ই এমন অবস্থা হত যাতে শুধু এইটুকু বোঝা যেত যে, কাঁচিতে ক্ষতবিক্ষত ও মসীলিপ্ত হয়ে সপ্তাহের প্রাপ্য কাগজটা অন্তত হাতে এসে পৌঁছেছে।

তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের সে সুযোগটুকুও ছিল না। তারা গোটা দণ্ডকালের জন্য শুধু বহির্বিশ্ব নয়, নিজের দেশে কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে থাকবে এটাই যেন সরকারের অভিপ্রায়। বলা বাহুল্য বিপ্লবী বন্দীদের অধিকাংশকেই আদালত থেকে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরূপে গণ্য করার

নির্দেশ দেওয়া হত। সর্বোপরি, জেলের আইন রচিত হয়েছে মধ্যযুগীয় মনোভাব নিয়ে। প্রতি পদে মনুষ্যত্বের অবমাননা, মানুষকে অমানুষে পরিণত করাই তার উদ্দেশ্য। সব ব্যাপারে ফাইল। দুজন করে পাশাপাশি লাইন বেঁধে কাজে যেতে হবে। স্নান করতে, পায়খানায় যেতে, খেতে বসতে, সব ব্যাপারে ফাইল। জেলে সারাদিনে বার চারেক কয়েদীদের সংখ্যা গোণা হয়। সংখ্যা কম হলেও মুশকিল, বেশি হলেও তাই। গুণতির সময় উবু হয়ে বসে থাকতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সেপাই জমাদাররা গোণা শেষ না করছে। কয়েকবার ভুল না করে তারা কোনদিনই গুণতি মেলাতে পারে না এবং জোড়া জোড়া ছাড়া তাদের পক্ষে নাকি গোণা সম্ভব নয়। সাধারণ কয়েদীদের জন্য হুকুম হয় "জোড়া জোড়া বৈঠ যাও"।

রাজনৈতিক বন্দীরা অনেক ঝগড়াঝাঁটির পর একটু সুবিধা আদায় করেছে, তাদের উবু হয়ে না বসে ফাইলে দাঁড়াতে দেওয়া হয়। সব চেয়ে আফশোসের কথা, জেলের কর্মচারী এবং সেপাই-সান্ত্রীরা যেন শপথ নিয়েছে যে, শিক্ষিত রাজনৈতিক বন্দীদের তারা কিছুতেই সাধারণ চোরডাকাতদের থেকে আলাদা করে দেখবে না। প্রতি পদে, প্রতি মুহূর্তে তাদের আচরণ রাজনৈতিক বন্দীদের আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত করে। তাই নিয়ে দৈনন্দিন সংঘাত বাধে। রূঢ় আচরণের প্রতিবাদ করতে গেলে জেল কোডের নানা ধারা অনুসারে শাস্তি পেতে হয়। সেলে একলা বন্দী, হাতকড়া, পায়ে বেড়ী, মাড়ভাত আরো কত কি। তাই অনশনই হয়ে দাঁড়ায় বন্দীদের পক্ষে প্রতিবাদের শেষ উপায়।

জেল আইনে অনশন ধর্মঘট সব চেয়ে বড় অপরাধ। কয়েদীর নিজের ইচ্ছায় মরারও অধিকার নেই। দলবদ্ধভাবে অনশন করলে সেটা নাকি 'মিউটিনি'র পর্যায়ে পড়ে। তাদের আলাদা আলাদা সেলে বন্ধ করে বলপূর্বক খাওয়ানো হবে নাকের ভিতরে রবারের নল ঢুকিয়ে। জেল আইন ভঙ্গের অপরাধে অন্য শাস্তি ছাড়াও আদালতের বিচারে সাজা হবে।

বাইরে চলেছে দমননীতির তাণ্ডব। জনমতের কণ্ঠ রুদ্ধ। বন্দীদের অনশন ধর্মঘটের খবর দেশের লোকের কানে পৌঁছাতে পারে নি। তিন সপ্তাহ পরে একজন বে-সরকারী জেল-পরিদর্শকের মধ্যস্থতায় স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, অনশন ভঙ্গ করা হলে সমস্ত দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হবে। তখন রাজনৈতিক বন্দীদের ব্যাপারে জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টেরও হাত-পা

বাঁধা। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মঞ্জুরি ছাড়া নিজের বিচার-বিবেচনায় বিশেষ কিছু করার নেই। তবু সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বিবেচক এবং স্বাধীনচেতা হলে বে-সরকারীভাবে ছিটেফোঁটা সুবিধা দিতে পারে। তেমনি আবার প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাবাপন্ন হলে বন্দীদের জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে।

আলিপুর জেলে অনশন ভঙ্গ হল। কিন্তু নিজের খরচে লেখার সরঞ্জাম অর্থাৎ খাতা ও দোয়াতকলম ব্যবহারের অনুমতি ছাড়া কোন মূল দাবি পূর্ণ হল না। মাত্র কয়েক মাস আগে আন্দামানে সেলুলার জেলে ঠিক এই সব নিম্নতম দাবি আদায়ের জন্য অনশনে তিনটি অমূল্য প্রাণ বলি দিতে হয়েছে। তাদের মৃত্যুর সংবাদ দেশে এসে পৌঁছায় ধর্মঘট শুরু হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে। প্রতিবাদ করার বা বন্দীদের দাবির সমর্থনে কথা বলার মত লোক বাইরে নেই। দেশ নেতারা সবাই জেলে। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে আন্দামানের অনশন প্রত্যাহৃত হয় এবং ভারত গভর্নমেন্ট বন্দীদের দাবি কিছু পরিমাণে মেনে নেয়। বাংলার জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে অ্যাণ্ডারসনী নীতি একেবারে অনমনীয়। কোন রকমেই বজ্রমুষ্টি শিথিল করা হবে না; নির্যাতনের পর নির্যাতনে বিপ্লবীদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে হবে। মামলা শেষ হওয়ার পর শুরু হবে সেই নীতির বিরুদ্ধে আমাদেরও সংগ্রাম। মনকে এখন থেকে প্রস্তুত করে নিই। মাথা নোয়াব না, রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা আমরা আদায় করবই।

দণ্ডিত হওয়ার পর কি হবে সে কথা ছাড়াও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রশ্ন ওঠে। মহাত্মাজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কংগ্রেসের ভিতরে গড়ে উঠেছে কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি। তার খসড়া কর্মসূচীর কিছু অংশ স্টেটসম্যান পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে। বোম্বাইয়ের সূতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘট নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত বয়ে আনে। তারা নিজেদের দাবির সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি তুলেছে। কিন্তু এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার বা গভীরভাবে চিন্তার সুযোগ হয় না।

পূর্ণানন্দ বাবু জেল থেকে পালাবার পরিকল্পনার ছক তৈরী করে ফেলেছেন। তিনি এই অভিযানের জন্য নিজেকে ছাড়া আর ছয় জনকে বাছাই করেছেন, সীতানাথ ব্রহ্মচারী, হরিপদ দে, নিরঞ্জন ঘোষাল, অমূল্য সেন এবং আমি। পূর্ণানন্দবাবু সবাইকে আলাদা আলাদা ডেকে বুঝিয়ে বলেন যে, এতে গুরুতর বিপদের, এমন কি ঘটনাস্থলেই সান্ত্রীদের গুলিতে প্রাণ হারাবার আশঙ্কা আছে।

এই জেল থেকে ইতিপূর্বে অন্য কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীর পলায়ন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এত কড়া সতর্কতামূলক ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে যে, রাত্রে প্রচেষ্টা করার প্রশ্নই আসে না। তার উপর একজন দুজন নয়, একসঙ্গে সাতজন। অতএব দিনের বেলাতেই প্রাচীর টপকানোর দুঃসাহসিক ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। সুতরাং তিনি আমাদের বলেন সব জেনে বুঝে তবে সম্মতি দিতে।

প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়েই ত এ পথে পথিক হয়েছি। মাত্র দিন কয়েক আগে ঐ জেলেই দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি হয়ে গিয়েছে। সে রাতের কথা ভুলতে পারব না। সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর মাঝ রাতে দীনেশ মজুমদারকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে গিয়েছে। বিপ্লবী বন্দীরা সবাই সেলে বা ব্যারাকে তালাবদ্ধ। তবু কর্তৃপক্ষের স্বস্তি নেই। তারা যাতে টের না পায় এমন ভাবে কাজ সারতে হবে। কিন্তু চুপি চুপি কাজ সারতে তারা পারে না। হঠাং জেলের আকাশ দীর্ণ করে মৃত্যুপথযাত্রীর কণ্ঠে ওঠে বজ্রনিনাদ "বন্দে মাতরম্!" "ইনকিলাব জিন্দাবাদ!" ঘুম ভেঙ্গে যায় সবার। হাত পা বাঁধা অসহায়ের মত ছটফট করি। ফাঁসির রজ্জু থেকে সঙ্গীকে বাঁচাবার উপায় নেই। উন্মাদের মতন সকলে গর্জন করে উঠি "বন্দে মাতরম্!" "ইনকিলাব জিন্দাবাদ।" বলি, "শহীদ! জেনে যাও, তোমার অসমাপ্ত কাজের জন্য আমরা রইলাম।" সমবেত কণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষে সমস্ত জেল কেঁপে ওঠে। সেদিন রাতে স্বয়ং পুলিস কমিশনার, কারাবিভাগের আই. জি. সবাই জেলে উপস্থিত। সশস্ত্র পাহারার জোরদার ব্যবস্থা। বিপ্লবী বন্দীরা যদি কিছু করে বসে। সে রাতে বলতে গেলে চোখের সামনেই দেখেছি আমাদেরই একজন বন্ধু কেমন নির্ভীক চিত্তে মৃত্যুকে বরণ করেছে। মরণের আশঙ্কা তাই আমাদের বড় বাধা নয়। আমি সম্পূর্ণ অন্য একটি কারণে দোটানায় পড়ি।

পূর্ণানন্দবাবুর ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু বুঝতে পারি রাজনৈতিক বহু প্রশ্নে তাঁর সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য। হয়ত বাইরে যাওয়ার পরে বেশিদিন একসঙ্গে কাজ করা কঠিন হবে। অন্যদিকে এই বে-পরোয়া অ্যাডভেঞ্চারে সঙ্গী হওয়ার দুর্নিবার আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারি না। দোটানার কথা মুখ ফুটে না বলে জিজ্ঞাসা করি: "বাইরে যেয়ে আমার কাজ কি হবে?" তিনি বলেন: "আপনার যে যোগসূত্রগুলি রয়েছে সেগুলির সঙ্গে আমাদের সংযোগ করে দেবেন। তারপর জঙ্গী বিভাগের সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক

থাকবে না। এখন থেকে ত পার্টিকে ভবিষ্যতের উপযোগীভাবে গড়ে তোলার দিকেও মন দিতে হবে। আপনাকে দেওয়া হবে সেই দায়িত্ব। আপাতত প্রচার এবং শিক্ষাবিভাগ গড়ে তোলা হবে আপনার কাজ।"

পূর্ণানন্দবাবুর কথা শোনার পর দোটানা মনোভাবটা কেটে যায়। পলায়ন অভিযানে যোগ দিতে সম্মতি জানাই। তিনি ছকটি তৈরী করেছেন যাকে বলে একেবারে নিখুঁত সামরিক ধাঁচে। বাইরে থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। যা কিছু করণীয় তা করতে হবে নিজেদের বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা এবং আগাগোড়া ঘটনাটির অসমসাহসী আকস্মিকতার উপরে ভরসা করে। দিনদুপুরে বন্দীরা পলায়নের চেষ্টা করবে—এ ধারণা জেল-কর্তৃপক্ষ স্বপ্নেও ভাবে নি। সেই element of surprise অর্থাৎ শত্রুপক্ষের হতচকিত হয়ে যাওয়ার সুযোগে যে কয়েক মিনিট অবকাশ পাওয়া যাবে তার মধ্যেই কাজ শেষ করে ফেলতে হবে।

তের নম্বর ডিগ্রী জেলের প্রধান প্রাচীরের খুব কাছে। ওপারে আদি গঙ্গার খাল। তের নম্বর ওয়ার্ডের পাঁচিল ৮½ ফুট উঁচু আর প্রধান প্রাচীরটি হবে উচ্চে প্রায় ১৮ ফুট। পূর্ণানন্দবাবু কি ভাবে যেন তথ্য সংগ্রহ করেছেন। দুই প্রাচীরের মাঝখানে ১০।১২ হাত জায়গা। তার একপাশে উঁচু লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। রেলিংয়ের গায়ের গেটটি তালাবন্ধ থাকে। ডানপাশে আর একটা গেট। সেটা বন্ধ করে দিতে পারলে মাঝখানের ঐ স্থানটি অন্তত কয়েক মিনিটের জন্য সুরক্ষিত হয়। তের নম্বর ডিগ্রীর প্রত্যেক সেলের সামনে 'এন্‌টি-সেল' নামে পরিচিত চারদিকে ঘেরা সঙ্কীর্ণ উঠোন। যে সব বন্দীকে নির্জন কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয় তারা যাতে ইয়ার্ডের প্রাঙ্গণে পা না দিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এইগুলি তৈরী। আমরা তার সুযোগ নেব। একেবারে কোণের সেলে সবাই সমবেত হয়ে 'এন্‌টি-সেল'-এর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলে ছোট প্রাচীরটি বিনা বাধায় ডিঙানো যাবে।

পূর্ণানন্দবাবু ও আমি ছাড়া অন্য পাঁচজন থাকে তের ডিগ্রীতে। আমরা যাতে ছুটির দিনে স্পেশাল ইয়ার্ড থেকে দুপুর বেলায় সেখানে যেতে পারি সেজন্য পূর্ণানন্দবাবু ট্রাইবিউনালের সামনে আরজি পেশ করেছিলেন। অজুহাত হল মামলা পরিচালনার ব্যাপারে সহ-অভিযুক্তদের সঙ্গে পরামর্শ করা। ট্রাইবিউনাল যথারীতি পুলিসের মতামত নিয়ে জেল-কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেছে যে, নিরাপত্তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করে এক ঘন্টার জন্য ঐ অনুমতি দেওয়া যেতে

পারে। সেই অনুসারে যেদিন কোর্ট বন্ধ থাকে সেদিন আমরা তের নম্বরে যাই। মাস দুই ধরে আমরা গোপনে একজনের কাঁধে আর একজন, তার কাঁধে আর একজন চড়ার মহড়া দিয়ে অভ্যাসটা ক্ষিপ্র করে নিয়েছি। হিসাব মত ইয়ার্ডের পাঁচিল টপকে ওপারে প্রধান প্রাচীর ডিঙাতে চারপাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। বিচারাধীন বন্দী হিসাবে ধুতি ব্যবহার করতে পারতাম। ধুতি দিয়ে সিঁড়ি বানানো হবে। তাই বেয়ে ওপারে নামার ব্যবস্থা।

ইতিমধ্যে মামলার শুনানী শেষ হয়ে গিয়েছে। চার্জশীট গঠনের সময় ট্রাইবিউনাল দ্বিজেন রায়ের মুক্তির আদেশ দিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। মুক্তি অর্থাৎ পুনরায় বিনা বিচারে আটক আইনে বন্দী। দ্বিজেন বাবু চলে যাওয়ার পর বড় নিঃসঙ্গ বোধ করি। সহবন্দীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ভবিষ্যৎ রাজনীতির কথা চিন্তা করতেন। আমার সঙ্গে মতের মিল ছিল যথেষ্ট। অন্যদের মধ্যে কেমন যেন অসহিষ্ণুতা। সাম্যবাদের দিকে ঝোঁকটা তাদের অনেকের পছন্দ নয়। এমন কি "স্বাধীন ভারত" ইস্তাহারে যে সব কথা লিখেছিলাম তাও তাদের সমালোচনার বিষয়। দ্বিজেনবাবুর সঙ্গে রাজনীতি ছাড়াও নানা বিষয়ে প্রাণখুলে আলোচনা করা যেত—দর্শন, সাহিত্য, কলা। বৈঠকী গল্পগুজবও হত উচ্চ বৌদ্ধিক মানের। তিনি চলে যাওয়ার পর পলায়ন পরিকল্পনাটাই সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নেয়। পূর্ণানন্দবাবুর মনে আর কিছুর স্থান নেই। প্রতিদিন স্টেটসম্যান খুলেই প্রথমে দেখেন আবহাওয়ার পূর্বাভাস। কবে শুরু হবে প্রবল বর্ষণ আর সেই সুযোগে পরিকল্পনা কার্যকরী করা হবে।

১৯৩৪ সালের ৩১শে জুলাই। মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। তের নম্বর ইয়ার্ডের পাঁচিল টপকে ওপারে নামি সাতজন। পলায়নের ব্যাপারে অগ্রাধিকার লাভ করেছেন যথাক্রমে পূর্ণানন্দবাবু, সীতানাথ ব্রহ্মচারী, হরিপদ দে, নিরঞ্জন ঘোষাল। প্রথম দুজন সংগঠনের কর্ণধার। হরিপদবাবু বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ, নিরঞ্জন ঘোষাল হল অ্যাকশনের নায়ক। আমরা তিনজন—ভোলা দাস, অমূল্য সেন এবং আমি পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা মত প্রথমে যাই ডান দিকের গেট আগলাতে। সেটাকে টেনে কষে বেঁধে ফেলি। সেপাইরা দলে ভারী হয়ে এসে পড়লেও বাঁধন খুলতে কয়েক-মিনিট সময় নেবে।

দীর্ঘ দেহ বলিষ্ঠ চেহারার অমূল্য সেন একটা জলের পাইপ খুলে নিয়ে

এসেছিল। অস্ত্র বলতে ওটাই সম্বল। কিন্তু তার রুদ্রমূর্তি দেখে গেটের ওপারের একক সেপাই এগোতে ভরসা পায় না, বিপদসূচক হুইসিল বাজায়। ইয়ার্ডের ভিতরে ভারপ্রাপ্ত শিখ সুবেদারকে আমাদের কয়েকজন বন্ধু চেপে ধরে রেখেছে বটে তবে ততক্ষণে চারিদিকে হুইসিল পড়ে গিয়েছে। দূর থেকে পলায়নের ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে সান্ত্রীরা দলে দলে ছুটে আসছে। সেন্ট্রাল টাওয়ারে পাগলা ঘন্টি বেজে উঠেছে প্রবল বেগে। সান্ত্রীরা কাছে আসার আগেই আমাদের প্রথম চারজন ওপারে যেতে সমর্থ হয়। ওপারে গিয়ে একজন কাপড়ের সিঁড়িটি ধরে থাকবে এবং এপারের জন তাই বেয়ে নামবে। এই ছিল ব্যবস্থা। অমূল্য সেন ও ভোলা দাসের উপর দায়িত্ব তারা সান্ত্রীদের মহড়া আগলাবে। তারপর যদি সময় পাওয়া যায় তাহলে পাঁচিল ডিঙাবে। আমি ছুটে এসে দড়ি বেয়ে উপরে উঠছি। প্রাচীরের মাথার কাছে এসে ধরার জন্য হাত বাড়িয়েছি। হঠাৎ পড়ে গেলাম ১৮ ফুট নীচে মাটির উপরে। সেপাইরা প্রধান প্রাচীরের বাইরেও গঙ্গার ধার দিয়ে ছুটে আসছিল। তাই দেখে হয় ব্রহ্মচারী নতুবা ঘোষাল কেউ দড়ির অপর প্রান্ত ছেড়ে দিয়ে জলে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হয়েছে।

সান্ত্রীরা গেট খুলে এসে পৌঁছেছে। অমূল্য সেন কিছুক্ষণ তাদের ঠেকিয়ে রেখে আমাকে আবার ইয়ার্ডের ভেতরে ফিরে আসতে সাহায্য করে। নিজেও মাঝের পাঁচিলের উপর থেকে লাফ দিয়ে ভিতরে পৌঁছায়। যখন যাওয়া সম্ভব হল না তখন দুই দেয়ালের মাঝখানে ধরা পড়ে লাভ কি। কিন্তু ভোলানাথ দাসকে সেপাইদের হাত থেকে রক্ষা করা গেল না। তাদের আক্রোশের প্রথম চোট গেল তারই উপর দিয়ে। পাগলা ঘন্টি বেজে চলেছে। বন্দুকধারী পুলিসের দল জেলের চারদিক ঘিরে ফেলেছে। যারা ওপারে পৌঁছাতে পেরেছিল তারা ততক্ষণে উধাও হয়েছে।

দিনদুপুরে কলকাতার বুকের উপরে জেল থেকে চারজন বিচারাধীন বিপ্লবী বন্দীর পলায়ন—জেল-কর্তৃপক্ষ, গোয়েন্দা বিভাগ এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষে মস্ত বড় অপমান। সে অপমানের শোধ তারা নেয় বন্দীদের উপর দারুণ নিপীড়ন করে। কিছুক্ষণ পরে শুনি ভারী লোহার ঝনঝনি আর হাতুড়ি ঠোকার শব্দ। তখন আমরা সবাই যে যার সেলে তালাবন্ধ। পূর্ণানন্দবাবুকে না পেয়ে সান্ত্রীরা আমাকে স্পেশাল ইয়ার্ডে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে। এক এক করে

আমাদের সহ-অভিযুক্তদের সবাইকে পায়ে লোহার ডাণ্ডা-বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হল। দুপায়ে দুটি লোহার আংটা, তার জোড়ের মুখে লোহার ছোট কীলক ঠুকে রিবিট করে লাগানো। আংটা দুটির সঙ্গে হাতখানেক লম্বা দুটি লোহার ডাণ্ডা। ডাণ্ডা দুটির মাথা আংটির মত করে উপরে ছোট আর একটি আংটার দ্বারা সংযুক্ত। ঐ উপরের আংটার সঙ্গে দড়ি ঝুলিয়ে কোমরের সঙ্গে বেঁধে নিতে হয়। রিবিট না কেটে বেড়ি খোলার উপায় নেই। দিনরাতের সঙ্গী জুটলো একটি। ঠিক যেন শরীরের বাহুল্য অঙ্গ। সোজা হয়ে হাঁটার উপায় নেই, হাঁটতে হয় পা ঘুরিয়ে। রাতে ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরতে পায়ে বেড়ি জড়িয়ে বিপত্তির সৃষ্টি হয়। সাধারণত নিয়ম—কয়েদীকে শাস্তি হিসাবে তিন মাসের জন্য বেড়ি পরাতে পারে। আমাদের দেওয়া হয়েছে 'নিরাপত্তা'র কারণে। সুতরাং এ ব্যবস্থা চলতে পারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য।

সেদিন আর ঐ বেড়ি লাগানোর সময়টুকু ছাড়া সেলের দরজা খুলল না। দিন পনেরো চলে ঐ ভাবে। দুই একজন করে খোলে স্নান ও খাওয়ার জন্য। তাদের বন্ধ করে তবে অন্যকে খোলে। পরদিন কোর্টে নিয়ে গেল ডাণ্ডাবেড়ি পরানো অবস্থায়। নিয়ম অনুসারে বিচারাধীন বন্দীকে আদালতে হাজির করার সময় স্বাভাবিক মানুষের অনুরূপভাবে নিতে হবে। জে. সি. গুপ্ত ট্রাইবিউনালের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কিন্তু ট্রাইবিউনালের সভাপতি তাঁকে প্রায় ধমকের সুরে বসিয়ে দিলেন।

পুলিস পাহারার কড়াকড়ি বেড়েছে। প্রিজন ভ্যান থেকে সশস্ত্র পুলিস পরিবেষ্টিত হয়ে ডকে ঢুকব। ঐটুকু পথেও ভ্যান থেকে একজন করে নামিয়ে দুজন রিভলভারধারী গোরা সার্জেণ্টের পাহারায় আমাদের নেওয়া হয়। শরীর তল্লাশের সময় ইচ্ছা করে চূড়ান্ত অপমানের চেষ্টা হত। আমরাও মুখ বুজে সহ্য করতাম না। ফলে প্রতিদিনই সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিত। জেল থেকে প্রিজন ভ্যানে ওঠানো এবং ফেরার সময় ভ্যান থেকে জেলের গেটের ভিতরে প্রবেশের ব্যাপারেও সতর্কতামূলক ব্যবস্থার অন্ত নেই। গেট থেকে ইয়ার্ডে ফেরার পথটুকুতে সঙ্গে চলে লাঠিধারী সান্ত্রীর দল। আমাদের চলতে হচ্ছে দুজন দুজন সারি দিয়ে। ৩০।৩১ জন এক সঙ্গে চলেছি, ডাণ্ডা-বেড়ির ঝনঝন শব্দে জেল মুখরিত করে। মনে পড়ে যায় ছোটবেলায় পড়া কবিতার সেই ছত্রটি—"যারা ডাক দিয়ে গেল

বন্দীশালার শিকল ঝঙ্কারে"। আজ নিজেরাই চলেছি শিকল-ঝঙ্কারে অন্যদের ডাক দিয়ে।

দিন পনেরো পর সেল থেকে ইয়ার্ডের উঠোনে বেরোনো, স্নান খাওয়ার সময় ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা আইন জারী হল। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মেজর পাটনী সাহেব অমানুষ ছিলেন না। কিন্তু এখন আমাদের কোন ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তাঁর হাতে নেই। পলায়নের ব্যাপারে তাঁর সার্ভিস রিপোর্টে কালো দাগ পড়েছে। আই. বি. এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর বলতে চায় যে, তাঁর শৈথিল্যের জন্যই নাকি এটা সম্ভবপর হয়েছে। তবু সেই সিন্ধী ভদ্রলোকটি আমাদের সম্বন্ধে প্রতিহিংসামূলক আচরণ করেন নি। সারাদিনে তিন কিস্তিতে মোট আড়াই ঘণ্টা মুক্ত আকাশের নীচে থাকবার অনুমতি পাওয়া গেল। বাকী সময়টা একলা সেলে বন্ধ।

সহ-অভিযুক্তেরা একত্রে মিলিত হতে পারি শুধু কোর্টে. ডক নামধারী ঐ খাঁচাটুকুর ভিতরে। সেটুকু সুবিধাও বন্ধ হয়ে গেল মাস দুই পরে। সরকার পক্ষ এবং আসামী পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষ হল ২রা অক্টোবর। মামলার রায় বেরোবে নাকি ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসে।

এতদিন পলায়ন পরিকল্পনায় মন থাকত সব সময়ে চাপা উত্তেজনায় ভরা। এখন সে উত্তেজনা নেই। প্রতিদিন কোর্টে যাওয়া আসার সময় পুলিসের সাথে সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকলেও সেই দিনগুলিও মোটের উপরে দ্রুতবেগেই কেটে চলেছিল। ছয় সাত ঘণ্টা বন্ধুরা একত্রে থাকার সুযোগ পেতাম। কোর্টে যাওয়া বন্ধ হওয়ার পর সময় কাটাবার কোন অবলম্বন নেই। জেলে কর্তৃপক্ষ সেই ৩১শে জুলাই সন্ধ্যায় খানাতল্লাশের নামে সমস্ত বইপত্র কেড়ে নিয়ে গিয়েছে। সারারাত মাথার উপরে জোরালো বিজলী বাতি জ্বলে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট কিছুক্ষণ পর পরই ভারী বুটের আওয়াজে বারান্দা ধ্বনিত করে দেখতে আসে আমরা ঠিক আছি কিনা। দিনের বেলায় যেটুকু সময় সেলের বাইরে থাকতে পাই তখন শুধু স্পেশাল ইয়ার্ডের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা বা কথাবার্তা হয়। সেই বরাদ্দ সময়টুকুও সব দিন পাই না। আকাশে মেঘের লক্ষণ দেখা দিলেই সেণ্ট্রাল টাওয়ারের উপর থেকে প্রহরী ইয়ার্ডের সান্ত্রীদের হেঁকে বলে "পানি আতা হ্যায়, বন্ধ করো।"

দিনে চার পাঁচ বার সেল তল্লাশি হয়। শুধু আমাদের জন্যই নয়, সমস্ত

রাজনৈতিক বন্দীর জন্যই এই ধরনের কড়াকড়ি প্রচলন করা হয়েছে। কড়াকড়ি হয়েছে আরও অনেক ব্যাপারে। অসুস্থ হলেও সহজে কাউকে জেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে চায় না। এমন দিন গিয়েছে যে, কোন বন্ধু গুরুতরভাবে পীড়িত হয়ে পড়েছে। অথচ খবর দেওয়া সত্ত্বেও ডাক্তারের দেখা নেই। বাধ্য হয়ে আমরা মরীয়া উপায় অবলম্বন করেছি ডাক্তার না এলে বন্ধ হব না। এতগুলি বন্দীকে জোর করে সেলে ঢোকানো সহজ নয়। তাই তখন ডাক্তার জেলার প্রভৃতির টনক নড়েছে। গান করা নিয়েও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গণ্ডগোল হয়। "কারার ঐ লৌহকপাট, ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট" গানটি শুনলেই কর্তৃপক্ষ আতঙ্কিত হয়ে উঠত।

ডাণ্ডা-বেড়ি নিয়ে চলতে চলতে পায়ে প্রথমে ফোস্কা, পরে কড়া পড়ে গেল। গোড়ালিতে সেই চিহ্ন আজও বহন করে চলেছি। গায়ক বন্ধুরা বন্ধ হওয়ার পর বেড়ির আংটা ঠুকে ঠুকে গানের সঙ্গে তাল রাখেন। যাকে কোনমতে এড়ানো যাবে না তাকে সহজ ভাবে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি! কালের গতি যেন থেমে গিয়েছে! একলা একলা বসে মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাড়ি দিতে দিতে হাঁপিয়ে উঠি। অথচ তার কোন অন্ত নেই। বাধ্যতামূলকভাবে কর্মহীন সময়ের সমুদ্র পাড়ি দেওয়া যে এত কঠিন তাই কি আগে কখনও ভেবেছি? এদিকে পালানোর ব্যাপারে পুলিস তদন্ত করছে। তারপর একদিন তের নম্বর ডিগ্রীর প্রাঙ্গণেই সনাক্তকরণ প্যারেডের প্রহসন হল। কয়েকজন সান্ত্রী এবং একজন কয়েদী আমাদের সনাক্ত করে।

হরিপদবাবু ৩১শে সন্ধ্যায় ধরা পড়ে আবার আলিপুর জেলে প্রেরিত হয়েছেন। পলায়ন প্রচেষ্টার অপরাধে আসামী হলাম চারজন—ভোলা দাস, অমূল্য সেন, হরিপদ দে এবং আমি। এই মামলার বিচার হল জেলের ভিতরেই। বাইরে থেকে ম্যাজিস্ট্রেট এলেন। সরকারের প্রতি আনুগত্যের পুরস্কার হিসাবে তিনি ইতিপূর্বে 'রায় বাহাদুর' খেতাব লাভ করেছেন। আমাদের প্রত্যেকের দুই বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হল। রায়ে ম্যাজিস্ট্রেট বিশেষ ভাবে উল্লেখ করলেন যে, শাস্তির দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরূপে গণ্য করা হবে। সহ-অভিযুক্তদের মধ্যে যারা ইতিপূর্বে দণ্ডিত হয়েছে তাদের সঙ্গে স্থান লাভ করি চোদ্দ নম্বর ডিগ্রীতে। এই জেলে সবচেয়ে খারাপ এবং সঙ্কীর্ণতম ইয়ার্ড হল চোদ্দ ডিগ্রী।

সেলের সামনে 'এন্‌টি-সেল' তের ডিগ্রীতে থাকলেও তার বাইরের উঠোন অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। এখানে 'এন্‌টি-সেল' থেকে বাইরে মাত্র তিন চার হাত চওড়া জায়গা নিয়ে প্রাঙ্গণ, তারপরই পাঁচিল। সবাই এক সঙ্গে বেড়ানো দূরের কথা, দু-তিন জন পাশাপাশি দাঁড়ালে স্থানাভাব হয়। সকলের ডাণ্ডা-বেড়ি এক সঙ্গে ঝনঝনিয়ে উঠলে কারও কথা অন্যের কানে যায় না। সেলগুলি এমন ভাবে তৈরী যে, শীতের দিনে সারা সকাল ও দুপুর সূর্যের আলো ভিতরে প্রবেশ করে না। অথচ বিকাল সাড়ে চারটার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোদের জন্য টেঁকা যায় না। না টিঁকেই বা উপায় কি! জাঙ্গিয়া কুর্তা পরা, হাঁটুর উপর থেকে গোড়ালি পর্যন্ত পা অনাবৃত। কুর্তা হাতকাটা।

নভেম্বর মাস। পায়ের লোহার ডাণ্ডা-বেড়ি শীতে বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে থাকে। বসতে বা রাতে শোয়ার সময় উরুদেশে তার স্পর্শ শীতের কষ্টকে তীব্র করে তোলে। সম্বলের মধ্যে তিনখানা খসখসে কম্বল! একখানা শয্যা হিসাবে ব্যবহার করতে হবে, একখানা মাথার উপাধান আর একখান গায়ে দেওয়ার জন্য। কম্বলের ফাঁকে শীত প্রবেশ করে। সেলের দরজা তালাবন্ধ বটে, কিন্তু গরাদের ফাঁক দিয়ে হিমেল হাওয়া ঢোকার পথ ত বন্ধ নয়। গায়ে দেওয়ার জন্য কম্বলের কুর্তা আছে বটে তবে তা এমনই জিনিস যে, পরিধান করার অর্থ স্বেচ্ছায় বাড়তি শাস্তি ভোগ করা। জেল কোডে ব্যবস্থা আছে শীতের সময় একখানা কম্বল অতিরিক্ত দেওয়া হবে। তবে আইনত শীতকাল আরম্ভ হবে ১৫ই ডিসেম্বর, ইতিমধ্যে যত প্রচণ্ড ঠাণ্ডাই পড়ুক না কেন। ভোর পাঁচটার সময় জেলার সাহেব রাউণ্ডে আসবে। তখন উঠে দরজার কাছে দাঁড়াতে হবে। শীতার্ত শেষ রাত্রে ঘুম জড়ানো চোখে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াই। সারাটা সকাল সেলের মধ্যে কম্বল জড়িয়ে বসে তৃষ্ণার্ত নয়নে চেয়ে দেখি 'এন্‌টি-সেল' দেয়ালে এক ফালি রোদ এসে পড়েছে। সেলের ভিতরে আসার তার হুকুম নেই। প্রকৃতির তাগিদ মিটাবার জন্য সেই টুকরি এখন চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী। তিন কিস্তিতে যে আড়াই ঘণ্টা সময় আকাশের নীচে থাকার সময় পাই সেটুকুকে কৃপণের ধনের মত ভোগ করতে চাই।

সারা জেলে চলেছে সন্ত্রাসের রাজত্ব। অন্যান্য ইয়ার্ডের রাজনৈতিক বন্দীরাও তার শিকার হয়েছে। সামান্য উপলক্ষ নিয়ে আরো দুদিন অন্য ইয়ার্ডে পাগলা ঘণ্টি পড়েছে। লাঠি চার্জে কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী আহত হয়েছে। মেজর

পাটনী বদলি হয়েছেন। নতুন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসার সঙ্গে সঙ্গে কাজ এবং অন্যান্য হুকুম নিয়ে জেল-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদের নিত্য নতুন সংঘর্ষ শুরু হয়। রোজই নানা ধরনের খামখেয়ালী হুকুম চাপাবার চেষ্টা হচ্ছে। এর কাছে নতি স্বীকার করলে রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখা যাবে না। তাই আমরা সবাই মিলে গোড়া থেকেই অহিংস প্রতিরোধের নীতি গ্রহণ করি। জেল কোডে যত রকম শাস্তির ব্যবস্থা আছে কর্তৃপক্ষ একের পর এক সেই সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার শুরু করেছে। বন্দীদের ইতিহাস-টিকিটগুলি শাস্তিনামার লাল কালির অক্ষরে লাল হয়ে ওঠে।

জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বদলি হয়ে অন্য সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসেন। তিনি কিছুটা স্বাধীনচেতা বিবেচক ব্যক্তি বলে কড়াকড়িটা একটু কম হয়, সংঘর্ষের উপলক্ষ হ্রাস পায়। কিন্তু তা হল উনিশ বিশের তফাত। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কঠোর নির্দেশ 'সন্ত্রাসবাদী বন্দীদের শায়েস্তা করতে হবে'। এ এক ভিন্ন ধরনের লড়াই—যতটা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি লড়াই চলে নিজের সঙ্গে। প্রতিদিন সহিষ্ণুতা আর সঙ্কল্পের দৃঢ়তার নতুন করে যাচাই হয়। বস্তুত ১৯৩৪ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯৩৬ সালের শেষভাগ পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন জেলে বিপ্লবী বন্দীরা দিনের পর দিন যে রকম অনমনীয়-ভাবে জেল আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ চালিয়েছে তা যে কোন খাঁটি অহিংসপন্থীর পক্ষেও গর্বের বিষয় হতে পারে।

পলায়ন প্রচেষ্টার মামলায় তিনমাস দণ্ডভোগ করার পর এক সন্ধ্যায় খবর আসে যে, আপীলে আমি আর অমূল্য সেন অব্যাহতি পেয়েছি। আমাদের বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী ছিল যে কয়েদীটি, সে আমাদের উকীলের জেরার মুখে কিছু উল্টোপাল্টা কথা বলেছিল। সেই অসঙ্গতিটা আপীলের বিচারে আমাদের অনুকূল হয়েছে। আবার বিচারাধীন বন্দী। দণ্ডিত বন্ধুদের ভাগ্যে যেসব শাস্তি আসছিল তা থেকে রেহাই পাওয়া গেল সাময়িকভাবে।

মূল মকদ্দমার রায় দেওয়ার কথা ছিল ২রা জানুয়ারি। এর মধ্যে স্পেশাল ট্রাইবিউনালের একজন জজ মারা গেলেন। ফলে রায়দান স্থগিত হল এবং আমাদের পক্ষে তা হয়ে দাঁড়ায় দুশ্চিন্তার কারণ। পুলিস এই অজুহাতে মকদ্দমা গোড়া থেকে (de novo) আবার প্রথম থেকে শুরু করার চেষ্টায় ছিল। তাতে শুধু হাজতবাসের কালটাই দীর্ঘ হত না। আরও গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা

ছিল। কেন না পরে যে সব সাক্ষ্যপ্রমাণ পুলিসের হস্তগত হয়েছে সেগুলি হাজির করে কয়েকজনের বিরুদ্ধে কেস আরও সঙ্গীন করার চেষ্টা চলছিল। যাহোক, শেষ পর্যন্ত তা হল না। কিন্তু সরকার পক্ষের প্রধান উকীল মারা যাওয়াতে রায়দান আরও পিছিয়ে গেল। এই মাসচারেক সময় সকলের পক্ষেই একটা নিতান্ত অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কেটেছে। অবশেষে দীর্ঘপ্রতীক্ষা শেষ হল একদিন। ১৯৩৫ সালের ১লা মে শেষ বারের মত কোর্টে গেলাম। পূর্ণানন্দবাবু এবং নিরঞ্জন ঘোষাল আবার ধরা পড়ায় পুলিস তাদেরও হাজির করেছে।

ট্রাইবিউনালের সভাপতি মিঃ জেমসন রায় পড়ে শোনালেন। প্রভাত চক্রবর্তী, জিতেন গুপ্ত, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, সীতানাথ ব্রহ্মচারী এবং আর দুই জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তিন জনের দশ বৎসর, নয় জনের সাত বৎসর, ছয় জনের তিন বৎসর এবং দুই জনের এক বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ড। আমার হল সাত বৎসর। প্রমাণ অভাবে মুক্তি লাভ করে পাঞ্জাবের লছমী নারায়ণ শর্মা, বর্মার সঞ্জীব মুখার্জি এবং আর দুইজন। অনেকেরই হাজত-বাস হয়েছে আড়াই বৎসর। সেই কথা বিবেচনা করেই নাকি ট্রাইবিউনাল দণ্ডের মেয়াদ স্থির করেছে।

রায় বেরোবার মাসখানেকের মধ্যেই আমাদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে পাঠিয়ে দেওয়া হল বিভিন্ন সেন্ট্রাল জেলে। একসঙ্গে এক জেলে থাকলে যদি আবার কোন অঘটন ঘটাই! আবার বন্ধুদের কাছে বিদায় নেওয়ার পালা। বিদায় একদিন নিতেই হবে সে ত জানা। তবু মানুষের মন বিষাদে ভরে ওঠে। আমরা সাত জন চলেছি মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে পৌঁছে এই সাত জনের মধ্যেও ছাড়াছাড়ি হবে। তিন জনকে করা হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী। বাকী চারজন তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী।

প্রিজন ভ্যানে হাওড়া স্টেশনে এলাম। প্ল্যাটফর্ম দিয়ে চলেছি সাত জন। পায়ের বেড়ি ঝনঝন শব্দে আশপাশের লোকজনকে সচকিত করে তুলছে। হাতে হাতকড়ি, কোমরের দড়ি ধরে চলেছে চারিধারে সশস্ত্র প্রহরী। বাইরে তখন সন্ত্রাসবাদ দমন আইনের এমনই তাণ্ডব চলেছে যে, সাধারণ মানুষ দূর থেকে তাকিয়ে দেখে, কাছে আসার সাহস পায় না। কানে গেল দু-একজন বলাবলি করছে: টেররিস্ট বন্দী। ভদ্রঘরের ছেলের চেহারা বলেই

সম্ভবত চোরডাকাত ঠাওরায় নি। একজনকে বলতে শুনি, "হাতে পায়ে বেড়ি, তবু এরা চলেছে কেমন নির্ভীকভাবে"।

মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে পৌঁছাই সন্ধ্যায়। গোটা মেদিনীপুর জেলা জুড়ে তখন পুলিস রাজ। শহরে ত বটেই। জেল গেটে পা দিতেই বোঝা গেল যে, এখানে দিন কাটবে জেল-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অবিরাম সংঘাতের মধ্য দিয়ে। রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্য কুখ্যাত একটি ডেপুটি জেলার আমাদের শোনায়; "আলিপুর ত আরামের জায়গা। জেলখানা কাকে বলে তা মালুম হবে এই মেদিনীপুরে।" এই জেলটি সেই সময় শুধু সারা বাংলায়ই নয়, সারা ভারতেও নামকরা। নানা প্রদেশ থেকে "দুর্দান্ত" বন্দীদের আনা হয় শায়েস্তা করার জন্য। যে সব বন্ধু তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হয়েছে তাদের নিয়ে গেল অতি কুখ্যাত "পশ্চিম ডিগ্রী"তে।

সামনাসামনি দুই সারি সেল, পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত। দুটি সারির মাঝখানে স্বল্পপরিসর একটু বারান্দা, উপরে ছাদ। পাথরে তৈরী দোতলা। গরমের দিনে হাওয়া চলাচল করে না, শীতকালে অত্যন্ত ঠাণ্ডা। বর্ষায় সেলের পিছন দিকের গরাদে ঘেরা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট এসে ঘর ভিজিয়ে দেয়। সেলের ভিতরে সূর্যালোক কখনই প্রবেশের পথ খুঁজে পায় না। দিনের বেশির ভাগ সময় বন্ধ থাকতে হয়, ঐ বারান্দাটুকুতে বেরোনর হুকুম নেই। অথচ বারান্দার প্রান্তে তালাবন্ধ লোহার গেটে সান্ত্রী সব সময় মোতায়েন। দিনে তিন দফায় মোট চার ঘণ্টার জন্য ইয়ার্ডের প্রাঙ্গণে খোলা আকাশের নীচে আসার সুযোগ দেওয়া হয়।

আমরা যারা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত তাদের স্থান হল 'বিশ ডিগ্রী'তে। পশ্চিম ডিগ্রীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল অর্থাৎ আলোবাতাসের পথ একেবারে রুদ্ধ নয়। বিশটি সেল, তিন ভাগে ভাগ করা। প্রথম দশটিতে বিপ্লবী বন্দীদের থাকার ব্যবস্থা। বাকী অংশের মাঝখানে উঁচু পাঁচিল তোলা, যাতে অন্য বন্দীদের সঙ্গে আমাদের কোন রকম সংযোগ না ঘটে। সুতরাং সামনে ও পাশে তিনদিকে পাঁচিল ঘেরা ১০।১২ হাত উঠানই আমাদের দুনিয়া। সেখানে ঘোরার সময় পাই সেই তিন কিস্তিতে চার ঘণ্টা। সকালে এক, দুপুরে স্নানাহারের জন্য এক এবং বিকালে দুই ঘণ্টা। উপরে আকাশ দেখা যায় বটে, তবে নীচে যেদিকে তাকাই মেদিনীপুরের লাল মাটি লেপা দেয়াল যেন ঘাড়ের

উপরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মনে হয় সারা পৃথিবীতে আমরা ৭।৮ জন বন্দী, সান্ত্রী ও একজন 'ফালতু' ছাড়া বোধহয় আর কোন জনপ্রাণী নেই।

মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল তৈরী হওয়ার আগে এখানে নাকি ছিল একটি আস্তাবল। পাথরে তৈরী সেলগুলির ভিতরে প্রবেশ করলে তা বেশ বোঝা যায়। সামনে 'এন্‌টিসেল'। সেলে বন্ধ হলে 'এন্‌টিসেল'-এর দেয়ালের উপর দিয়ে আকাশের এক টুকরো মাত্র চোখে পড়ে। পরের দিন সকালে অন্য বন্ধুদের মুখে এখানকার অবস্থার বিবরণ শুনি। আলিপুর জেলে শুধু আমাদের মামলার আসামীদের ডাণ্ডাবেড়ি পরানো হয়েছিল। এখানে প্রত্যেক রাজনৈতিক বন্দীর জন্য সেই ব্যবস্থা। কেউ হয়ত ডেটিনিউ হিসাবে গ্রামে অন্তরীণ ছিল এবং অন্তরীণ অবস্থার নিয়ম ভঙ্গ করার অপরাধে ছয় মাসের জন্য দণ্ডিত হয়ে এসেছে। দণ্ড শেষে আবার সেখানে ফিরে যাবে। তারও রেহাই নেই।

নিখিল গুহরায় বৃদ্ধ, বাতে পঙ্গু, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আন্দামানে নির্বাসিত হয়েছিলেন। এই অধ্যায়েও কিছু দিনের জন্য সেখান থেকে ঘুরে এসেছেন। তাঁকে স্বদেশের জেলে ফেরত পাঠানো হয়েছে চিকিৎসকের পরামর্শে, স্বাস্থ্যের কারণে। তাঁর পায়েও ডাণ্ডা-বেড়ি। শুনি আরো ছোটখাটো নানা ঘটনার কথা।

মরণাপন্ন রোগী না হলে কোন রাজনৈতিক বন্দীকে জেল হাসপাতালে নেওয়া হয় না। হাসপাতালে নেওয়ার পরও ডাণ্ডাবেড়ি পায়েই থাকে। চট্টগ্রামের একটি অল্পবয়স্ক ছেলে টি. বি. রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ছিল। তার যখন নাভিশ্বাস উপস্থিত তখন মাত্র পায়ের বেড়ি খোলা হয়। ছেলেটির মা ঐ জেলেই ফিমেল ইয়ার্ডে বন্দিনী ছিলেন, একজন পলাতক বিপ্লবীকে আশ্রয়-দানের অপরাধে দণ্ডিত হয়ে। অথচ ছেলের শেষ সময়ে তাঁকে দেখা করার সুযোগ দেওয়া হয় নি। সন্তানের মরামুখ দেখতে দিয়ে জেল কর্তৃপক্ষ করুণার পরাকাষ্ঠা দেখায়।

মেদিনীপুরে তখন আই. বি. এবং খড়গপুরের ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়ে-শানের নির্দেশেই কার্যত জেলের ভিতরে ও বাইরে প্রশাসন পরিচালিত হচ্ছে। জেল আইনভঙ্গের অপরাধে বাইরে থেকে হাকিম এসে বিচারে অতিরিক্ত দণ্ড দিয়ে যায়। যে ব্যক্তি ছয় মাসের মেয়াদে জেলে এসেছিল তার দণ্ডের পরিমাণ

হয়। আমাদের বইগুলির পাতায় পাতায় Terrorist ছাপ দিয়ে চিহ্নিত করা হত। অ্যাণ্ডারসন সাহেব এক বক্তৃতায় বলেছিলেন : "টেরোরিস্টদের জন্য যাতে দেশের প্রতিটি গৃহের দ্বার রুদ্ধ হয়, তাদের নাম শুনলে প্রতিটি মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয় এমনই অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে।" গভর্নমেন্ট বাইরের জগতে সে অবস্থা সৃষ্টিতে সমর্থ হয় নি। সম্ভবত সেই কারণে জেলের মধ্যেই এই আয়োজন। ঐ জেলার ভদ্রলোকটি সব সময় এমন সব হুকুম জারী করত যাতে আমরা আইনত স্বীকৃত ও প্রাপ্য সুবিধাগুলি থেকেও কার্যত বঞ্চিত হই।

রাতে পড়ার জন্য দশটা পর্যন্ত প্রত্যেক সেলে একটা লণ্ঠন পাওয়ার নিয়ম ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীদের বেলায়। লণ্ঠন যদি বা পাওয়া যায় তার আলোয় পড়া সম্ভব নয়। নিজের খরচে সেন্সরের অনুমোদিত বই পড়ার অধিকার আছে। আমাদের কাছে এক সঙ্গে পাঁচখানা পর্যন্ত বই থাকতে পারবে, অবশিষ্ট-গুলি জমা থাকবে জেল গেটে। পাঁচখানা ফিরিয়ে দিয়ে নতুন পাঁচখানা আনা চলে। কিন্তু নতুন হুকুম জারী হল যে, জেল গেটে অত বই রাখার জায়গা নেই, সুতরাং দুখানা মাত্র রেখে সব বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হবে। নতুবা সেগুলি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

সবাই দীর্ঘমেয়াদী বন্দী, নিজ নিজ জেলা থেকে দূরদূরান্তরের জেলে আটক রয়েছি। সেখান থেকে বই আনানো এবং ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী হওয়াতে 'খাটুনি' অত কঠোর ছিল না। তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের বেলায় জাঁতায় গম ভাঙ্গা ধরনের কঠিন শ্রমসাধ্য কাজ প্রচলনের চেষ্টা শুরু হল। কয়েক মাস আগে কর্তৃপক্ষ পশ্চিম ডিগ্রীর বন্ধুদের কতকগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—যথা ডাণ্ডাবেড়ি খোলা, রাতে পড়ার সুযোগের জন্য সেলে বইপত্র এবং আলো দেওয়া হবে ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলি পূরণ করা ত হচ্ছেই না, উপরন্তু অনেক অপমানজনক নিয়ম চালাবার চেষ্টা শুরু হয়।

কর্তৃপক্ষের বশংবদ সাধারণ কয়েদীদের দ্বারা রাজনৈতিক বন্দীদের অপমান করতে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। বন্দীরা সমবেতভাবে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে একদিন সামান্য একটা ছুতোয় পাগলাঘণ্টি বাজিয়ে দিয়ে নিরস্ত্র বন্দীদের উপরে লাঠি চালনা হল। কয়েকজনের আঘাত বেশ গুরুতর। অমূল্য সেনের বলিষ্ঠদেহ বোধ হয় সান্ত্রীদের আক্রোশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লাঠির আঘাতে তার

বাঁ হাতের হাড় ভেঙ্গে যায়। ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি এখানেই নয়। জেলের সেপাইকে প্রহারের দায়ে বাছা বাছা কয়েকজনকে অভিযুক্ত করা হল! বিচারের প্রহসন বসে জেলেরই ভিতরে। অভিযোগকারীরাই সাক্ষী। অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ নেই। একজন নিতান্ত খয়ের খাঁ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এসে আসামীদের দুই বৎসর করে দণ্ড দিয়ে গেল। মূল দণ্ডের মেয়াদ শেষ হলে তবে এই শাস্তিভোগ শুরু হবে সে কথাটি রায়ে বিশেষভাবে উল্লেখের দ্বারা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পুঙ্গব তার রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। পরদিন জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাপ্তাহিক রাউণ্ডে এলে আমরা সকলে সমবেতভাবে কর্তৃপক্ষের এই জঘন্য আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

তখন হাইকোর্টে আমাদের মকদ্দমার আপীলে শুনানী চলেছে। সেই সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শের জন্য যাতে আমাদের উকীল কলকাতা থেকে এসে সাক্ষাৎ করেন সেজন্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করেছি। নিয়ম ছিল যে, উকীলের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আই. বি. কর্মচারী উপস্থিত থাকলেও তাকে আমাদের আলোচনা শ্রুতিগোচর হওয়ার মত দূরত্বের বাইরে থাকতে হবে। জেল-কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা হল যে, এই নিয়মের সুযোগ নিয়ে সম্ভবত পাগলাঘন্টির ও তার পরবর্তী পরিস্থিতির খবর বাইরে পাঠাব। তাই হঠাৎ পরদিন সকালে জানলাম যে, আমি ও আমার দুজন সহ-অভিযুক্তকে সেইদিনই রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হবে।

রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলের হর্তাকর্তা সেই লিউক সাহেব। গুলিতে আহত হবার পর কয়েক মাস ছুটিতে থেকে আবার কাজে যোগ দিয়েছে। এবার তার আচরণ নাকি আগের তুলনায় অনেকটা সংযত। তবু বিপ্লবী বন্দীদের সম্বন্ধে তখন সমস্ত সেন্‌ট্রাল জেলে প্রায় একই ধরনের ব্যবহার চলেছে। তফাত বলতে উনিশ-বিশ। আমার স্থান হল এখানেও বিশ ডিগ্রীতে। মাঝখানে সামনাসামনি দুই সারি সেল, তার মাঝে আবার মানুষ সমান উঁচু দেয়াল এক সারির সেল থেকে অন্য সারির সেলে যাওয়ার পথে দুই গেটে কয়েদী পাহারাদার। ইয়ার্ডে ঢোকার গেটে সাস্ত্রী ত আছেই।

সেলগুলি এমনভাবে তৈরী যে, বাইরে ঝড় হলেও ভিতরে বাতাস ঢোকে না অথচ ধুলোবালিতে ভরে যায়। ইয়ার্ডের বেষ্টনী প্রাচীর প্রায় জেলের প্রধান প্রাচীরের সমান হবে উচ্চতায়। জেলের ভিতরে জেল। মাথার

উপরের আকাশ বাদ দিলে ইঁটের দেয়াল, সিমেণ্টের পালিশ আর লোহার গরাদ ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ে না। উঠানে একটা ঘাসের ডগা পর্যন্ত নেই। ওরই ভেতরে আবার ২০ ঘণ্টা সেলে বন্ধ থাকতে হয়। সকালে ৭টা থেকে ১১টা পর্যন্ত একটা সেলে ৫।৭ জন বন্ধ হই খাটুনির জন্য। চৌকিদারের কুর্তা সেলাই করতে হয়। একধারে সিঙ্গার মেসিন নিয়ে কয়েদী দরজী বসে। মেসিনের অনবরত ঘড় ঘড় শব্দ আর ইঁট পাথর এবং লৌহদ্বারের পরিবেশ ভগ্নস্বাস্থ্য শরীর ও মনের উপর বড় অস্বস্তিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

জেলের ডাক্তারদের রেওয়াজ হল যে, অসুখের কথা বলতে গেলে তারা ধরে নেয় খাটুনি বা জেল-শৃঙ্খলার কঠোরতা এড়াবার জন্য আমরা অসুখের ভান করি। অবশ্য ব্যতিক্রম যে ছিল না সে কথা বলাও অন্যায় হবে। তবু ত যে সব বন্ধু তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত তাদের তুলনায় অনেক ভাল আছি। দুপুরের পর এবং রাত্রে নিজের সেলটুকুর মধ্যে ইচ্ছামত নড়াচড়া করতে পারি।

আমাদের সহ-অভিযুক্তদের কয়েকজন আছে অন্য ইয়ার্ডে। তাদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ বা যোগাযোগের উপায় নেই। যারা জাল ডিগ্রীতে বন্ধ তারা সব সময় পরস্পরের সাহচর্য পায় বটে তবে ব্যক্তিগত (privacy) আব্রু বলে কোন কিছুর বালাই নেই সেখানে। দিনের মধ্যে বেশিক্ষণ সময় তাদের হিংস্র পশুর মতই জালের খাঁচায় বন্ধ হয়ে থাকতে হয়। সে খাঁচা আমাদের সেলের তুলনায় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। হেম ভট্টাচার্য টি. বি. রোগে আক্রান্ত হয়ে জেল হাসপাতালে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। তাকে একবার দেখবার অনুমতি চেয়ে নিরাশ হতে হয়।

তখন রাজসাহী জেলের মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন গুপ্ত। স্বাধীনচেতা এই ভদ্রলোকের সঙ্গে মিঃ লিউকের বনিবনাও ছিল না। স্বরাষ্ট্র দপ্তরও তাঁর প্রতি প্রসন্ন নয়। তবে তিনি একাধারে সিভিল সার্জন পদে অধিষ্ঠিত থাকাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর প্রত্যক্ষভাবে তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করতে পেরে ওঠে না। ক্যাপ্টেন গুপ্ত আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে জেল হাসপাতালে পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। হাসপাতালে দোতলার এককোণে দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং অপর কোণে তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের থাকার ব্যবস্থা। অন্য রোগীদের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি নেই।

দিনের বেলায় হেম ভট্টাচার্যকে দূর থেকে দেখি। নীরবে দৃষ্টিবিনিময় হয়। রাতে লক-আপ হওয়ার পর কয়েদী মেট বা পাহারার সহযোগিতায় দুই এক মিনিটের জন্য মুমূর্ষু বন্ধুর শয্যার পাশে যেয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পাই।

যে মাস দুই হাসপাতালে ছিলাম সেই সময়টাতে মনে হত যেন নবজীবন লাভ করেছি। হাসপাতাল কম্পাউণ্ডে গাছপালা, জেলের ফটকে যাওয়ার পথের বাঁ পাশে সবুজ ঘাসে ঢাকা ছোট্ট মাঠটি চোখ জুড়িয়ে দেয়। জেলের পাঁচিলের ওধারে দেখা যায় পদ্মাকে। সেই প্রিয় পরিচিত পদ্মার বাঁধ। বর্ষায় ভরা নদীর দুরন্ত জলস্রোত। বড় ডাকঘরের পাশে কৃষ্ণচূড়ার গাছটি—সব কিছুর দিকে তৃষিত আকুল নয়নে চেয়ে থাকি। চাতক পাখী কি এমন আগ্রহ নিয়ে মেঘের পানে চেয়ে রয়? আমার গোটা স্নায়ুমণ্ডল, সমগ্র অনুভূতি সবুজের একটু ছোঁয়া এবং প্রকৃতির এতটুকু পরশের জন্য এত তৃষ্ণার্ত হয়ে ছিল!

হাসপাতালে থাকতেই খবর পাই যে, আমাদের আপীলের নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। হওয়ার কথা ছিল অনেক আগে। ট্রাইবিউনালের রায়ের পর অতিবাহিত হয়েছে প্রায় পনের মাস। ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বরে সম্রাট পঞ্চম জর্জের মৃত্যু উপলক্ষে শোক প্রকাশের জন্য হাইকোর্ট এতদিন ছুটি ছিল। তাই এত দেরি। প্রায় সকলেরই দণ্ড বহাল আছে। জেল অফিস থেকে আমাদের জানানো হল যে শীঘ্রই এক অজ্ঞাত স্থানে যেতে হবে। কোথায় যেতে হবে তা সবাই জানে। কিন্তু সরকারীভাবে আগেভাগে জানাবার নিয়ম নেই। দ্বীপান্তরে যাওয়ার আগে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা আছে। জেল-কর্তৃপক্ষই খবর বাড়ীতে দেয়।

কেন্দ্রীয় আইন সভায় রাজনৈতিক বন্দীদের আন্দামান পাঠাবার নীতি সম্বন্ধে স্বরাজ্য দলের সমালোচনার চাপে ভারত সরকার দুটি বিষয়ে দয়া দেখাতে রাজী হয়েছিল। পাঁচ বৎসরের কম সাজা প্রাপ্ত কাউকে পাঠানো হবে না এবং যাদের পাঠানো হবে তাদের যাওয়ার আগে আপনজনের মুখ দেখার সুযোগ দেওয়া হবে। মায়ের সঙ্গে দেখা হল। দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে বুঝি বন্দিনী দেশজননীরই বিষণ্ণ আননের ছবি দেখতে পাই আমার মানবী মাতার মুখে।

যাব আন্দামানের নির্বাসনে। আন্দামান, ভারতের বিপ্লবী সৈনিকদের তীর্থক্ষেত্র। প্রথম মহাযুদ্ধের যুগের বিপ্লবী বন্দীদের অনমনীয় প্রতিরোধ সংগ্রামের শত স্মৃতি বিজড়িত পোর্টব্লেয়ারের সেলুলার জেল। এবারও তিন

শহীদের আত্মদানে তা পবিত্র হয়েছে। সব চেয়ে বড় কথা, নানা দলের এবং নানা প্রদেশের বন্দীরা রয়েছে সেখানে। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা নিভু্র্ল কর্মপন্থা রূপায়িত হবে বলে আশা করি। শুনেছি যে, সেখানে অনেকেই সুনির্দিষ্টভাবে সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হয়েছে। ভাবি, যেন আন্দামান ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করে।

দেশ ছেড়ে চলেছি আর পিছনে ফেলে চলেছি বাঙলার জেলের দিনগুলিকে। কিন্তু তাদের কথা কি ভুলতে পারি, না কোনদিন পারব? তারা মনের পরতে পরতে যে ছাপ রেখে গিয়েছে তার অদৃশ্য প্রভাব আমার গোটা উত্তর জীবনের পথ চলার উপরে স্থায়ী হয়ে থাকবে। বিশেষ করে মেদিনীপুর জেলের সেই প্রায় এক বৎসরের প্রতিটি দিন—আত্মদ্বন্দ্ব আর আত্মজিজ্ঞাসার অজস্র চিহ্নে ক্ষতবিক্ষত হয়ে রয়েছে। প্রিয় স্মৃতি ত নয়। অত্যন্ত রূঢ় নির্মম তাদের পরশ। আঘাতের পর আঘাতে যেন আমাকে যাচাই করে নিয়েছে। ঢালাই করে পরিণত করেছে কঠিন ইস্পাতে।

এতক্ষণ ত শুধু সরকারী পশুশক্তির সঙ্গে সংগ্রামের কথাই বলেছি। সেটা ত বাইরের দিক। নিজের অন্তরে নিরন্তর যে দ্বন্দ্ব চলেছে তার তীব্রতা যেন আজও অনুভব করতে পারি। মানুষের মন—প্রতিনিয়ত কত উত্থান-পতন আর ভাঙাগড়ার খেলা চলে সেখানে। কখনও অশান্ত আবেগে উত্তাল হয়ে ওঠে। চারিদিক কালো করে নামে ঘন অন্ধকার। আবার কখনও দিগন্তে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আশার আলোক রেখা। তারই মধ্য দিয়ে সন্ধানী পথ করে চলে। মননের উৎস বাইরের জগৎ। বনস্পতি আকাশের দিকে মাথা তোলে, চারিদিকে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দেয়। তবু সে তার প্রাণশক্তি আহরণ করে মাটির নীচের শিকড় থেকে। মনের খোরাক যোগায় বাস্তব পরিবেশ। অথচ জেলখানার বাস্তবে বর্তমান আর নিকট ভবিষ্যৎ বিরামহীন কঠোর শূন্যতায় ভরা। সম্বল শুধু অতীতের স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন। অতীতকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলে এসেছি। স্মৃতিও ঝাপসা হয়ে আসে। ভবিষ্যৎ অতিদূরে, তাহলে আমার এই দিনগুলি অনিশ্চিত। কাটবে কেমন করে? একটা জমাটবাঁধা শূন্যতা এবং উদ্ভিদের মত প্রায় নিশ্চল জীবন যাপনেই কি হবে শক্তির অপচয়? মুহূর্তের পর মুহূর্ত, দিনের পর দিন আর মাসের পর মাসগুলিকে গেঁথে নিয়ে চলবে একটা নিতান্ত একঘেয়ে ফাঁকা স্বাদগন্ধহীন অবসাদ?

স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। মনের কোন খোরাক নেই। বাইরের দুনিয়াতে কি হচ্ছে তাও ভাল করে জানি না। দণ্ডিত হওয়ার পর থেকে ত স্টেটম্যানের সাপ্তাহিক সংস্করণ আর সঞ্জীবনী হয়েছে দেশের খবর জানার একমাত্র অবলম্বন। কতটুকু জানতে পাই ওগুলির মারফত? জেলখানায় যা সব চেয়ে বড় সম্বল অর্থাৎ সহকর্মীদের সাহচর্য, তা থেকেও বঞ্চিত হয়েছি। বিশ ডিগ্রীতে আমাদের মামলার সহ-অভিযুক্ত যে কয়জন আছে তারা বয়সে তরুণ হলেও মনের দিক থেকে নিতান্ত রক্ষণশীল। তাদের ধারণা আমি 'কমিউনিস্ট' হয়ে গিয়েছি এবং পুরানো দলের উপর আনুগত্য আর আমার নেই। অথচ পুরাতন দলের উপর আনুগত্যের মনোভাব তখন পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারি নি।

মনের দিক থেকে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে অন্য দলভুক্ত কয়েকজন বন্দীর সঙ্গে। এদের মধ্যে রমেন বিশ্বাস অনুশীলনের প্রাক্তন সভ্য হলেও 'বিদ্রোহী' গ্রুপে যোগ দিয়েছিল। তার কারাদণ্ড হয়েছে মেছুয়াবাজার ষড়যন্ত্র মামলায়। স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ বলে তাকে আন্দামানে পাঠায় নি। দেবেন ভট্টাচার্য লক্ষ্ণৌ প্রবাসী। সে দণ্ডিত হয়েছে একটি রাজনৈতিক ডাকাতির মামলায়। লক্ষ্ণৌ থাকার সময়ে তার সঙ্গে 'হিন্দুস্থান সোশিয়ালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন'-এর যোগাযোগ ছিল। তাই তার চিন্তাধারায় সাম্যবাদের প্রতি ঝোঁক সুস্পষ্ট। আর অস্ত্র আইনে দণ্ডিত জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকার সময়ে সাম্যবাদী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের 'বম্ব' ইয়ার্ডে ওয়ালি নওয়াজ বলে একজন রাজনৈতিক বন্দী ছিল। তার রাজনৈতিক জীবন অনুশীলনের সংস্রবে শুরু হলেও কিছুকাল পরে সে ময়মনসিংহে 'ইয়ং কমরেডস্ লীগে' যোগ দেয়।

আলিপুরে সেন্ট্রাল জেলের বিপ্লবী বন্দীদের মধ্যে সাম্যবাদী চিন্তা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোয় তার বিশেষ অবদান ছিল। বুখারিনের লেখা "Historical Materialism" বইটি সে বে-আইনীভাবে জেলে আমদানি করে। গোপন সূত্রে আমি স্পেশাল ইয়ার্ডে বসে বইখানি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে সে প্রথম পরিচয়। আমাদের মামলার রায় বার হবার পর যে কয়েকদিন 'বমব' ইয়ার্ডে ছিলাম তখন ওয়ালি নওয়াজের সঙ্গে আমার পরিচয় হলেও আলোচনার সুযোগ হয় নি।

মেদিনীপুর জেলে এসে রমেন বিশ্বাস, দেবেন ভট্টাচার্য এবং জ্যোতির্ময়

সেনগুপ্ত এই তিনজনের সঙ্গে আলোচনা হত ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে। পরিপ্রেক্ষিত অবশ্য কারুরই সামনে খুব পরিষ্কার নয়। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে খবর জেনেছি সংবাদপত্রে ভারত সরকার কর্তৃক ঐ পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করায়। কিন্তু ঐ পার্টির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। তাছাড়া তার বিষয়েও অনেক প্রশ্ন রয়েছে, অন্তত আমার মনে। দেবেন বলে "বাইরে যাওয়ার ত এখনও বহু দেরি। কাজেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অনেক সময় পাওয়া যাবে।"

আমরা তখনও মনস্থির করি নি, অথচ আমার সহ-অভিযুক্তরা ধরেই নিয়েছে যে, আমরা চারজন গোপনে শলাপরামর্শ করে আলাদা গ্রুপ গঠন করে ফেলেছি। ফলে তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। বোধ হয় তিক্ততার পাত্র যাতে পূর্ণ হয় সেইজন্যই হঠাৎ বিশ ডিগ্রীর পুরানো বন্দীদের কয়েকজনকে কর্তৃপক্ষ অন্য জেলে বদলি করে। দেবেন ভট্টাচার্যকে পাঠায় রাজসাহী জেলে। রমেন বিশ্বাস, জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত এবং আর একজন যায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে।

সহবন্দী হিসাবে বিশ ডিগ্রীতে যারা রয়ে গেল তাদের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির বিরাট ব্যবধান। শুধু তাই নয়, যে তিনজনের সঙ্গে এখানে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ জমানো যেত। দেবেন ভট্টাচার্য এবং জ্যোতির্ময়ের সাহিত্যপ্রীতি ছিল গভীর। অন্তঃকরণ ছিল প্রশস্ত। এখন যারা রয়ে গেল তাদের সঙ্গে সারাদিনে কয়টা কথার বিনিময় হয় তা হাতের আঙ্গুলে গোণা যায়। উপরন্তু পরিবেশের সঙ্কীর্ণতা তাদের হৃদয়কেও সঙ্কীর্ণ করে আনে। তারা যেন আত্মকলহে ডুবে বন্দিত্বের কঠোরতা আর গ্লানিকে ভুলতে চায়। কিন্তু তাতে ত গ্লানির লাঘব হয় না। বরং তা শতগুণে বৃদ্ধি পায়। তাই আমার কাছে এক এক সময় নিঃসঙ্গতা দুঃসহ হয়ে ওঠে। নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিই। প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি পল গুণে সময়ের নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া যে কি যন্ত্রণা তা শুধু ভুক্তভোগীই বোঝে। নিষ্ক্রিয়তার বোঝাও ওঠে ভারী হয়ে। যৌবনে পা দেওয়ার পর থেকে নিজেকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছি যে, আমার প্রতিটি দিনের প্রতিটি ক্ষণ অর্থে বর্ণে গন্ধে স্বাদে সার্থক হয়ে উঠবে। প্রত্যেক দিনই জমার ঘরে কিছু লেখা হয়ে থাকবে। এখানে যে সেই সঙ্কল্পেরই মূলে প্রতিনিয়ত আঘাত লাগে। বার

বার প্রতিজ্ঞা করি, এই বিবর্ণ নির্জীব দিনগুলি আর নির্মম শূন্যতায় ভরা পরিবেশের কাছে আমি আত্মসমর্পণ করব না। কিছুতেই না। এর মধ্য থেকেই খুঁজে বার করব পরশপাথর। অথচ বড় কঠিন কাজ।

যে বয়সে জেলে ঢুকেছি তাতে জীবনের সঙ্গে কতটুকুই বা পরিচয় ঘটেছে? দেশকে ভালবেসেছি কিন্তু কতটুকু জানি দেশ আর মানুষের সম্বন্ধে? যেটুকু জেনেছিলাম, সাড়ে তিন বৎসরের বন্দী অবস্থায় স্মৃতির পটে তার রেখা অস্পষ্ট হয়ে আসছে। নানা ঘাতপ্রতিঘাতে অতীতের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধ্বংসাবশেষের মত মনের অতলে চাপা পড়ে গিয়েছে। কালক্ষেপণের উপায় হিসাবে অনেক সময় মানসপটে ছায়াছবির ধরনে কল্পনার জাল বুনে চলেছি। বইতে পড়া, নাটকে বা সিনেমায় দেখা কাহিনী, দেশ-বিদেশের বিপ্লবের ইতিহাসের নানা ঘটনা সবকিছুকে অবলম্বন করে নানা কল্পচিত্র রচনার প্রয়াস পেয়েছি। কিছুদূর অগ্রসর হয়েই তার গতি রুদ্ধ হয়েছে। ইতিহাসের প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কতটুকু সৃষ্টি করা সম্ভব? অভিজ্ঞতার পুঁজির গণ্ডি ছাড়িয়ে কতদূর যেতে পারি?

বড়দা চিঠিতে উপদেশ দিয়েছেন অন্তরে আনন্দলোক সৃষ্টি করো। বাইরের জগতকে অস্বীকার করে অন্তরে আনন্দলোকের সন্ধানের কথা ত কখনও ভাবি নি। সে ত পলায়নের পথ। বাইরে হার মেনে আশ্রয় খুঁজব ছায়ালোকে? তাহলে কোথায় রইল এতদিনের সঙ্কল্প আর সাধনা? কোথায় রইল সংগ্রামের ঐতিহ্য? যে সত্যকে এতদিন ধরে খুঁজেছি সে ত কল্পলোকে নয়। সত্যকে পেতে হবে ধূলিরই ধরণীতে, ধরাছোঁয়ার নাগালের ভিতরে। আর সে পাওয়া ত আমার একার জন্য নয়। সমস্ত বঞ্চিত মানুষের জীবনকে সুন্দর করে তোলার মহাব্রতে সেই সত্যকে মন্ত্ররূপে ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া জেলখানার দয়ামায়াহীন রুক্ষ উলঙ্গ বাস্তবকে ত চোখ বুঁজে অস্বীকার করা যায় না। পলায়নে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। আঘাতের পর আঘাত হেনে সে ছায়াবাদের মোহ ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। তাই শক্তি সন্ধান করি রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, রোমাঁ রোলাঁর কাছ থেকে পাওয়া সেই মন্ত্রে—not to yield! কিছুতেই মাথা নোয়াব না। মনে করি নজরুলের গানের সেই ছত্র দুটি:

> "মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেইদিন হবো শান্ত—
> যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।"

এই লড়াইতে জিতবার জন্য অনেক দাম দিতে হয়েছে। আমার নিজের কথা বলেই মনের দুয়ার খুলে দিচ্ছি। তবে আমার কিছু কিছু অন্তরঙ্গ সহবন্দীর সঙ্গে যখন কথা বলেছি তখন জেনেছি যে, তারাও অনুরূপ অনুভূতির মধ্য দিয়ে পার হয়ে এসেছে।

সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মনে যে সব জিনিস পুলক অনুভূতি জাগায় তা থেকে নিজেদের স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করেছি। তাই বলে হৃদয়ের সুপ্ত সুকুমার প্রবৃত্তি, ভালবাসা পাওয়ার ও দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ত শুকিয়ে যায় নি। বাইরে থাকতে কর্মস্রোতের বিপুল উচ্ছ্বাসে আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি অনেক নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বন্দী জীবনের শ্লথছন্দ ক্ষীণস্রোতে তারা উদগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। নিঃসঙ্গ রজনীর শূন্য রিক্ত মুহূর্তগুলিতে নারীর স্নিগ্ধ সাহচর্যের জন্য হৃদয় উন্মুখ হয়ে ওঠে ; তারা প্রশ্ন করে : "কি দিয়েছ আমাদের বিপুলা পৃথিবীর ভোগের ঐশ্বর্য থেকে, কেন বঞ্চিত করেছ-যৌবনকে" ?

সুযোগ বুঝে সহজাত আদিম রিপু মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। হয়ত কোন বিনিদ্র রাতে সমস্ত শরীর-মনকে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের মত নাড়া দিয়ে জাগে দুরন্ত অতৃপ্ত রাক্ষসী ক্ষুধা। সে ক্ষুধার আলোড়নকে প্রশমিত করতে শ্রান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়ি।

সেন্ট্রাল টাওয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে চলে। নিস্তব্ধ নিশীথের প্রহর গুণতে গুণতে নিজের মনের রাশ টেনে ধরি। অধীরভাবে সেলের ভিতরে পদচারণা করতে করতে কল্পনায় ভাবি আমি যেন প্রমেথিউস। দেবতার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছি। হিমালয়ের এক পর্বতশিখরে পাইন গাছের সঙ্গে শৃঙ্খলিতভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছি। বহু নীচে গিরিনদী তিস্তার নীল জলধারা দুরন্ত বেগে উপত্যকার বুকে আঁকাবাঁকা পথ করে চলেছে। হার মানলে ত চলবে না। আমি বিপ্লবী, অনাগতের অগ্রদূত। আমাকে মাথা উঁচু রাখতেই হবে। মনে পড়ে কবি কীটসের মানসপুত্র অ্যাপোলোর কথা। কবি ফুটিয়ে তুলেছেন দেবত্বলাভের পূর্বক্ষণে অ্যাপোলোর মর্মবেদনা। সে অনুভব করে নিজে অসীম শক্তির অধীশ্বর অথচ যেন হাত পা বাঁধা। আপন মনে আবৃত্তি করি কীটসের 'হাইপেরিয়ন' কবিতার ছত্রগুলি :

"...For me, dark, dark,
And painful vile oblivion seals my eyes ;

> I strive to search wherefore I am so sad,
> Until a melancholy numbs my limbs ;
> And then upon the grass I sit, and moan,
> Like one who once had wings..."

অ্যাপোলোর দেবজন্ম হয়েছিল জ্ঞানের আলোকে। কোথায় পাব সেই জ্ঞানের সন্ধান ?

> "Knowledge enormous makes a god of me
> Names, deeds, grey legends, dire events, rebellions,
> Majesties, sovran voices, agonies,
> Creations and destroyings, all at once
> Pour into the wide hollows of my brain,
> And deify me, as if some blithe wine
> Or bright elixir peerless I had drunk
> And so become immortal."

কোনদিন যেমন সামান্য কারণে মনের জগতে ঝড় ওঠে তেমনি আবার কোনদিন হয়ত তুচ্ছ একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করে প্রশান্তি নেমে আসে। সামান্য এতটুকু সহানুভূতি এক এক সময়ে মানুষের কাছে কতখানি মূল্যবান সম্পদ হতে পারে। সামান্য একটি কথার টুকরো মনকে নতুন উৎসাহে সঞ্জীবিত করে তোলে। সে অভিজ্ঞতা হয়েছে বন্দী জীবনের বহু ছোট বড় ঘটনার মাধ্যমে। যে কয়েদী 'বাবুর্চী' আমাদের খাবার নিয়ে আসে, কোনদিন হয়ত তার দুঃখের কথা শুনতে শুনতে নিজের বেদনার উপশম হয়েছে। একজন ডেপুটি জেলার ছিলেন রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। অত কড়াকড়ির মধ্যে আমাদের সুবিধাজনক কিছু করার কোন ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তবু ঐ দরদী মনের পরশটুকু অনেক সাহায্য করেছে। কোনদিন হয়ত একজন হিন্দুস্থানী সান্ত্রীর দরদভরা কথায় মনের মেঘ কেটে গিয়েছে।

একটি রাতের কথাই বলি। সেদিন অন্তরের আকাশ কেন যেন ঘনকালো মেঘে থমথমে। মনে জাগে একটা ক্যাপা আক্রোশ। ইচ্ছা হয় ভেঙে ফেলি এই ইঁট পাথর আর লোহার বেষ্টনী। নিজেকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে আবৃত্তি করি কবিগুরুর "ভাষা ও ছন্দ" কবিতার কয়েকটি ছত্র :

> "যেদিন হিমাদ্রি শৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়,
> মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দম দুর্বার

দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মূল,
মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল উপকূল,
তট অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডমরু বাজায়ে"...

হঠাৎ উঠোনে টহলরত সান্ত্রী 'এন্‌টি-সেল'এর ভিতরে এসে বলে, "বাবু! আপনি একদিন খুব নামকরা লোক হবেন"। কি ভেবে যে সে কথাটা বলেছিল জানি না। তবু অপ্রত্যাশিত অযাচিতভাবে শ্রদ্ধার অর্ঘ পেয়ে মনের মেঘ কোথায় মিলিয়ে যায়। আবার ফিরে পাই আত্মবিশ্বাস।

এমন করেই চলেছে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া, অন্তরের লড়াইতে হার-জিতের খেলা। মন যখন শান্ত হয়ে আসে, তখন একলা বসেই অনেক কথা ভাবি। স্থির সিদ্ধান্ত করি যে, আর দোটানা নয়, সাম্যবাদের পথই বেছে নেব। সাম্যবাদী মতাদর্শ ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা বাকী রয়ে গিয়েছে। রয়েছে বহু প্রশ্ন, যার জবাব আমাকে পেতে হবে। ডঃ ভূপেন দত্তের মুখে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাস পেয়েছিলাম। তিনি যখন বোঝাতেন তখন ভারতীয় দর্শনের সংজ্ঞাগুলির দৃষ্টান্ত ব্যবহার করতেন। সেই যে কথাগুলি মনে গেঁথে গিয়েছিল সেগুলিকে নিয়ে এখন নাড়াচাড়া করি। মানুষ নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারে সমবেত চেষ্টায়, সমাজ-সত্তাকে সুসমঞ্জসভাবে বিকশিত করে। শ্রেণীভেদ দূর হলে তবেই গড়ে উঠবে সেই সমাজসত্তা যা মানুষকে সেই লক্ষ্যের দিকে নিশ্চিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষের সত্যের সন্ধান তখনই অগ্রসর হবে জয়যাত্রাপথে দুর্বার গতিতে।

যদিও অনেক কিছু জানা এখনও হয় নি তবু ভাবি যে, সাম্যবাদী দর্শনেই পাব আমার সমস্ত জিজ্ঞাসার জবাব। আর বাইরে গেলে নিজেকে মিশিয়ে দেব . শ্রমজীবী জনজীবনের বিপুল প্রবাহে। সেই উৎস-মূল থেকে সংগ্রহ করব সাহিত্যসৃষ্টির উপাদান। মঞ্জিল দূর হলেও সুনিশ্চিত। পূব আকাশে সূর্য উঠতে দেরি আছে। তবে অন্ধকারের যবনিকা পাতলা হয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। সঙ্কট অতিক্রম করেছি। হার মানি নি।

মুক্তির নবদিগন্ত

আন্দামান, পোর্টব্লেয়ার, সেলুলার জেল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই নামগুলি চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। কত মুক্তি সৈনিকের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে ঐ জেলটির অন্ধকার কক্ষগুলির সঙ্গে। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভেবেছিল নির্বাসনে পাঠিয়ে নিষ্ঠুর নির্যাতনে বিপ্লবী বন্দীদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবে। কিন্তু তার সঙ্কল্প বরাবরই ব্যর্থ হয়েছে। বিপ্লবীরা শিরদাঁড়া সোজা রেখে মাথা উঁচু করেই দেশে ফিরেছে।

আমরা যারা সেলুলার জেলে নির্বাসিত হয়েছিলাম ১৯৩২-৩৮-এর যুগে, তারা সেখানে বসে মুক্তির নবদিগন্তের সন্ধান লাভ করেছি। লিখতে বসেছি সেই সব কথা। আন্দামানের জেলজীবনের বিশদ বিবরণ নয়। আমার বন্ধু এবং দীর্ঘদিনের সহবন্দী নলিনী দাশ তাঁর "স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বন্দী" নামে বইটিতে সে সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছেন। নতুন দিগন্তের কথাও সবিস্তারে লিখেছেন তিনি। আমি বিশেষভাবে লিখতে বসেছি বন্দী মনের সংগ্রাম আর জিজ্ঞাসার কাহিনী।

১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের গেটে এসে মিলিত হলাম আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার সমস্ত দীর্ঘ মেয়াদে দণ্ডিত বন্দী। সবাই দ্বীপান্তরের যাত্রী। আন্দামান থেকে মিলিটারী পুলিস এসেছে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। পায়ে বেড়ি ত আছেই। একটা লম্বা লোহার শিকলের দু-ধারে সারি সারি হাতকড়া পরানো। প্রত্যেকের এক একটি হাত সেই হাতকড়ির সঙ্গে যুক্ত করে দিল। প্রিজন ভ্যান এসে ঢুকল জেল-গেটের ভিতরে। আমাদের সঙ্গেই বসে রাইফেলধারী পুলিস। জেল থেকে জাহাজঘাট পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে লালপাগড়ী মোতায়েন। প্রিজনভ্যানের সামনে চলেছে মোটরবাইকে জনকয়েক গোরা সার্জেন্ট, পিছনে উদ্যত রাইফেল হাতে লরী বোঝাই গোর্খা পুলিস। সাদা পোশাকে আই. বি. চরেরা গোটা

এলাকা ছেয়ে ফেলেছে। আমরা সমবেত কণ্ঠের বজ্র নির্ঘোষে আওয়াজ তুলে দেশের মানুষকে জানিয়ে দিয়ে যাই যে রাজকীয় সমারোহে রাজবন্দীরা চলেছে নির্বাসনে।

দেশ ছেড়ে চলেছি বহু বছরের জন্য। মাতৃভূমিকে ছেড়ে অনেক দূরে অনিশ্চিত পরিবেশে যেতে যে মনে বেদনা বোধ করি না তা নয়। তবে কৌতূহল এবং আগ্রহ উঠেছে বড় হয়ে। ওখানে যেতে হবে তা ত জানা কথা। তার উপরে তখন বাংলার জেলগুলিতে থাকা মানে সব দিক দিয়ে জীবন্ত সমাধি। রাজনৈতিক দিক থেকে ত বটেই। সেলুলার জেলে ১৯৩৩ সালের অনশনের পর বন্ধুরা যে সব সুযোগ-সুবিধা আদায় করেছে বাংলার জেলের বন্দীরা তা থেকে বঞ্চিত। গভর্নমেন্টের কারানীতি তখন এমন যে আমরা আন্দামান যেতে আপত্তি না করি এই রকম অবস্থা সৃষ্টি করা। ওখানে বন্ধুরা একটা নতুন রাজনৈতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে বলে শুনেছি। হোক না স্বদেশ থেকে বহুদূরে! হোক না দ্বীপান্তরে যাত্রা। তবু সেটাই ত একটা মস্ত পরিবর্তন। মনের দিক থেকে নতুন জীবনের স্বাদ পাওয়া যাবে। তাছাড়া এত দীর্ঘপথ যাত্রাও আমাদের অনেকের জীবনেই এই প্রথম। অপরিচিত অজ্ঞাত পরিবেশের জন্য তরুণ মনে যে টান থাকে সেটাই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। হোক না ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত! এখানেও ত প্রতিটি দিন কাটে অনিশ্চিত অবস্থায়।

জাহাজে আমাদের স্থান হল গহ্বরে। বয়লারের চারিপাশে লোহার গরাদে ঘেরা বড় বড় কয়েকটি খাঁচা। দরজায় ঝোলে মোটা তালা। এরই যে দুটি রয়েছে পাশাপাশি, সেখানেই হল ৭২ ঘণ্টার জন্য আমাদের আস্তানা। এক একটি খাঁচার ভিতরে ১০।১৫ জন পাটাতনের উপরে কম্বল বিছিয়ে হাত পা ছড়িয়ে শুতে পারে। সামনে দিয়ে দু হাত চওড়া সঙ্কীর্ণ একফালি যাতায়াতের পথ। ওপারে আর একটা খাঁচায় রয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত জনকয়েক পাঠান কয়েদী। একজন ডেকে আমাদের জিজ্ঞাসা করে 'বমব্'কেস? নিজের কেস সম্বন্ধে জানায় 'কোতল' অর্থাৎ খুন। সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে খুনীরাই মর্যাদায় অভিজাত। তারা আবার বোমার মামলার আসামীদের শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

জাহাজ ছাড়ার ঠিক আগে আমাদের হাতের শিকল আর পায়ের বেড়ী

খুলে নিয়ে গেল। প্রথম প্রথম বেড়ি নিয়েই পোর্ট ব্লেয়ার পর্যন্ত যেতে হত। একবার সামুদ্রিক ঝড়ে জাহাজের বিপদাশঙ্কা দেখা যাওয়ার পর ক্যাপ্টেন বেড়িপরা যাত্রীর ঝুঁকি নিতে রাজী হন না। জাহাজের নাম 'মহারাজা,' রাজ-অতিথিদের বহন করে কিনা! ঐ খাঁচারই একপাশে জাহাজের গায়ে দু-টি ফোকর, যা দিয়ে বাইরের জগৎ চোখে পড়ে। তাই দিয়ে দেশের মাটির দিকে শেষ নজর বুলিয়ে নিই। ক্রমে তটের প্রান্তরেখা মিলিয়ে যায় দৃষ্টির অগোচরে।

প্রায় পনের মাস পরে সবাই একত্র মিলেছি। প্রভাত চক্রবর্তী, জিতেন গুপ্ত, নরেন ঘোষ প্রভৃতি আমাদের নেতারাও চলেছেন এই সঙ্গে। পরস্পরের জন্য কত কথা জমে আছে, আছে অভিজ্ঞতা-বিনিময়। আছে ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা। প্রভাত চক্রবর্তী জানালেন এ বিষয়ে তিনি পূর্ণানন্দ বাবুর কাছ থেকে একটি বার্তা পেয়েছেন। তবে সবাই বলি যে, প্রথম দিনটি ওসব কথা মুলতবী থাকুক। আজ শুধু প্রাণমনভরে হৈ হল্লা করা যাক। এতদিন পরে ২০।২২ জন সহকর্মী সারা দিনরাত একত্রে থাকার সুযোগ পেয়েছি। হোক না পিঞ্জর! এটাকেই মনে হয় যেন কতবড় মুক্তির আস্বাদ।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত বায়ু সেবন করাবার জন্য সকালে একঘণ্টা আর বিকালে একঘণ্টা ডেকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার হুকুম আছে শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠি। সান্ত্রীরা থাকবে সঙ্গে। প্রথম দিনটা ডেকে নেওয়ার সময় হাতকড়া লাগানো হবে। তবে সমুদ্রে পড়ার পর আর তা করা হবে না। থাকুক না হাতকড়া! তবু ত দুবেলা কিছুক্ষণের জন্য খোলা আকাশের মুখ দেখা যাবে। বিকালে ডেকে উঠে দেখি তখনও জাহাজ গঙ্গার মোহানা ছাড়িয়ে সাগরে পড়ে নি। তবে জলের রং ঘোলা না হলে একেই সাগর বলে ভুল হত। বর্ষায় ভরা নদী অশান্ত আক্রোশে উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গে ছুটে চলেছে। কূলকিনারার অস্পষ্ট আভাসও চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে গভীর বনে ঢাকা এক একটি দ্বীপ দূরে জলরাশির উদ্দাম আবর্তের মধ্য থেকে জেগে উঠে আবার পিছনে পড়ে যায়।

সমুদ্রের আহ্বান শোনা গেল ঐ দিনই সন্ধ্যায়। উঠে দাঁড়াতে যেয়ে সবাই প্রচণ্ড টাল খাই। পায়ের নীচে থেকে পাটাতন বুঝি সরে যাচ্ছে। সান্ত্রীরা জানায় সাগরদ্বীপে এসে পৌঁছেছি। জাহাজ রাতটা সেখানে দাঁড়িয়ে পরের দিন সকালে বঙ্গোপসাগরে পড়বে। সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রথম

আভাসেই এত দুলুনি ! না জানি আগামী কাল অবস্থা কি হবে ! কিছুক্ষণ পরে জাহাজের ডাক্তার এলেন আমাদের খোঁজ নিতে। ভদ্রলোক দক্ষিণ ভারতীয়। তিনি বললেন : সমুদ্র বড় অশান্ত, সমুদ্রপীড়া হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি তাই আমরা যেন সাবধানে থাকি। এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করে, "সাবধান থাকার উপায়টা কি" ? ভদ্রলোক তার জবাব না দিয়ে শোনালেন যে, তিনি একজন অভিজ্ঞ নাবিক। খারাপ আবহাওয়ায় সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার অভ্যাস আছে বলে শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেলেন।

পরের দিন ঘুম ভেঙেই বোঝা গেল জাহাজের দুলুনি অনেক বেশি। তবু ডেকে যাওয়ার লোভ কেউ সামলাতে পারি না। গরাদ রেলিং যা কিছু নাগালে পাই আঁকড়ে ধরে সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠি। উপরে উঠতেই মন ভুলিয়ে দেয় অপরূপ নয়নাভিরাম সেই ছবি। উপরে অনন্ত আকাশ—গাঢ় নীল। নীচে চারিদিকে নীল জলরাশি—ভীষণ উত্তাল, সীমাহীন। দুই বিরাটের মাঝখানে আমরা যেন খেলাঘরের নৌকায় ভেসে চলেছি। দিকচক্রবালের রেখা কোথায় যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। আন্দামান যাত্রার আগের দিন আলিপুর জেলে এক গায়ক বন্ধু শুনিয়েছিলেন "তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে আমি ডুবতে রাজী আছি*** আমি তুফান পেলেই বাঁচি"। কিন্তু বিনা তুফানেই সাগরের যে মহারুদ্র মূর্তি দেখছি, ঝড় উঠলে না জানি তা কেমন প্রলয়ঙ্কর রূপ নেবে। ঐ গানটিরই একটি ছত্রে আছে "ঢেউগুলো যেন আমায় নিয়ে করছে কেবল খেলা"। শান্ত সৈকতে দাঁড়িয়ে হয়ত একথা বলা চলে। এখানে যেন হিমালয় পর্বত-মালা সচল হয়ে উন্মত্ত আক্রোশে ছুটে আসছে। বুঝি আমাদের জাহাজ-টাকে মোচার খোলার মতন এক একবার আকাশপানে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নেওয়ার নিষ্ঠুর খেলায় মেতেছে। মাটির শিশু আমরা। সাগরের ক্ষ্যাপামি সইতে না পেরে অনেকেই কাহিল হয়ে কম্বল শয্যার আশ্রয় নেয়।

বমি করার জন্য খাঁচারই এককোণে একটা টিন রেখে দিয়েছে। এক একজন উঠে টলতে টলতে টিনের কাছে এগিয়ে গেলে আর একজন হয়ত তাকে সাহায্য করতে উঠে যায়। পরক্ষণেই সে নিজে টাল সামলাতে না পেরে বমি করে ফেলে। বিশালকায় পাঠান কয়েদীরা ত মাথাই তুলতে পারে না। যে লোকটি গতকাল 'কোতল' করে এসেছে বলে পরিচয় দিয়ে-

ছিল সে অত্যন্ত করুণ সুরে জিজ্ঞাসা করে একটুকরো লেবু দিতে পারি কি না। আমি হিমালয়ের বুকে মানুষ হলেও সাগরের সঙ্গে দুর্দান্ত পরিচয়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে অভ্যস্ত হয়ে উঠি। এ অবস্থায়ও দুবেলা ডেকে যাওয়ার লোভ সামলাতে পারি না। যারা একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে তারা ছাড়া সবাই উপরে উঠি। ডেকে পৌঁছেই হয়ত স্তূপীকৃত ত্রিপলের উপরে শুয়ে পড়ি। একটানা অশ্রান্ত গর্জন শুনতে শুনতে কানে তালা ধরে যায়।

চতুর্থ দিন সকালে উঠেই বুঝি সাগর শান্ত হয়ে এসেছে। ফোকর দিয়ে তাকালে নজরে পড়ে দূরে যেন কোন পর্বতশ্রেণীর অস্পষ্ট রেখা। অবাক হয়ে ভাবি, এখানে কোন পর্বতশ্রেণী দেখা যাবে? স্থল থেকে বহুদূর পূবে এসে গিয়েছি। ডেকে ওঠার পর বোঝা গেল ওগুলি এক একটি দ্বীপ, বঙ্গোপ-সাগরের বুক থেকে পাহাড়ের মত মাথা উঁচু করে উঠেছে। গঙ্গার মোহানার দ্বীপের মতন নয়। এগুলি কোন নিমজ্জিত শৈলশ্রেণীর উপরের অংশ। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বলয়ের মধ্যে প্রবেশ করেছি। উপকূলের সন্নিকটে পৌঁছেছি। তাই ঢেউয়ের মাতন এত শান্ত।

ডেকে উঠতেই সেই ডাক্তার ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোকের চেহারা হয়েছে ঝড়ো কাকের মতন। কয়েকদিন দাড়ি কামানো হয় নি। পরনে সেই প্রথম রাত্রির নৈশ পোশাক, মলিন, দুমড়ানো। ভদ্রলোক জানান যে, এই কয়দিন মাথা তুলতে পারেন নি, শুধু তরল পানীয় উদরস্থ করে কাটিয়েছেন। আমরা বলি, "অভিজ্ঞ নাবিক না হওয়া সত্ত্বেও আমরা দুবেলা ডেকে বেড়াতে এসেছি।"

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জাহাজ পৌঁছে যায় পোর্ট ব্লেয়ারের চ্যাথ্যাম জেটিতে। জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দ এখন স্তব্ধ। বাইরে বহু মানুষের কর্মব্যস্ততার আওয়াজ কানে আসে। সান্ত্রীরা খাঁচার দরজা খোলে। আমাদের পায়ে বেড়ি পরানো হয়। আবার সেই লম্বা লোহার শিকলের দু-পাশে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে হাতকড়া পরি। জাহাজ থেকে নামি নীচের অপেক্ষমান লঞ্চে। এটাই আমাদের নিয়ে যাবে জেলখানার জেটিতে।

জাহাজ থেকে নেমেই মনে হয় সামনে অতিকায় একটি পর্বত সাগরের জলে স্নান করে আকাশের দিকে মাথা তুলেছে। এটাই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম, অ্যাবারডীন দ্বীপ। জাহাজ যেখানে নোঙর করেছে সেখানে দ্বীপের আকৃতি

প্রায় অর্ধচন্দ্রের মতন। দুই বাহুর মধ্য দিয়ে সমুদ্র অনেকখানি ভিতরে প্রবেশ করে প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় সৃষ্টি করেছে। অর্ধচন্দ্রের যেটা মাঝখানের অংশ সেখান থেকে পাহাড়ের অনেকগুলি ছোট ছোট বাহু সমান্তরালভাবে এগিয়ে এসেছে। যেন কোন মায়াবী শিল্পী প্রকৃতির এই মনোরম রঙ্গমঞ্চে অনেক-গুলি 'উইংস' রচনা করে রেখেছে। ডানদিকে পাহাড়ের যে সু-উচ্চ অংশটি রয়েছে তার নাম 'মাউন্ট হেরিয়ট'। ওরই চূড়ায় চীফ কমিশনারের গ্রীষ্মাবাস। মাউন্ট হেরিয়টের গায়ে নারিকেল গাছের বন আর বন। আরো কত প্রাচীন বনস্পতি আদিম অরণ্যের স্বাক্ষর বহন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমাদের লঞ্চ যাবে বাঁ দিকের বাহুটিতে। লঞ্চ একটু ঘুরে মোড় নিতেই সম্মুখের দিকে অবারিত দৃষ্টি যতদূর যায় শুধু নীলের তরঙ্গভঙ্গ। অ্যাবারডীন দ্বীপের এই বাহুটি যেন সমুদ্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পূবের দিকে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। বাঁ পাশে এবার ভেসে ওঠে ছবির মত সুন্দর 'রস' দ্বীপটি। তখন ওখানেই ছিল প্রশাসনিক সদর দপ্তর। ক্ষণিকের জন্য যেন দার্জিলিং শহরের অতি পরিচিত ছবিটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সুন্দর সাজানো ঘরবাড়ি, মোটর চলাচলের জন্য পাহাড়ের গা কেটে কেটে তৈরী অাঁকাবাকা চড়াই-উৎরাই পথ। তবে দার্জিলিং-এ ত সমুদ্র নেই! এখানে দ্বীপের পূবদিকের কোনটিতে ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে শুভ্র ফেনিল উচ্ছ্বাসে আছড়ে পড়ছে। বিরতি নেই, শ্রান্তি নেই। অনাদিকাল থেকে, যুগযুগান্ত ধরে চলেছে সেই একই খেলা।

লঞ্চ জেটিতে নোঙর করে। লঞ্চ থেকে নেমে লরী। সেলুলার জেলের সেন্‌ট্রাল টাওয়ারের সু-উচ্চ চূড়া চোখে পড়ে। এই জেলের সম্বন্ধে কত বিবরণ পড়েছি সেই প্রথম যুগে নির্বাসিত বিপ্লবী বন্দীদের স্মৃতিকথায়। এবার নিজেরা এসেছি এই ঐতিহাসিক তীর্থক্ষেত্রে। রণক্ষেত্রও বটে। এবারও শহীদ মোহিত মৈত্র, মোহন নমোদাস, মহাবীর সিংয়ের জীবন দীপ নিভেছে ওরই অন্ধকার কক্ষে। চার দেওয়ালের ভিতরে দিনগুলি কিভাবে কাটবে জানি না। তবু এই রণক্ষেত্রে এসেছি—তার অনুভূতিটুকু মনে রোমাঞ্চ জাগায়। ইতিহাসের যাত্রী আমরা, নতুন ইতিহাস রচনার সংগ্রামে সচেতন সৈনিক।

সেলুলার জেলের গেটে পৌঁছাতে হাতের শিকল খুলে দিল। পা থেকে অপসারিত হল প্রায় দুই বৎসরের অনুক্ষণের সঙ্গী ডাণ্ডাবেড়ি। বাধাহীনভাবে স্বচ্ছন্দে পা ফেলার অভ্যাস করতে কয়েকদিন সময় লাগবে। বর্তমানে যে এই

জেলে কড়াকড়ি অনেক কম তা সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করি নানা ছোটখাটো ব্যাপারে। ১৯৩৩ সালের অনশনের এবং তারপরে অপেক্ষাকৃত কম তীব্র কয়েকটি লড়াইয়ের দ্বারা বন্ধুরা কতকগুলি সুবিধা জেল-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আদায় করেছে। দেশেও তখন আসন্ন শাসন-সংস্কার আইন প্রবর্তনের তোড়জোড় চলেছে। কেন্দ্রীয় অ্যাসেম্বলীতে স্বরাজ্য দল আন্দামান বন্দীদের সম্বন্ধে নানা প্রশ্নবাণে গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত করে তুলেছে। এইসব কারণে সরকার পক্ষ এখানকার বন্দীদের সম্বন্ধে কিছুটা উদার মনোভাব প্রদর্শনের নীতি নিয়েছে।

আমাদের দিন দশেক Quarantine ইয়ার্ডে থাকতে হবে। অর্থাৎ সমুদ্রের অপর পার থেকে কোন সংক্রামক ব্যাধি আমাদের মারফত চালান হয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখার জন্য আলাদা করে রাখা। অবশ্য অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে বে-সরকারীভাবে দেখাসাক্ষাৎ এবং কথাবার্তাও হয়। নতুন বন্দীরা এসেছে শুনে যারা দেখা করতে আসে, তাদের মধ্যে আমাদের পূর্ব-পরিচিত, নামে পরিচিত, অপরিচিত, প্রাক্তন সহকর্মী সবাই আছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নামকরা মামলাগুলির দণ্ডিত বন্দীরা প্রায় সবাই রয়েছে এই জেলে—লাহোর ষড়যন্ত্র, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, দিল্লী ষড়যন্ত্র, গয়া ষড়যন্ত্র ইত্যাদি। গয়া ষড়যন্ত্র মামলাটি ত আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলারই একটি প্রশাখা। সাধারণ কয়েদীদের আন্দামানে আনার পর তিন মাস জেলে রেখে বাইরে ছেড়ে দেওয়া হয়। বছরখানেক পরে তারা দ্বীপের কোন একটি সীমিত এলাকায় শর্তাধীনে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে বসবাসের সুযোগ পায়।

চারিদিকে সাগর, পালাবার কোন পথ নেই। তার উপর রয়েছে পানীয় জলের সমস্যা। এই দ্বীপপুঞ্জে যেখানে লোকবসতি আছে সেখানে বড় বড় ট্যাঙ্কে বৃষ্টির জল সঞ্চিত করে রাখা হয়। সেই জল পরিশোধিত করে পানের জন্য সরবরাহের ব্যবস্থা। যদি কোন কয়েদী পালাবার চেষ্টা করে তাকে জলের জন্য শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে ঐ ট্যাঙ্কের কাছে আসতেই হবে। তবু রাজনৈতিক বন্দীদের বাইরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না। বছরের পর বছর জেলেই থাকতে এবং রাতে সেলে বন্ধ হতে হয়। সরকারী ভাষায় আমাদের সংজ্ঞা হল P. I. অর্থাৎ Permanently Incarcerated। জেল অফিসে আমাদের নামের কোন বালাই ছিল না। ছিল পি. আই. নম্বর। আমার নম্বর ছিল পি. আই. ৩৬৯।

এই জেলটি যে নির্বাসিত বন্দীদের প্রাণশক্তিকে দিনের পর দিন তিল তিল করে নিংড়ে নিঃশেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে নির্মিত হয়েছিল সে কথা সেলে ঢুকেই বুঝতে পারি। এগুলি এমনভাবে তৈরী যাতে আলো-বাতাস কিছুতেই ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। গরাদ দেওয়া দরজাটি হল সেলের একেবারে একপাশে। সেটি এত সংকীর্ণ পরিসর যে মোটা মানুষের পক্ষে কাত হয়ে ছাড়া ভিতরে ঢোকা বা বেরোবার উপায় নেই। বাংলার জেলে দরজাগুলি ছিল ঠিক মাঝখানে এবং তুলনায় অনেক চওড়া। এখানে কুঠুরির ভিতরে বসে আকাশ বা দিনের আলো কোনটিরই মুখ দেখার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। আমরা তবু সারাদিন সামনের গরাদে ঘেরা করিডরে কাটাতে পারি, রাতে বিজলী বাতি পাই। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেয়ালের ওপারে পাহাড়-বনের দৃশ্য দেখতে পারি।

প্রথম যারা এসেছিল তাদের মধ্যে বেশির ভাগ অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীভুক্তদের থাকতে হত একতলায়। সন্ধ্যা না হতেই অন্ধকূপ কুঠুরিতে বন্ধ। আলো নেই। বিষাক্ত পোকা-মাকড়-বিছে প্রভৃতির অবাধ বিচরণের ব্যবস্থা আছে। তারই মধ্যে মেঝেতে কম্বল শয্যায় রাত কাটাতে হবে। এখানে সেলবাসের অপরিহার্য সঙ্গী 'টুকরি'টির চেহারাও বিচিত্র। ঘটির আকারে তৈরী। এক সঙ্গে মল ও মূত্র ত্যাগ করা চলে না। প্রকৃতির তাগিদ মিটাতে বেশ কয়েকদিন ধরে কসরতের পর তবে অভ্যস্ত হতে হয়। একটু অসাবধান হলে নিজের দেহ-নিঃসৃত দূষিত জল কম্বলশয্যাকে ভিজিয়ে দেবে। পুরানো বন্দীদের মুখ থেকে খুঁটিয়ে শুনি আগেকার অবস্থা এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের বিবরণ। এক ইয়ার্ডের বন্দীদের সঙ্গে অন্য ইয়ার্ডের বন্ধুদের দেখাসাক্ষাৎ দূরের কথা, দৃষ্টি-বিনিময় হওয়ার পথ পর্যন্ত রুদ্ধ।

তিনতলা সেলুলার ব্লকগুলি সেন্ট্রাল টাওয়ার থেকে সাতটি রশ্মির মত প্রসারিত। এই জেলে সবই সেল। এক ব্লক থেকে অন্যটিতে যাতায়াতের পথ ঐ সেন্ট্রাল টাওয়ারের নীচে দিয়ে। প্রত্যেকটি ব্লকে প্রবেশের গেটটি শুধু গরাদে ঘেরা এবং তালাবন্ধই নয়, টিন দিয়ে ঘেরা ছিল। সশ্রম কারাদণ্ড। কাজের মধ্যে প্রধান ছিল নারকেল ছোবড়া পিটে দড়ি বানানো। হাতের চামড়ায় চাপ চাপ রক্ত জমে ওঠে। পানীয় জল আসে বাইরের সেইসব ট্যাঙ্ক থেকে। জেলের প্রধান ট্যাঙ্কটি কত বছর ধরে অপরিষ্কৃত। জলে পোকার

ঝিলিবিলি। স্নানের জন্য দেওয়া হত সমুদ্রের লবণাক্ত জল, তাও পরিমাণ খুব অল্প। আহার্য ছিল কাঁকরভরা নিকৃষ্ট মোটা চাল এবং তরকারির নামে ঘাস জাতীয় কোন কিছু। দেশে আত্মীয়স্বজনের কাছে চিঠি লেখার সুযোগ মেলে তিন মাসে একবার। রাজনৈতিক বন্দীর পক্ষে সব চেয়ে বড় শাস্তি—বই, পত্রিকা পড়ার অধিকার নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বন্দীরা তুলনায় কিছু সুবিধা পায়, কিন্তু তাদের সঙ্গে মেলামেশা দূরে থাকুক যোগাযোগের কোন রন্ধ্র উন্মুক্ত নয়। অর্থাৎ শরীর এবং মন, উভয় দিক থেকেই বন্দীদের আক্ষরিক অর্থে জীবন্ত সমাধিদানের সর্বাত্মক পরিকল্পনা।

বন্দীদের প্রতিরোধ সংগ্রামে শেষ অস্ত্র অনশন। ১৯৩৩ সালের মে মাসে তাই শুরু হল। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের প্রতিরোধের চেয়েও অনেক কঠিন ছিল এই লড়াই। অনশন চলেছে নির্বাসনে। দেশের মানুষের কানে সে খবর পৌঁছে দেওয়ার পথ প্রায় সব দিক দিয়ে রুদ্ধ। আন্দামান ছিল Penal Settlement। তাই জেলের বাইরে স্থানীয়ভাবে বন্দীদের সমর্থনে নামমাত্র আওয়াজ তোলার সম্ভাবনাও নেই। জেল-কর্তৃপক্ষ ভাবে জুলুম করে অনশন ভাঙ্গাবে। সামান্যমাত্র সাবধানতা অবলম্বন না করে বলপূর্বক নাকে নল ঢুকিয়ে খাওয়াবার চেষ্টায় প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই তিনটি প্রাণকে বলি দিতে হল। তাতেও কর্তৃপক্ষের চৈতন্যোদয় হয় নি। কাউকে কাউকে অনশনরত অবস্থায়ই পিছমোড়া হাতকড়ি দিয়ে জোলাপ খাওয়ানো হয়েছে। উনপঞ্চাশ দিন অনশনের পর পানীয় জলও বন্ধ করে দিতে দ্বিধা করে নি।

ততদিনে সুড়ঙ্গপথে তিন শহীদের আত্মদানের খবর দেশে পৌঁছেছে। বাংলার বুকে অ্যাণ্ডারসনীয় সন্ত্রাসের রাজত্ব। রাজনৈতিক নেতা ও দায়িত্বশীল কর্মীরা প্রায় সবাই জেলে বন্দী নতুবা অন্তরীণ। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের কণ্ঠরুদ্ধ। এই অবস্থায় অসুস্থ অবস্থাতেও এগিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি আন্দামান বন্দীদের কাছে তারবার্তায় পাঠালেন অভয়বাণী—"মাতৃভূমির ফোটা ফুলগুলিকে শুকিয়ে মরতে দেবোনা।" তিনি ভাইসরয়ের নিকটেও তার পাঠিয়ে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানান। স্বরাজ্য পার্টি কেন্দ্রীয় অ্যাসেম্বলীতে প্রশ্ন তোলে। এইসব চাপের ফলে কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। বন্দীদের মাথা কিছুতেই নোয়ানো যাবে না জেনে গভর্নমেন্ট শেষ পর্যন্ত তাদের অধিকাংশ দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

জেলখানার জীবনে নিম্নতম কতকগুলি সুযোগ ও সুবিধা আদায়ের জন্য পরিচালিত হলেও এই সংগ্রামের রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। সরকারের শয়তানী অভিসন্ধির বিরুদ্ধে প্রথম দফা বিজয় অর্জিত হয়েছে। আমরা যখন সেলুলার জেলে যাই তখন সেখানে সেই বিজয়ের সাফল্য কাজে লাগিয়ে নতুনভাবে জীবনকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে দ্রুততালে।

কোয়ারান্টাইন পর্বশেষে প্রবেশ করলাম জেলের অন্দর মহলে। রাজনৈতিক বন্দীরা থাকে যথাক্রমে দুই, তিন, পাঁচ ও ছয় নম্বর ব্লকে। পাঁচ নম্বরটি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বন্দীদের জন্য। আমার স্থান হয় সেখানে। এখানে এসে বাংলার জেলের তুলনায় যেন মুক্তির আস্বাদ পাই। জেল-কর্তৃপক্ষ ক্রমে ক্রমে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমাদের স্ব-শাসনের অধিকার কার্যত মেনে নিয়েছে। সারাদিন এবং রাতে লক-আপ না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য নির্দিষ্ট এক ব্লক থেকে অন্য ব্লকে অবাধে ঘোরাফেরা করা চলে। 'কিচেন' পরি-চালনার দায়িত্ব আমাদের হাতে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের জন্য বরাদ্দ আহার্য একসঙ্গে মিলিয়ে রান্না হয়। তাতে খাদ্যের খুব একটা উন্নতি না হলেও একেবারে অখাদ্য হয় না।

সেলে বন্ধ হতে হতে রাত নয়টা বেজে যায়। যারা কিচেন, লাইব্রেরী, অফিস প্রভৃতিতে ডিউটি করে তাদের করিডর-লক-আপের অর্থাৎ সেলে বন্ধ না করে গরাদে ঘেরা বারান্দায় ঘোরাফেরা করতে দেওয়া হয়। চিকিৎসকের উপদেশে স্বাস্থ্যের কারণেও কিছুসংখ্যক বন্দী ঐ সুযোগ পেয়ে থাকে। আমিও পাই। প্রথম মাসখানেক দিনের বেলা যতটা সময় পারি খোলা আকাশের নীচে কাটাই। আন্দামানের জলবায়ু খুব অস্বাস্থ্যকর হলেও এই পরিবর্তনটা আমার পক্ষে খুব উপকারী হয়। জেলে বসেও যেটুকু দেখি তাতে বুঝি যে, এখানকার প্রাকৃতিক পটভূমি অপরূপ সুন্দর। তার পরশ উপবাসী স্নায়ুমণ্ডলকে সতেজ করে তোলে। পাহাড় আর সাগরের একত্র সমাবেশ আমাকে মুগ্ধ করে। রোজ ভোরে স্নান সেরে এসে যখন করিডরের গরাদের গায়ে ভেজা কাপড় মেলে দিই, ঠিক সেই মুহূর্তটিতে সূর্য ওঠে। আকাশ আর সুনীল জলরাশি যেখানে পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় হয়ে মিশে গিয়েছে ঠিক সেখানটিতে জবাকুসুমসঙ্কাশ একটি অতিকায় থালা যেন জলধির

অতল থেকে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে। রাতে করিডরের গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে দেখি চাঁদ ওঠার পর নিস্তব্ধ মৌন সাগর কেমন ক্ষ্যাপা উচ্ছ্বাসে ফুলে ফুঁসে ওঠে। নারিকেল বনে পাতায় পাতায় জ্যোৎস্না ঝলমল করে, নীচে আলোছায়ার লুকোচুরি।

মানবিক উপাদানের দিক থেকেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য রয়েছে। সাধারণ কয়েদী-দের মধ্যে আছে ভারতের নানা প্রদেশের নানা ভাষাভাষী মানুষ—পাঠান, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, দক্ষিণভারতীয়, বর্মী। বর্মা তখনও ব্রিটিশ ভারতের একটি প্রদেশ। আমাদের কিচেনের কাজে, হাসপাতালে কাজের জন্য এদের মধ্য থেকেই লোক দেওয়া হয়। দক্ষিণ ভারতীয় এবং বর্মী মানুষদের প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। ভাঙ্গা হিন্দী ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম। ভাষাবিভ্রাটে অনেক সময় হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, বিশেষত বর্মীদের কিছু বোঝাবার বেলায়।

সবচেয়ে বড় আশার কথা, এখানকার প্রতিটি দিনকে সার্থক করে তোলার উপযোগী একটি মানসিক তথা বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। সে সম্বন্ধে লোকমুখে কিছু কিছু শুনে এসেছিলাম। গ্রন্থাগার, পাঠাগার, পাঠচক্র এবং সুনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ ক্লাসের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। মার্কসীয় সাহিত্যের অনুশীলন চলেছে সমবেত উদ্যোগে। মার্কসীয় মতবাদের অনেকগুলি মূল গ্রন্থ, মার্কস-এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের লেখা বই সংগৃহীত হয়েছে নানা উপায়ে। এর জন্য কত রকমের কৌশলই না অবলম্বন করতে হয়েছে।

জেল থেকে বাইরে আসার পর দেখেছি দেশের কোন কোন মহলে এ সম্বন্ধে নিতান্ত ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। আন্দামানে অধিকাংশ বিপ্লবী বন্দী কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করে—এই ঘটনাটি যাদের পছন্দ হয় নি তারাই ঐ ভ্রান্ত ধারণাটি প্রচলনের জন্য দায়ী। তারা বলে যে, গভর্ণমেন্ট থেকেই না কি বিপ্লবী বন্দীদের সাম্যবাদী সাহিত্যপাঠের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যাতে তাদের দৃষ্টি সন্ত্রাসবাদের থেকে ভিন্ন পথে পরিচালিত হয়। আসলে এই প্রচারটা নিতান্তই মনগড়া, এর কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। সাম্যবাদ সংক্রান্ত যেসব প্রামাণ্য পুস্তক ওখানে সংগৃহীত হয়েছিল তা আদৌ সরকারের দয়ায় নয়। দেশের জেলে থাকার সময় আত্মীয়স্বজনেরা বন্দীদের নামে বই জমা দিতেন। সাম্যবাদ ত দূরের কথা, সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদঘাটনের

সামান্যমাত্র আভাস থাকলেও সে সব বই সেন্সরের দৌলতে আটক হয়ে জেল গেটে জমা থাকত। আন্দামানে আসার সময় বন্দীদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র যা গেটে জমা ছিল সেগুলির সঙ্গে ঐ সব বইও চলে আসে। বিশেষত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের সঙ্গে এইভাবে আসে সাম্যবাদী সাহিত্যের বেশ কয়েকখানা বই। নিয়ম অনুসারে নিষিদ্ধ বইগুলি গেটে জমা থাকার কথা। কিন্তু নানা কৌশলে জেল-কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে সেগুলিকে ভিতরে আনার ব্যবস্থা হয়।

প্রকাশ্য গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয় জেল তথা সেন্সর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বইগুলি নিয়ে। বন্দিশিবিরগুলি থেকে ডেটিনিউরা দণ্ডিত বন্ধুদের ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু বই নানা উপায়ে বাংলার বিভিন্ন জেলে পাঠিয়েছিলেন। দণ্ডিতদের আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া বা যার সঙ্গতি আছে তার নিজ ব্যয়ে কেনা বইপত্রও ছিল। জমা দেওয়া বা কেনার সময় অবশ্য বইয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা ছিল না। তবু সবগুলিকে একত্র করলে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নের একটা মোটামুটি কাঠামো খাড়া হয়। নিষিদ্ধ বইগুলি পাঠের ব্যবস্থা হয় ঐ অনুমোদিত গ্রন্থাগারের সুযোগে। সেজন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে।

জেলখানার আইনে বন্দীদের সেলগুলি অতর্কিতে তল্লাশের নিয়ম আছে। কর্তৃপক্ষের নজরে পড়লেই অননুমোদিত বই বাজেয়াপ্ত হবে। সেগুলিকে হাতে লিখে খাতার পর খাতায় নকল করে মূল বইটি অত্যন্ত সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখা হত। মাত্র এক কপি নকল করলে ত চলে না। চাহিদা অনেক। প্রত্যেকটি পুস্তকের অন্তত ৩।৪ কপি চাই। এর জন্য কি রকম সংগঠন, শৃঙ্খলা, অধ্যবসায় আর নিষ্ঠা প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়। যারা দিনের পর দিন ধরে নকল করে চলেছে তাদের একাগ্র আন্তরিকতাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাতে হয়। যারা সেগুলি পড়েছে তাদের ধৈর্য ও আগ্রহ কম প্রশংসনীয় নয়। সকলের হাতের লেখা সমান নয়, অনেক জায়গায় অস্পষ্ট। বহু জনের ব্যবহারে খাতার পাতা বিবর্ণ, জীর্ণ। চাহিদা অনুযায়ী কপির সংখ্যা খুবই অল্প। তাই প্রার্থীদের ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে সারা দিনে দু-ঘণ্টা করে "রেশন" করে বই পড়তে হত। গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত বন্ধুটি জানিয়ে দিত কোন "বই" দিনের কোন সময়টা খালি আছে। কোন ব্লকের কত নম্বর সেল থেকে সেই সময়টা

"বই" নিয়ে আসতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে পরবর্তী প্রার্থী এসে নিয়ে যাবে। এইভাবে "বই" হাতে হাতে ঘুরতে থাকত। গোটা দিনের জন্য কেউ পেত না। কারুর সময় নির্দিষ্ট হল বিকাল পাঁচটা থেকে সাতটা আবার কারুর বেলায় হয়ত সকালে ছয়টা থেকে আটটা। সুতরাং নিজের দিনের রুটিন ঠিক করতে হত সেইভাবে।

যারা সমবেতভাবে পাঠচক্র করে পড়বে তাদের দেওয়া হত অগ্রাধিকার। তাই দেখা যেত কিছুসংখ্যক বন্দী হয়ত বিকালের খেলাধূলা ছেড়ে বই নিয়ে বসে রয়েছে। তখনও বিজলী বাতি জ্বলে নি। অতএব সেলের বাইরে করিডরে বসেই অধ্যয়ন তথা আলোচনায় ব্যাপৃত রয়েছে। আবার কেউ কেউ হয়ত খুব ভোরে উঠে নির্দিষ্ট সময়ের সদ্ব্যবহার করছে। পরীক্ষা পাসের তাগিদ ছাড়া এভাবে পড়াশুনা করতে খুব কম ছাত্রকেই দেখা যায়। বইয়ের সময় নির্দিষ্ট, দৈনন্দিন ঘড়িধরা সময়ে পর পর ক্লাসের ব্যবস্থা, পাঠচক্র বসে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়। আর আছে সপ্তাহে বা সময়ে সময়ে সমবেত আলোচনা। জ্ঞানের অদম্য অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষায় দিনগুলি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ছকে বাঁধা।

এক রবিবার ছাড়া গল্পগুজব এবং তাস পাশা ইত্যাদি খেলার অবকাশ হত না। অবশ্য ব্যতিক্রম একেবারে ছিল না তা নয়। তবে সেরূপ বন্দীর সংখ্যা তুলনায় খুবই কম। যারা বাইরে থাকতে কলেজী শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে তারা অন্যদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। যারা আগে সাম্যবাদ সম্বন্ধে কিছুটা পড়াশুনা করেছে তারাই মার্কসবাদের অধ্যাপনা শুরু করে। পাঠ্যক্রম সুনির্দিষ্ট। মার্কসীয় অর্থনীতি থেকে আরম্ভ এবং দর্শনে শেষ। ধাপে ধাপে একটি বিষয় শেষ করে তবে উচ্চতর ক্লাসে যোগদান করা চলে। অনেকে এখানেই মার্কসবাদের শিক্ষালাভ ক'রে নিজেরা আবার প্রাথমিক পাঠার্থীদের ক্লাস পরিচালনার ভার নেয়। এইভাবে আন্দামানের জেল জীবন্তসমাধি হওয়ার পরিবর্তে পরিণত হয়েছে বিপ্লবীদের রাজনৈতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশেষ কোন বিষয় নিয়ে ব্যক্তিগত রুচি মাফিক বিশদ অধ্যয়নের আগ্রহ থাকলেও সুযোগ-সুবিধা খুব সামান্য। কোন বিষয়ে হয়ত দুই একখানা বই রয়েছে। তারপর ইতি। তবু যতটুকু সম্ভব হয়েছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করেছে কেউ কেউ। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ আন্দামান বন্দীদের ব্যবহারের

জন্য পুরো একসেট "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা" পাঠিয়েছিলেন। সেদিন কি অপরিসীম আগ্রহ আর ধৈর্য নিয়ে তাই খুঁটিয়ে পড়েছি ভাবলে আজ নিজেরই মনে বিস্ময় জাগে। ছাত্র-জীবনে "এনসাইক্লোপিডিয়া" অধ্যয়ন করার কথাটা ছিল একটা বহুল প্রচলিত পরিহাস। পরিস্থিতির তাগিদে সেই পরিহাসই সাধনায় পরিণত হয়। আমার আগ্রহের নানা বিষয় ছাড়াও দেশের সম্বন্ধে যত কিছু তথ্য সেখান থেকে সংগ্রহ করা যায় তার জন্য বিপুল পরিশ্রম করেছি। বাংলার বিভিন্ন জেলার ভৌগোলিক বিবরণ থেকে শুরু করে নানা দিক সম্বন্ধে পরিচিতির রূপরেখা রচনার প্রয়াস পেয়েছি। নৃতত্ত্ব এবং ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার অধ্যয়নের সূত্রপাত হয়েছে এমনিভাবে। সেদিন মানচিত্র নিয়ে বসে ভারতবর্ষের প্রতিটি বিন্দুকে খুঁটিয়ে দেখেছি। সে সব স্থান কোনদিন চোখে দেখি নি, যার নাম কখনও শুনি নি, সেগুলির নাম মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। দেশকে জানার অতৃপ্ত আগ্রহে বইয়ের পোকার মত তথ্য সংগ্রহ করেছি। অনেক সময় কল্পনা করেছি ভবিষ্যতে যদি কোনদিন সুযোগ আসে তবে পরিব্রাজকের মত ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যটন করে বেড়াব।

দেশে কি ঘটে চলেছে জানার অদম্য আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। বরং বিদেশের সাময়িক পত্রিকার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের নীতি ছিল অনেক শিথিল। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার সাপ্তাহিক সংস্করণ, 'কারেণ্ট হিষ্ট্রি', 'ফরেন অ্যাফেয়ার্স' ধরনের মাসিক পত্রিকা বন্দীদের নিজ ব্যয়ে আনাবার অনুমতি পাওয়া যায়। বহির্বিশ্বের ঘটনাবলীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় ঐ সব পত্রিকার মারফত। আমরা এই পত্রিকাগুলি থেকেই ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান, ফ্যাসি-বিরোধী গণফ্রন্ট, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, মহাচীনে জাপানী সাম্রাজ্য-বাদের আক্রমণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা, ইত্যাদির কথা জেনেছি। এই সব পত্রিকায় যে তথ্য পাই তাকে পরিপূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করা চলে না অথচ তার উপরে নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। তবু চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য সতর্কতার সঙ্গে সংবাদ-বিশ্লেষণ করে চলমান বিশ্ব-ইতিহাসের গতিকে বুঝতে। যে সব বন্ধুরা ইংরাজী জানে না বা কম জানে তাদেরও বঞ্চিত করা হয় নি। ঐ সব পত্রিকার খবরের সারাংশ বাংলায় ব্যাখ্যা করে বলার একটা নিয়মিত ব্যবস্থা ছিল।

আন্দামানের জেলখানাকে রাজনৈতিক তথা মার্কসীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত

করার কৃতিত্ব কমিউনিস্ট কনসোলিডেশানের। আমরা আসার বছর দুই আগেই এই নতুন সংগঠনটি গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন দলের যে সব বন্দী সাম্য-বাদের মতাদর্শকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে তারা পরস্পরের মধ্যে আলোচনার পর যে যার পুরানো দল ত্যাগ করে কমিউনিস্ট কনসোলিডেশান প্রতিষ্ঠা করে। কনসোলিডেশান ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছে। পার্টির সঙ্গেও যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে সুড়ঙ্গপথে। আমরা যখন এসে পৌঁছুই ততদিনে বন্দীদের অধিকাংশই এই সংগঠনে যোগ দিয়েছে। যাঁরা মার্কসবাদের ক্লাস নিতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হল ডাঃ নারায়ণ রায়, বিজয় সিং, ধন্বন্তরী, অমলেন্দু বাগচি, সুনীল চ্যাটার্জী, নলিনী দাশ, বঙ্গেশ্বর রায়, গোপাল আচার্য প্রভৃতি।

সেলুলার জেলে কমিউনিষ্ট কনসোলিডেশান গঠন ছিল পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লববাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। পরে ভারতের বন্দিশিবিরগুলিতে ডেটিনিউদের মধ্যে কমিউনিস্ট কনসোলিডেশান গড়ে ওঠে—আন্দামানেরই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে। এখান থেকে যাঁরা দণ্ডের মেয়াদ শেষে দেশে ফিরে মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ডেটিনিউ হিসাবে আটক হন তাঁরাই এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন নিরঞ্জন সেন, সতীশ পাকড়াশী, খোকা রায় ইত্যাদি।

আমরা যখন সেলুলার জেলে গিয়েছি তখন কনসোলিডেশান প্রতিষ্ঠার বোধহয় তিন বৎসর পূর্ণ হতে চলেছে। তবু সহবন্দীদের, বিশেষ করে ডাঃ নারায়ণ রায়, অমলেন্দু বাগচি, ধন্বন্তরি, প্রমথ ঘোষ এঁদের মুখে সেই প্রথম পদক্ষেপের কাহিনী কিছু কিছু শুনেছি। বিভিন্ন দলের মধ্যে যাঁরা সুনিশ্চিত-ভাবে সাম্যবাদকে মতাদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সামনে কিছুদিনের মধ্যেই সাংগঠনিক প্রশ্নটি খুব বড় হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। একই মতাদর্শ, অনুরূপ চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও কি নিজের নিজের পুরানো দলের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে? সেখানেও ত চলেছে প্রাচীনপন্থী এবং নবীনপন্থীদের মধ্যে তীব্র মত-সংঘাত। তাছাড়া এটা ত শুধু অব্যবহিত বর্তমানেরই নয়, ভবিষ্যতের বিচারেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অতীতের পার্টিগুলির ঐতিহাসিক প্রয়োজন যা ছিল তা ফুরিয়ে গিয়েছে। সে পার্টিগুলি গঠিত হয়েছিল অন্যভাবে। এখন অনুশীলন-কমিউনিস্ট বা যুগান্তর-কমিউনিস্ট

নাম দিয়ে সেগুলিকে জীইয়ে রাখার বা নতুন নামে পৃথক পৃথক ভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা খুব হাস্যকরই নয়, নেহাৎ অবাস্তব হবে। সেরূপ চেষ্টার অর্থ হবে পুরাতন অবৈজ্ঞানিক ভাবধারার সঙ্গে একটা জোড়া-তালি দেওয়া এবং পুরাতনের উপর নতুনের গিল্‌টি করে নেওয়া। তার আয়ু খুব বেশিদিন স্থায়ী হবে না। ইতিহাসই নির্মমভাবে তা বাতিল করে দেবে।

আরো দুটি প্রশ্ন সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রত্যয় হয়ে তাঁরা কনসোলিডেশান গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সাম্যবাদী সাহিত্য সুশৃঙ্খলভাবে অধ্যয়নের মাধ্যমে তাঁরা বুঝেছিলেন যে, সাম্যবাদ শ্রমিকশ্রেণীরই মতাদর্শ। একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই হতে পারে সমস্ত বিপ্লবী শক্তির অগ্রবাহিনী। তারাই ভাবী ইতিহাসের রচয়িতা, শোষণহীন সমাজের স্রষ্টা। তাই কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি। এই শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গিকে ভিত্তি করেই নতুন পার্টি গড়ে তোলায় উদ্যোগী হতে হবে। অতীতের মধ্যবিত্তভিত্তিক এবং মধ্যবিত্তের বিপ্লববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গড়ে ওঠা দলগুলিকে একটু অদল-বদল করে, রং ফিরিয়ে নতুন নামে চালাবার চেষ্টা হবে আসলে ইতিহাসকে ফাঁকি দেওয়ার প্রয়াস মাত্র।

আন্দামানের জেলে তখন একটা কথা খুব প্রচলিত হয়েছিল—আমাদের de-classed হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিতে যোগ দিতে হবে। কথাটার অনেক সময় শিশুসুলভ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বাড়াবাড়িও হয় নি তা নয়। তবু উপলব্ধিটি ছিল মূলত সঠিক। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পরও পেটি-বুর্জোয়া ধ্যানধারণা এবং অভ্যাসের বিরুদ্ধে নিয়মিত সংগ্রামের কাজে গাফিলতি করার কি কুফল হতে পারে তা কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস বার বার দেখিয়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা বুঝেছিলেন কমিউনিস্ট আন্দোলন আন্তর্জাতিক আন্দোলন। বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি এগিয়ে চলতে পারে না। এই উপলব্ধিও মূলত সঠিক, যদিও তা প্রয়োগ করতে যেয়ে অনেক ভুল হয়েছে। এমন কি নেহাৎ ছেলেমিও হয়েছে। জেলখানাতেও তা দেখেছি। বাইরে এসেও দেখেছি। তবু সেদিন ঐ দুটি সূত্রকে শক্তভাবে আঁকড়ে না ধরলে পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লববাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ সম্ভব হত না।

আন্দামানে কনসোলিডেশান যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আনুগত্য

স্বীকার করে তা সম্পূর্ণভাবে তত্ত্বগত শিক্ষার আলোকে। বাইরে থাকতে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কারুরই বোধ হয় ছিল না। ব্যক্তি-গতভাবে কয়েকজন পরিচিত কমিউনিস্টের সঙ্গে কারুর কারুর পরিচয় থাকতে পারে। সেদিন কমিউনিস্ট পার্টিও ছিল খুব ছোট এবং বে-আইনী। তার কর্মসূচী, কার্যকলাপ ও ভিতরের অবস্থা সম্বন্ধে ভাসা ভাসা ভাবে ছাড়া বিশেষ খবর কেউ রাখত না। তবু বিপ্লবী বন্দীরা ইতিহাসের গতিধারা সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান লাভ করেছিল তারই প্রেরণায় সেই চোখে না-দেখা পার্টিকে নিজেদের ভবিষ্যতের ধ্রুবতারা রূপে গ্রহণ করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সভ্য, প্রয়াত আবদুল হালিম ১৯৩৬-৩৭ সালে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন। কনসোলিডেশানের সঙ্গে বাইরের পার্টির যোগাযোগ স্থাপনে তিনি সাহায্য করেন।

কনসোলিডেশান গঠিত হওয়ার পর তাকে বেশ কিছুদিন অন্যান্য বন্দীদের প্রবল বিরূপ মনোভাবের মোকাবিলা করতে হয়েছে। বিভিন্ন দলের নেতৃ-স্থানীয় কর্মীদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল তাঁরা দেখেছেন যে, নতুন চিন্তা-ধারার বিস্তারে অনিবার্যভাবে দলে ভাঙন দেখা দিচ্ছে। তাই তাঁরা দলরক্ষার জন্য কমিউনিজম বিরোধিতাকে অস্ত্ররূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু শুধু এইটুকু বললে অনেক কিছুই না বলা থেকে যাবে। অনেকের উপরে অবিচার করা হবে। কেন না এও দেখা গিয়েছে যে, গোড়াতে যারা কনসোলিডেশানের বা কমিউ-নিস্ট মতবাদের দারুণ বিরোধী ছিল তাদেরও অনেকে শেষ পর্যন্ত কনসোলি-ডেশানে যোগ দিয়েছে···নতুবা জেলের বাইরে এসে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেই নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে যুক্ত করেছে। সামান্য কিছুসংখ্যক অবশ্য কমিউনিস্ট-বিরোধিতায় অটল থেকেছে—জেলখানাতেও, বাইরে এসেও। শেষোক্তদের সম্বন্ধে এখানে কিছু বলতে চাই না। তবে প্রথমোক্তদের কথা সবিস্তারে বলার প্রয়োজন আছে।

আজ এত বছর পরে স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়ে দেখে বুঝতে পারি যে, এই ঘটনাটিও ছিল উত্তরণকালীন প্রক্রিয়ারই একটি অঙ্গ। এই প্রক্রিয়ায় অনেককে আত্মজিজ্ঞাসা ও দ্বন্দ্বের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এগোতে হয়েছে। লড়াই করতে হয়েছে কত পিছুটান, দ্বিধা ও সংশয়ের সঙ্গে। সংশয় ও প্রশ্ন ছিল তত্ত্বের দিক থেকে। তার উত্তর খুঁজে পেতে হয়েছে। খুঁজে পেয়ে সংশয়ের

অবসান ঘটেছে। সকলের ক্ষেত্রে এগুলি ঠিক একই ধরনের ছিল না। যে সব পর্যায়কে অতিক্রম করতে হয়েছে তার মধ্যে যেমন অনেক ক্ষেত্রে মিল আছে, তেমনি ব্যক্তিগত মানসিকতা অথবা অন্যান্য কারণে গরমিলও আছে। তাই নিজের জবানিতেই বলি। বাইরে থাকতে রাজনৈতিক জীবনের প্রভাতে যখন সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকেছিলাম তখন এটুকু বুঝতে শিখেছিলাম যে শ্রমিক এবং কৃষকেরাই বিপ্লবের প্রকৃত প্রাণশক্তি। তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মধ্যবিত্ত তরুণদের সংগ্রামী প্রচেষ্টা কখনই সফল হতে পারে না। সেই যুগে অবশ্য এটুকু বোঝাই ছিল চিন্তার বিকাশে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। কিন্তু সেটা ছিল প্রাথমিক ধাপ মাত্র। 'পথের দাবী' বইটিকে সেদিন নতুন পথের দিশারী বলে মনে হয়েছিল। আন্দামানে গভীর ভাবে অধ্যয়নের পর বুঝি 'পথের দাবী'তে চিন্তার যে পর্যায়টি প্রতিফলিত হয়েছে তাও আসলে 'পেটি-বুর্জোয়া' রোম্যান্টিক বিপ্লববাদেরই আর এক রূপ। তবে তা ছিল যুগসন্ধিকালীন রূপ অর্থাৎ ভদ্র তরুণরা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে এসে গণমুখীন হতে চাইছে।

কমিউনিস্ট পার্টি যে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি এটুকু বোঝার পক্ষে মনের জমি অনেকটা তৈরী হয়েই ছিল। কিন্তু 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক'-এর বিষয়টি নিয়ে তখন পর্যন্ত কোন চিন্তাই করি নি। বাইরে থাকতে 'থার্ড ইণ্টারন্যাশানাল' নামটি নানা সূত্রে কানে এসেছিল বটে তবে সে সম্বন্ধে বিশদভাবে জানার বা ভাবার খুব অবকাশ পাই নি। আর নামটি যেভাবে শুনেছিলাম তার মধ্যে রোমান্টিকতাই ছিল বেশি। আন্দামানে আসার পর প্রশ্নটি হঠাৎ এমনভাবে সামনে এসে গেল যে, এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তখন কনসোলিডেশানের পক্ষ থেকে একটা কথা বড় করে তুলে ধরা হচ্ছে—মতবাদের দিক থেকে কমিউনিস্ট হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতি আনুগত্য থাকা চাই। এটাই সব চেয়ে বড় মাপকাঠি। কনসোলিডশানের বন্ধুরা যেভাবে এটিকে প্রচার করছিলেন তার মধ্যে যান্ত্রিকতা ছিল যথেষ্ট পরিমাণে।

তবু প্রশ্নটি তীক্ষ্ণভাবে সামনে এসে যাওয়াতে ভালই হল। আমি কোন-দিনই স্রোতে গা ভাসাতে রাজী নই। তাই বলে কোন প্রশ্ন সামনে এলে খোলামনে বিচার করতেও আপত্তি নেই। লেনিনের যেসব রচনা ওখানে ছিল সেগুলিকে খুঁটিয়ে পড়তে আরম্ভ করি। পড়তে পড়তে এক সময় নিজেই জবাব খুঁজে পাই। ছাত্রজীবনে যখন লেনিনের 'সাম্রাজ্যবাদ' বইটি

পড়েছিলাম তখনকার বোঝাটা ছিল আবছা আবছা। এখন সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র সম্বন্ধে ধারণাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গেই ঔপনিবেশিক দেশের বিপ্লব সম্পর্কে লেনিনের লেখা থেকে বুঝতে শিখি যে, সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপ-নিবেশিক শোষণের স্বরূপ বিশ্লেষণ জাতীয় মুক্তির সঠিক পথের রূপরেখাকে উদ্ভাসিত করে তোলে। পরিস্ফুট হয়ে ওঠে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-বিরোধী তাৎপর্য। পরাধীন দেশের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন সারা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের মহাপ্রবাহেরই অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। সেই প্রবাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে কোন দেশের জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম জয়যুক্ত হতে পারে না। তাই বড় হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক সংহতির প্রয়োজন।

ঔপনিবেশিক দেশের বিপ্লব সম্বন্ধে লেনিনের লেখাগুলি অধ্যয়নের ফলে আরো দুটি বিষয়ে সংশয় দূর হয়। এই সংশয় দুটির সমাধান না হওয়া পর্যন্ত 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' সম্বন্ধে স্পষ্ট মনোভাব স্থির করার পথে বাধা ছিল। মনটা ঝুঁকেছিল কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-এর দিকে, কিন্তু দ্বিধা ছিল স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়ার বেলায়।

জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা কি হবে—এই কথাটার জবাব খুঁজেছি সকলের আগে। আমার সহকর্মীদের মধ্যে প্রশ্নটা খুব বড় হয়ে উঠেছিল। ১৯৩০-৩২ সালের জাতীয় আন্দোলনের সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের মনোভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। অথচ সেটাই যে সঠিক কমিউনিস্ট নীতি তা মানতে মন চায় নি। তখন তত্ত্বের আলোকে উত্তর লাভের সুযোগ পাইনি, এখন বুঝি যে, শ্রমিকশ্রেণী এবং তার অগ্রবাহিনী, কমিউনিস্ট পার্টি কখনই জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে উদাসীন থাকতে পারে না। বরং কমিউনিস্ট পার্টিই জাতীয় স্বাধীনতা এবং জনগণের জন্য সামাজিক মুক্তি—এই দুইয়ের মধ্যে সঠিক যোগসূত্র গড়ে তুলতে পারে, তুলে ধরতে পারে সংগ্রামের সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করতে হবে, নির্মূল করতে হবে ঔপনিবেশিক শোষণের সমস্ত অবশেষগুলিকে। তবেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে শোষণমুক্ত নতুন ভারত গঠনের পথে। সেই অভিযান এগিয়ে চলবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিমুখে। শ্রমিকশ্রেণীকেই উদ্যোগী হয়ে জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধে সমস্ত শক্তিকে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব দিতে হবে।

সেই সময়ে আমার সহকর্মীদের মধ্যে যারা পুরানো দলকেই আঁকড়ে

ধরে থাকার পক্ষপাতী ছিল তারা আর একটি যুক্তি উত্থাপন করত। কমিউনিস্ট পার্টি ত আন্তর্জাতিক-এর নির্দেশে পরিচালিত হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিকতা এবং দেশপ্রেম কি পরস্পরের বিরোধী নয়? দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় হবে কি ভাবে? আন্তর্জাতিক এর নির্দেশ মেনে চলতে গেলে কি জাতীয় কর্তব্যের প্রতি অবহেলা হওয়ার আশঙ্কা নেই? 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' যদি কোন ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থকে বড় করে দেখে আর আমাদের দেশের স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা দেখায় সেক্ষেত্রে আমরা কি করব?

তখন তত্ত্বের দিক থেকে যে জবাব পেয়েছি সেই কথাই লিখি। শ্রমিক-শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা এবং দেশপ্রেম পরস্পর-বিরোধী বলে যে প্রচার করা হয়ে থাকে তার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্য সমস্ত রকমের শোষণের অবসান। তাই জাতিগত শোষণ এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার অভিযান ক্ষমাহীন। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের মধ্যে নেই কোন মূলগত দ্বন্দ্ব বা বিরোধ। সকলেরই সাধারণ শত্রু বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চূড়ান্ত জয়লাভের জন্য সমস্ত দেশের জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনের আন্তর্জাতিক ঐক্য একটি অপরিহার্য শর্ত। একই লড়াই, রণাঙ্গন ভিন্ন। বিভিন্ন দেশের সামাজিক-ঐতিহাসিক বিকাশের অবস্থা অনুযায়ী বিপ্লবের স্তরে পার্থক্য হতে পারে। তবু দুইয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একে অপরের পরিপূরক। এই বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের সঠিক পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরতে পারে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংহতিকে সুদৃঢ় করে তোলা এবং ঠিক পথে পরিচালনার ব্যাপারে অগ্রবাহিনীর ভূমিকা পালন করে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক'। ততদিনে আমরা বিপ্লবের 'স্ট্র্যাটেজি' (রণনীতি) এবং 'ট্যাকটিকস' (রণকৌশল) প্রভৃতি পরিভাষার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত হয়েছি। ঐ পরিভাষাগুলির সাহায্যে বন্ধুদের বোঝাবার প্রয়াস পাই যে, নিজের দেশের বিপ্লবের স্ট্র্যাটেজি এবং ট্যাকটিক্স্ নির্ভুলভাবে নির্ধারণের জন্যই 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক'-এর অভিজ্ঞ নেতৃত্বকে মেনে নেওয়ার প্রয়োজন হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা সম্বন্ধে অধ্যয়নের দ্বারা বুঝি বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনের সেই আন্তর্জাতিক ঐক্যই জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে তার মধ্যে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে তার জন্মলগ্ন থেকেই সমস্ত পরাধীন ও নিপীড়িত,

জাতির জনগণের মুক্তিসংগ্রামের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে কথা ত অনেকদিন আগেই জেনেছি। এখন তত্ত্বের দিক থেকে বুঝি সেই ঘটনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য। সোভিয়েত ইউনিয়নই পাশ্চাত্যের দেশগুলির শ্রমিকবিপ্লবের আন্দোলন এবং পরাধীন দেশগুলির জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের মধ্যে স্থায়ী সেতু রচিত করেছে। সেইজন্যই সোভিয়েত ইউনিয়নকে বলা হয় বিশ্ববিপ্লবের দুর্গ। আমাদের দেশের বিপ্লব-আন্দোলনে সমর্থন এবং শক্তি যোগাবে সেই দুর্গ।

তারপরও নতুন প্রশ্ন মাথা তুলেছে। সমাজতন্ত্রের পীঠভূমি সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের সারা দেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রামের অতন্দ্র প্রহরী। শ্রদ্ধা করি তাকে, দেব প্রীতি ও ভালবাসার অর্ঘ। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতাকে কি অন্ধভাবে অনুসরণ করে চলতে হবে? অন্য বন্ধুরা যেমন এই সম্বন্ধে জানতে চেয়েছে তেমনি নিজের পক্ষেও এই বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া অত্যন্ত জরুরী ছিল। আমার জিজ্ঞাসু মন এখন আর শুধু প্রশ্ন তুলেই ক্ষান্ত হয় না। গত এক দশকের অভিজ্ঞতার মাশুল যুগিয়ে সে এখন সাবধানী হয়েছে। নতুন পথে পা বাড়াবার আগে যতদূর সম্ভব যা কিছু জানার তা জেনে নিতে চায়। যা জেনেছি তাকে যাচাই করে নিতে চায়। লেনিনের রচনাবলীর যে যে অংশ হাতের কাছে পেয়েছি তন্ন তন্ন করে পড়ে দেখি—উত্তর পাই কিনা। সন্ধান সফল হয়। লেনিন বলেছেন যে, সমাজবিকাশের সাধারণ নিয়মগুলি বিশ্বজনীন, কিন্তু প্রত্যেক দেশের ঐতিহাসিক-সামাজিক পরিবেশের এবং বিকাশের স্তরের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সেই নিয়মগুলিও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। মার্কসবাদ কখনই বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে না। সুতরাং মার্কসবাদের বিশ্বজনীন তত্ত্বকে প্রত্যেক দেশের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক-সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই রূপায়িত করতে হবে।

জাতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের মনোভাব কি হবে? আমার কাছে এটাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয়। ছেলেবেলা থেকে যা যা শিখে জীবনের চলার পথে এগিয়ে এসেছি তার সবকিছুকে এক কথায় নাকচ করে দিতে আমি রাজী নই। ছাত্রজীবনে ভারতের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। নিজের দেশের গোটা অতীতকে এক নিমিষে বাতিল করে দেওয়ার কথায় আমার মন বিদ্রোহ করে। সদ্য কমিউনিস্ট হওয়া কিছু কিছু পুরাতন বন্ধুর মনোভাবকে নিতান্ত নেতিবাচক

উন্নাসিকতা বলে মনে করি। ডঃ ভূপেন দত্তের মুখে যেটুকু শুনেছিলাম তাতে বুঝেছি যে, মার্কসবাদ ঐ ধরনের নেতিবাচক মনোভাবকে প্রশ্রয় দেয় না। এখানে এমন কাউকে পাই না যার কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারি। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের রচনাবলী হতে যা যা পেয়েছি সেগুলির মন্থনে প্রবৃত্ত হই নিজেরই পায়ে দাঁড়িয়ে। আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে সেই সময়ের সাধনার কথা লিখতে বসে মনে হয় যে কি কঠোর পরিশ্রমই না করতে হয়েছে!

ব্যর্থ হয় নি সে শ্রম। ভাস্বর হয়ে উঠেছে জ্ঞানের নব দিগন্তের রূপরেখা। লেনিনের শিক্ষা নির্দেশ দেয় যে, কমিউনিস্টরা হবে মানব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যগুলির প্রকৃত উত্তরাধিকারী। বিশ্বসংস্কৃতির ভাণ্ডারে, নিজ দেশের ঐতিহ্যের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, জীবন্ত এবং প্রগতির পথে সহায়ক সেসব কিছুকে আপন করে নিতে হবে। এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ইতিহাসের শিক্ষার আলোকে। নেতিবাচক বর্জন নয়, নবমূল্যায়ন।

স্তালিনের রচনায় পড়ি সংস্কৃতির জাতীয় রূপটির সম্পর্কে যথোচিত গুরুত্ব দিতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির প্রাণবস্তু সমাজ-তান্ত্রিক কিন্তু তা আত্মপ্রকাশ করে জাতীয় রূপের মাধ্যমে। জাতি গঠনের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যের দরুন প্রত্যেক জাতির জনগণের সংস্কৃতিতে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। মননভঙ্গীতে, চিন্তারূপে প্রতিফলিত হয় সেগুলির স্বাক্ষর। মার্কসবাদের সাধারণ তত্ত্ব যদি সেই বিশিষ্ট রূপগুলির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তবেই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এইভাবেই তা জনগণের অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়।

মার্কসীয় তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় দেশের প্রতি ভালোবাসাকে গভীরতর করে তোলে। বিমূর্ত দেশপ্রেম রূপান্তরিত হয় দেশের বিশাল জনসমুদ্রের প্রতি অন্তহীন ভালোবাসায়। জাতীয় সংস্কৃতির রত্নভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয়ের যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এসেছি ছোটবেলা থেকে তা এখন পরিপ্রেক্ষিতে খুঁজে পায়। নিছক জানার জন্য জানা নয়। অতীতমুখীনতা নয়। অতীতের বিজ্ঞান-সম্মত মূল্যবিচার। সে যে মহাব্রত। অত্যন্ত কঠিন, দুঃসাধ্য। কিন্তু অসীম তার নবসৃষ্টির সম্ভাবনা।

মার্কসবাদ কি মানুষের অন্তর জগতকে অস্বীকার করে? নিজেকে কমিউ-নিস্ট বলে ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এটাই ছিল তত্ত্বের দিক থেকে

আমার সর্বশেষ জ্ঞাতব্য। অধ্যাত্মবাদের প্রভাবকে পিছনে ফেলে বহুদূর এগিয়ে এসেছি। তাই বলে অন্তর জগৎ ত অন্তর্হিত হয় নি। আমি ত চেয়েছি বাইরে-ভিতরে ঐকতান, জ্ঞান ও কর্মের, আবেগ অনুভূতি আর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের সমন্বয়। এইসব জিজ্ঞাসারও জবাব মিলেছে। সে উত্তর স্পষ্ট, অমোঘ, দিবালোকের মতই উজ্জ্বল। মার্কসীয় দর্শন মনকে তথা অন্তর জগতকে অস্বীকার করা দূরে থাকুক বরং তার বিশাল সৃজনক্ষমতাকে বাস্তব ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠা করে। উন্মুক্ত করে দেয় বিকাশের অন্তহীন সম্ভাবনার সিংহদ্বার।

জার্মান দার্শনিক হেগেল বলেছিলেন "Freedom is the appreciation of necessity" (মুক্তি হল আবশ্যিকতার স্বীকৃতি)। হেগেলের সেই বক্তব্যকে আরো বিশদরূপ দিয়ে এঙ্গেলস বলেছেন : "Freedom does not consist in the imaginary independence of natural laws, but in the knowledge of these laws, and in the possibility this gives of systematically making them work towards definite ends..........Freedom therefore consists in the control over ourselves and over external nature, founded on knowledge of natural necessity ; it is therefore necessarily a product of historical development." (মুক্তির অর্থ প্রকৃতির নিয়ম থেকে কল্পিত স্বাধীনতা নয়। মুক্তির অর্থ ঐ নিয়মগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তার সাহায্যে সেগুলিকে সুনিয়মিতভাবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে কাজে লাগাবার সম্ভাবনা।.........সুতরাং মুক্তির অর্থ প্রাকৃতিক আবশ্যিকতা সম্বন্ধে জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাদের নিজেদের এবং বহিঃপ্রকৃতির উপরে নিয়ন্ত্রণ ; অতএব স্বাভাবিকভাবেই মুক্তি হল ইতিহাসের বিকাশের ফলশ্রুতি)।

এঙ্গেলসের এই শিক্ষাকেই ত আঁকড়ে ধরেছিলাম মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের সেই নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বের দিনগুলিতে। তখন যা ছিল অস্পষ্ট আভাষ, এখন এঙ্গেলসের মূল রচনার সঙ্গে পরিচয়ের পর পায়ের নীচে শক্ত মাটি খুঁজে পাই। প্রকৃতির নিয়মকে জানার পর মানুষ তাকে নিজের কাজে লাগায়। সামাজিক মানুষ তার সামূহিক অভিজ্ঞতার সাহায্যে সমবেত চেষ্টায় প্রকৃতির উপরে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অভিযানে অগ্রসর হয়। জীবনসংগ্রামের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বহিঃসত্য মানুষের মনোজগতে সৃজনশীলভাবে প্রতিফলিত হয়। সেই অর্জিত জ্ঞানের শক্তিতে মানুষ ক্রমশঃ প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করে

আর পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় নিজেরও চরিত্রে রূপান্তর ঘটায়। মানুষের ইতিহাসের জয়যাত্রা এগিয়ে চলে পুরাতনের বিরুদ্ধে নতুনের, প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রগতির, ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ও শ্রেণীর বিরুদ্ধে উদীয়মান শ্রেণীর সংগ্রামের বিরামহীন পরম্পরার মধ্য দিয়ে।

এই ত জ্ঞান ও কর্মের বহিঃসত্য এবং অন্তর সত্যের প্রকৃত সমন্বয়। এমনিভাবেই ত মানব সমাজ এগিয়ে চলেছে তমসার বুক চিরে জ্যোতির অভিমুখে। অনুসন্ধান, অতীতের জ্ঞানসমষ্টির নবমূল্যায়ন এবং নবসৃষ্টির দ্রুতরথে চড়ে মানুষের ইতিহাস প্রতি মুহূর্তে পুরাতন সীমাকে অতিক্রম করে চলেছে, ছুটে চলেছে নতুন নতুন সীমানা বিজয়ের দিকে। যা ছিল একদিন অজ্ঞাত, তা ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের গোচরে আসে। যা ছিল আয়ত্তের বাইরে, তার উপরে মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পর মানবতার এই জয়যাত্রা এগিয়ে চলবে দুরন্ত বেগে, দুর্বার গতিতে।

খুঁজে পেয়েছি সেই সমন্বিত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি যা আমার চলার পথের প্রতিটি পদক্ষেপকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে। এই ত পরিপূর্ণ অন্তরজীবন লাভের প্রকৃত পথ। শ্রমজীবী মানুষের বিজয় অভিযানের একজন সৈনিক হিসাবে সংগ্রামী অভিজ্ঞতায় আমার অনুভূতির পাত্র কানায় কানায় ভরে উঠবে। এই ত সেই জীবনবেদ, যার সোনার কাঠির ছোঁয়ায় সহস্রদলে বিকশিত হবে দার্শনিকের সত্যসাধনা, বিজ্ঞানীর জ্ঞানতপস্যা, কবির কল্পনা আর শিল্পীর প্রেরণা। To seek, to strive—to find and to win। উদয়াচলের তীর্থপথে চলেছি, তবে একাকী নই। চলেছি সারা দুনিয়ার অগণিত মুক্তি-সৈনিকের হাত ধরে. তাদেরই একজন হয়ে।

তত্ত্বের দিক থেকে জিজ্ঞাসার জবাব পাই বটে। তবু কি তখন তখনই সমস্ত পিছুটান কাটিয়ে উঠতে পেরেছি? যুক্তি তৃপ্ত হয়েছে। হৃদয় দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। নানা রকমের পিছুটানের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল বোধ হয় পুরানো দল এবং সহকর্মীদের প্রতি মমত্ববোধ। যারা বাইরে 'রিভোলটিং গ্রুপে' যোগ দিয়েছিল তাদের হয়ত এজন্য নিজেদের মনের সঙ্গে লড়াই করতে হয় নি। যে সব অল্পবয়সী ছেলেরা দীর্ঘ মেয়াদে দণ্ডিত হয়ে এসেছে তাদের সত্যকার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছে বলতে গেলে এখানে এসে। কমিউনিস্ট কনসোলিডেশান যখন থেকে কনসোলিডেশানের বাইরের ছেলেদের জন্যও

ক্লাসের ব্যবস্থা করেছে তখন থেকে পুরানো দলগুলিতে ভাঙন ত্বরান্বিত হয়েছে। কিন্তু আমরা যারা বিশেষ দায়িত্বশীল পদে ছিলাম তাদের পক্ষে পুরাতনের সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন করা কি অত সহজ? রাজনৈতিক জীবনের প্রভাতে যে দলেতে হাতেখড়ি হয়েছে, পরে তাকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য নিজেরাই প্রাণপাত পরিশ্রম করেছি। আজ ইতিহাসের বিচারে সেই দলকে বাতিল করে দিতে হবে জেনেও বেদনাবোধ হয় বৈকি! অকেজো আসবাবপত্রকে ঘর থেকে বিদায় করে দেওয়ার সময় কি বিচ্ছেদের ব্যথা অনুভব করি না? কত স্মৃতি জড়িয়ে থাকে সেগুলির সঙ্গে। কমিউনিষ্ট পার্টিতেই যোগ দেব মনে মনে স্থির করার পর ভেবেছি সহকর্মীদের সবাইকে না পেলেও যতজনকে সম্ভব নতুন চিন্তায় শিক্ষিত করে একসঙ্গে নতুন পথে পদক্ষেপ করব। এদের সবাই রক্ষণশীল বলে আগে থাকতে ধরে নেব কেন? তাদের অনেকেই ত এর আগে অনেক কিছু জানার বা ভাবার সুযোগ পায় নি। পড়াশুনা এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে তাদের চিন্তার পরিবর্তন হতে পারে। সেজন্য কিছুদিন অপেক্ষা করব না কেন?

এই চেষ্টা করতে যেয়ে সংঘাত বেধেছে। ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। অন্যে ভুল বুঝেছে। বন্দিজীবনে যারা দীর্ঘদিন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সরকারী পীড়নযন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছি, তাদের কারুর কারুর সঙ্গে তীব্র মতান্তর হয়েছে। রাজনৈতিক মতভেদের দরুন প্রিয়তম বন্ধুর সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

সবাইকে বুঝিয়ে নতুন পথে নেওয়া যে খুব কঠিন হবে সে কথা ত সেলুলার জেলে পৌঁছাবার দিনকয়েকের মধ্যে বুঝতে শুরু করি। আমরা যখন সেখানে যাই তার আগেই অনুশীলনের নেতৃস্থানীয় কর্মী অমলেন্দু বাগচি, কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী কনসোলিডেশানে যোগ দিয়েছেন। হিলি ডাকাতি মামলার হৃষিকেশ ভট্টাচার্য, সত্য চক্রবর্তী, সরোজ বসু এবং উটকামণ্ড ব্যাংকলুঠ মামলার খুশিরাম মেহতা, শম্ভুনাথ আজাদ এবং আরো অনেক তরুণ কর্মী কেউ দু-দিন আগে বা দু-দিন পরে যোগ দিয়েছে। চট্টগ্রামের বাথুয়া ডাকাতি মামলার মোক্ষদা চক্রবর্তী প্রভৃতি যোগ না দিলেও এক পা বাড়িয়ে আছেন। মোক্ষদাবাবু অন্যদের আটকে রেখেছেন এই বলে যে, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা আসুন। নেতারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি বলেন শুনি। তাঁদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা

করে তারপর মনস্থির করা যাবে। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নেতাদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির ফলে তাঁরা কনসোলিডেশানে যোগ দিলেন।

ভবিষ্যৎ রাজনীতি নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হল তখন দেখা গেল যে, নেতাদের মনোভাবে পার্থক্য আছে। প্রভাত চক্রবর্তী, নরেন ঘোষ খোলা মন নিয়ে আলোচনা এবং অধ্যয়নের পক্ষপাতী। জিতেন গুপ্ত, রাধাবল্লভ গোপ প্রভৃতি কয়েকজনের দৃঢ় অভিমত যে, অনুশীলনের প্রতি আনুগত্যে অবিচল থেকে তারপর কমিউনিস্ট মতবাদের যতটুকু গ্রহণ করা যায় যেতে পারে। জিতেন বাবুর নেতৃত্বে বাইরে কাজ করেছি। রাধাবল্লভ গোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে সেলুলার জেলে। দুজনেই একনিষ্ঠ বিপ্লবী কর্মী। মানুষ হিসাবে অত্যন্ত খাঁটি, পোড়খাওয়া সৈনিক। দলের নির্দেশে প্রাণ বিসর্জন দিতে এতটুকু দ্বিধা হবে না। কিন্তু পুরাতন দলের প্রতি আনুগত্য বোধ দুজনেরই চিন্তার বিকাশে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে আছে, থাকবে। তাঁদের কাছে দলের ভাঙন ঠেকানোই প্রধান কর্তব্য। রাজনীতি অধ্যয়ন এবং আলোচনা যত এগিয়ে চলে ততই মতবিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। অন্যরা যারা মতের দিক দিয়ে কাছাকাছি এসেছি তাদের প্রতি জিতেন বাবুদের আর আগের বিশ্বাস নেই সে কথা স্পষ্ট বুঝতে পারি। তাঁরা আমাদের ভুল বুঝতে শুরু করেছেন।

অন্যদিকে কমিউনিস্ট কনসোলিডেশানের বন্ধুরাও আমাদের ভুল বোঝে। আমি যে বহুদিন পূর্বে থেকে কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকেছি সে খবরটা আন্দামানে এসে পৌঁছেছিল। কনসোলিডেশানের কিছু কিছু বন্ধু ধরে নিয়েছিলেন যে, আমি সেলুলার জেলে পৌঁছামাত্রই তাঁদের সঙ্গে যোগ দেব। যখন তা দিলাম না তখন তাঁরা ক্রমশ আমার কমিউনিজমে বিশ্বাস সম্পর্কেই সন্দিহান হতে শুরু করলেন। এটা শুধু আমার বেলাতেই নয়। কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী বা সেদিকে আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যারা নানা কারণে তখন তখনই কনসোলিডেশানে যোগ দিতে রাজী হয় নি তাদের প্রায় সকলের প্রতিই ঐ ধরনের মনোভাব ছিল।

মনের বা হৃদয়ের দিক থেকে যে সব পিছুটানের উল্লেখ করেছি সে পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আরো অনেককে পার হতে হয়েছে। কেউ কেউ ভেবেছে যে, দেশের বিভিন্ন জেলে বা বন্দিশিবিরে আজীবনের যে সব সহকর্মী রয়ে গিয়েছে তাদের প্রতি ত একটা দায়িত্ব আছে। তাদের সঙ্গে কথা না বলে

পুরাতন দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা সঙ্গত হবে না। এই ধরনের বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ কনসোলিডেশানে যোগ দিয়েছে দেশের জেলে ফিরে। দু-একজন ত জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছে। এমনটিও দেখা যায় যে, বন্দিজীবনে যারা ছিল ঘোর কমিউনিস্ট-বিরোধী। তাদের কেউ কেউ মুক্তিলাভের দীর্ঘকাল পরে বাস্তব অভিজ্ঞতার তাগিদে কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছে। সুতরাং এই উত্তরণকালীন দ্বিধাদ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সহিষ্ণু মনোভাব অবলম্বন করাই সঙ্গত।

কিন্তু আমরা আন্দামানে যাওয়ার পর বছরখানেক পর্যন্ত কমিউনিস্ট কনসোলিডেশানের আচরণে ঠিক উল্টোটা অর্থাৎ উগ্র অসহিষ্ণুতাই দেখেছি। সেই সময়টাতে সেলুলার জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে কনসোলিডেশানই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কনসোলিডেশানের বাইরে যে সব গ্রুপ রয়েছে তাদের উপর খুঁটিনাটি ব্যাপারেও নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার জিদ্‌টাই যেন প্রকট। ফলে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে যারা ছিল কট্টর কমিউনিস্ট-বিরোধী তারা এই অবস্থার সুযোগ নিয়েছে।

যে সব বন্দী কমিউনিজমের দিকে পা বাড়াতে ইচ্ছুক এবং কনসোলিডেশানের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষপাতী তারা বে-কায়দায় পড়েছে। সবাই এসেছি একই সামাজিক শ্রেণী থেকে। দু-দিন আগেও হয় একই দলের বা একই ধরনের দলের সভ্য ছিলাম। তাদের কেউ কেউ কমিউনিস্ট হওয়ার পর রাতারাতি 'প্রলেতারিয়েতের' আদি অকৃত্রিম প্রতিনিধি বনে গিয়েছে আর আমরা 'পেটি-বুর্জোয়া'রা তাদের অনুকম্পা বা অবজ্ঞার পাত্র—এই রকম উন্নাসিকতাটা বড় অসহ্য ঠেকত। পরে জেনেছি যে, কমিউনিস্ট কনসোলিডেশানের তদানীন্তন নেতৃত্বের সংখ্যালঘু অংশ অন্যদের প্রতি উগ্র অসহিষ্ণু আচরণের দৃঢ় বিরোধী ছিলেন।

লেনিনের রচনাবলীর সঙ্গে আরো গভীর ভাবে পরিচিত হওয়ার পরে বুঝেছি যে, উপরিউক্ত ধরনের ভুলভ্রান্তি কমিউনিস্ট আন্দোলনের শৈশবের রোগ। বিশেষত, যারা জেলখানার ভিতরে বই পড়ে সদ্য কমিউনিস্ট হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এ রকমটা হওয়া স্বাভাবিক। গণ-আন্দোলনের কোন অভিজ্ঞতা নেই, তত্ত্বের দিকেও অনেক কিছু জানা বাকী—এ অবস্থায় পুঁথিগতবিদ্যা অসম্পূর্ণ, অঙ্গহীন না হয়ে পারে না। সঙ্কীর্ণতার ব্যাধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলাম বলে

কি আমি নিজেই দাবি করতে পারি? লেনিন যে কমিউনিস্ট modesty বা বিনয়ের কথা বলেছেন সে গুণটি অর্জন করা সম্ভব হয় দীর্ঘ সাধনার মাধ্যমে। জ্ঞান ও কর্মের, তত্ত্ব ও প্রয়োগের ঐক্যের অভিজ্ঞতা আর সেই সঙ্গে যুক্তিনিষ্ঠ সত্যনিষ্ঠ আত্মসমালোচনা। কমিউনিজমে বিশ্বাস শুধুমাত্র বহিরঙ্গ জিনিস হয়ে থাকাটা যথেষ্ট নয়। সে বিশ্বাস অনুপ্রাণিত হবে মানুষের প্রতি অসীম ভালবাসার দ্বারা। লেনিনের চরিত্রে তত্ত্ব ও জ্ঞানের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে মানবিক গুণগুলির অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল বলেই ত তাঁর ব্যক্তিত্ব বিশ্ববন্দিত। এও ত এক হিসাবে তপস্যা।

১৯৩৭ সালের গোড়ার দিকে বিখ্যাত গদর বিপ্লবী এবং ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক সর্দার গুরুমুখ সিং ধরা পড়ে সেলুলার জেলে আসেন। সর্দার গুরুমুখ সিং প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে কালাপানির সাজা ভোগ করে গিয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে যখন তাঁদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন বন্দী অবস্থায়ই তিনি ট্রেন থেকে পলায়ন করেন। তারপর বহু বছরের আত্মগোপনের জীবনে মস্কোতে প্রাচ্যের শ্রমজীবী জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে এসে পাঞ্জাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংগঠক রূপে কাজ করছিলেন। সর্দারজীর সুদীর্ঘ বিপ্লবী ঐতিহ্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং গণ-আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তাঁকে অন্য সব বন্দীর তুলনায় এক উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠা করে। অতি শীঘ্রই তিনি সমস্ত দলের বন্দীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তাঁর উপদেশে কমিউনিস্ট কনসোলিডেশান অন্যান্যদের সম্বন্ধে মনোভাব পরিবর্তন করে। অত্যন্ত উগ্র অসহিষ্ণুতা এবং অপরের উপর নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার বদলে গ্রহণ করে সহিষ্ণু ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আচরণ এবং আলাপ-আলোচনার নীতি। ফলে তখন পর্যন্ত আমাদের মতো যারা কনসোলিডেশানের বাইরে ছিল তাদের পক্ষে কনসোলিডেশানে যোগদান সহজ ও ত্বরান্বিত হয়।

সর্দার গুরুমুখ সিংহের সঙ্গে আমার বহুদিন আলোচনা হয়েছে। শিশুর মতন সরল মানুষটি। তাঁর মধ্যে কোনরকম অহমিকার লেশমাত্র দেখি নি। তাত্ত্বিক বলতে যা বোঝায় তিনি তা ছিলেন না। দুরূহ তত্ত্বগত প্রশ্ন উত্থাপন করলে খোলাখুলি বলে দিতেন যে, এর জবাব দেওয়ার মত বিদ্যা তাঁর নেই। কিন্তু ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকে তিনি আমাদের উত্তরণে যথেষ্ট সাহায্য

করেন। সর্বশেষ যে দ্বিধাটি কাটাতে হয়েছিল, সেটি হল ব্যবহারিক। রাজনীতির কালো কুশ্রী দিকটির সঙ্গে পরিচয় ততদিনে আরো ব্যাপক হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সবটাই সাদা, কালোর অস্তিত্বই নেই—এরকম মোহ অন্তত আমার ছিল না। সুতরাং অচেনা পার্টির মধ্যে যেয়ে কি রকম অবস্থার সম্মুখীন হব কে জানে! সর্দারজী বলেন: "কমিউনিস্ট পার্টিকেই যদি ইতিহাসের ধারক বলে বুঝে থাকো তাহলে তার ভিতরে যেয়েই ভুলভ্রান্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। লেনিনের লেখায়ই ত পড়েছ যে, আন্তঃপার্টি সংগ্রাম কমিউনিস্ট পার্টির বিকাশের একটি নিয়ম।"

বিরামহীন সংগ্রাম। সেই সংকল্প নিয়েই পা বাড়াই। আমি কমিউনিস্ট কনসোলিডেশানে যোগ দিই—১৯৩৭ সালের বোধহয় জুলাই মাসে। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের অধিকাংশ এবং অনুশীলনের আরো কয়েকজন সভ্য একত্রে মিলেই সিদ্ধান্ত নিই। অন্যান্য যারা এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুরেন ধর চৌধুরী, হরিপদ দে, অমূল্য সেন, বাঁকুড়ার প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা প্রমথ ঘোষ এবং বর্তমানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট নেতা অনিল মুখার্জী। প্রভাত চক্রবর্তী, নরেন ঘোষ আমাদের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। তবে তাঁরা অনুভব করেন যে, দেশের জেলে ফিরে পূর্ণানন্দবাবুকে জানিয়ে তারপর কনসোলিডেশানে যোগ দেওয়া উচিত। হয়েছিলও তাই।

নতুন মত ও পথ গ্রহণের পর একটা প্রশ্ন আমাদের সবারই সামনে বড় হয়ে উঠছিল। কি ভাবে নির্বাসনে বসেও দেশের গণ-আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করা যায়! এখানেও আমরা নানাভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছি। কিন্তু তা চলেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে, দেশের সংগ্রামের মূল ধারার থেকে সাময়িক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে। এমন কিছু কি করা যায় না যার চার দেয়াল আর সাগরের ব্যবধান ডিঙিয়ে আমরা সেই ধারায় অংশগ্রহণ করতে পারি? তাতে কিছু অবদান দিতে পারি?

১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমরা অনুভব করি যে, ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে যেখানে তা সম্ভব। ১৯৩৭ সালে নতুন শাসন সংস্কার আইন অনুসারে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়েছে। সাধারণ নির্বাচনে ১১টি রাজ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত

হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের সাফল্য জনগণের মনে নতুন আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করেছে। গত কয়েক বৎসর ধরে দমন নীতির যে বজ্রমুষ্টি জনমতের কণ্ঠরোধ করে রেখেছিল তা কিছু পরিমাণে শিথিল হয়েছে। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি উঠতে শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় আইন সভাতেও উত্থাপিত হচ্ছে আন্দামান বন্দীদের প্রশ্ন। এই পরিবেশে যদি আমরা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দাবির ভিত্তিতে অর্থাৎ আমাদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়া, বিনা বিচারে আটক এবং দণ্ডিত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি, সমস্ত দমননীতি-মূলক আইন প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবিতে অনশন শুরু করি তাহলে বাইরের গণ-আন্দোলনের শুধু যে সমর্থন লাভ করব তাই নয়; সেই আন্দোলনে এক নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত করতে সমর্থ হব। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্প্রসারণের বিষয়টিকে গভর্নমেন্টের মর্জির উপর ফেলে না রেখে উদ্যোগটা এসে যাবে আমাদের তথা দেশের মানুষদের হাতে।

ইতিপূর্বেও এখানকার বন্দীদের পক্ষ থেকে স্বদেশে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি জানিয়ে বারবার স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছিল। তবে সেই সময়ে প্রশ্নটিকে দেখা হয়েছিল ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। নির্বাসনে আমরা প্রায় পৃথিবীছাড়া হয়ে রয়েছি। দেশের জেলে গেলে বাইরের পরিস্থিতি সম্বন্ধে অন্তত কিছুটা ওয়াকিবহাল থাকা যায়। আত্মীয়স্বজনের মুখ দেখা যায়। বইপত্র ইত্যাদির ব্যাপারেও অনেকটা সুবিধা হবে। তাছাড়া আন্দামানের আবহাওয়াতে সবারই স্বাস্থ্যের উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। অন্যদিকে ভারত সরকার আমাদের স্বদেশে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রশ্নটিকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল। কেন্দ্রীয় অ্যাসেম্বলীতে স্বরাজ্য দল বারবার এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় সরকার পক্ষ ব্যতিব্যস্ত। প্রথমে তারা কেন্দ্রীয় আইন সভার একজন খয়ের খাঁ সদস্যকে আন্দামান পরিদর্শনে পাঠায়। সেই ভদ্রলোক বন্দীদের সঙ্গে দেখাও করেন নি—সেন্ট্রাল টাওয়ারের উপরে দাঁড়িয়ে পরিদর্শনের কাজ সারেন। অথচ ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দিলেন যে, বন্দীরা সুখেই আছে। তারপর আসেন ভারত সরকারের তদানীন্তন সচিব হেনরী ক্রেইক। তিনি অবশ্য রক্ষী পরিবেষ্টিত অবস্থায় গরাদে দেওয়া করিডরের বাইরে দাঁড়িয়ে বন্দীদের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু তিনি ফিরে গিয়ে আইন সভার মঞ্চে ঘোষণা করেন যে, আন্দামান নাকি "বন্দীদের স্বর্গ"। স্বরাজ্য দল অবশ্য সে কথা মেনে নিতে রাজী হন নি।

তাঁদের চাপে ভারত সরকার আবার দুজন বে-সরকারী সদস্যকে পাঠান। এঁদের একজন ছিলেন রায়জাদা হংসরাজ এবং অপর জন স্যার মহম্মদ ইয়ামিন খাঁ।

রায়জাদা হংসরাজ নিজে আজীবন স্বাধীনতা-সৈনিক, প্রাক্তন বিপ্লবী। প্রধানত তাঁর সঙ্গেই আমাদের প্রতিনিধিরা দু-দিন ধরে বিস্তৃত আলোচনা করেন। এঁরা ফিরে যেয়ে আমাদের অনুকূলেই রিপোর্ট দিয়েছিলেন। কিন্তু সে রিপোর্ট সরকারের পছন্দসই না হওয়াতে যথারীতি ধামাচাপা পড়ে যায়। তারপর এসেছিলেন বাংলার তদানীন্তন গভর্নর স্যার জন আণ্ডারসন স্বয়ং। শুনেছি তিনি এমন একটা পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন যে, আমাদের আরো কিছু সুযোগ-সুবিধা—যথা সমুদ্রে স্নান করা, বৃত্তিমূলক হাতেকলমের কাজ শেখানো ইত্যাদি দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হবে। যাতে আমরা দেশে ফেরার দাবি না তুলি। কিন্তু আমাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক প্রশ্ন। তার উপর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অধ্যয়নের যতটুকু সুযোগ পেয়েছি তাতে বুঝেছি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠছে। সেই অবস্থায় দেশে ফেরার তাগিদটা উঠেছিল অত্যন্ত প্রবল হয়ে। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অধ্যায় শেষ হয়ে আর এক নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। এই সময়ে আমরা থাকব বিচ্ছিন্ন হয়ে? কিছুতেই নয়। তাই এবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের দাবিকে বিচার করা হল সম্পূর্ণ নতুন এবং বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে। আমাদের হাতে একমাত্র অস্ত্র অনশন।

এবারকার অনশন হবে ভিন্ন প্রকৃতির, ভিন্ন রীতিতে। তাই অনশনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং তার সামনে নানা ধরনের যে সব বিপত্তি দেখা দিতে পারে, সবকিছু বুঝে শুনে সচেতনভাবে লড়াইতে নামতে হবে। এবার ত লড়াই জেলকর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জেলের দুঃখকষ্টের আংশিক লাঘবের জন্য নয়। এ হবে ভারত সরকারের বন্দী-নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সংগ্রামে জয়ী হতে পারব যদি সমগ্র দেশ আমাদের পিছনে এসে দাঁড়ায়, সারা ভারতবর্ষে যদি আমাদের দাবির সমর্থনে আন্দোলনের ঢেউ ওঠে। জানতাম যে, দেশবাসীর সমর্থন আমরা পাবই। কিন্তু তাদের কানে সংবাদ পৌঁছাতেই হয়ত বহুদিন কেটে যাবে। যত দিন যাবে ততই অনশনব্রতীদের জীবন-প্রদীপ নির্বাণোন্মুখ হয়ে আসবে। সব দিক বিবেচনার পর সমস্ত দল মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

বিপ্লবীর দুর্জয় সঙ্কল্প আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা নানা পথে পূর্বাহ্নে দেশে খবর পাঠাবার চেষ্টা করব। সুড়ঙ্গ পথে ত বটেই।

দুই একজন বন্ধুর দণ্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। তারা জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে যে জাহাজ আসবে তাতে দেশের জেলে ফিরে যাবে। সেখান থেকে বাইরে খবর পাঠাবে। অনশন শুরু করা হবে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের নোটিসে এবং বন্দীদের মধ্যে যতবেশি সংখ্যায় সম্ভব একই দিনে সংগ্রামে যোগ দেবে। তাহলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর একটা বিরাট চাপ পড়বে। কেন না এতগুলি বন্দীকে জোর করে খাওয়াবার পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ বা উপযুক্ত সংখ্যক ডাক্তার সমগ্র আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পাওয়া যাবে না। যদি আমরা মরি, সে মৃত্যু হবে সৈনিকের মৃত্যু। তা দেশে নতুন সাড়া জাগাবে। জেলখানার ভিতরে সংগ্রামী ঐক্য এবার পরিপূর্ণ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার বন্দীদের যে বড় অংশটি কনসোলিডেশানের বাইরে রয়েছেন তাঁরা ইতিপূর্বে জেলের ভিতর কোন লড়াইতে যোগ দেন নি। কিন্তু এই রাজনৈতিক অনশনের তাৎপর্য উপলব্ধি করে তাতে অংশগ্রহণে পূর্ণ সম্মতি জানিয়েছেন।

ভারত সরকারকে চরমপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হল—২৪শে জুলাই থেকে অনশন শুরু হবে। বোধ হয় ৪৮ ঘন্টার নোটিস দেওয়া হয়েছিল। দাবি: (১) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী এবং বিনা বিচারে আটক বন্দীর মুক্তি ; (২) সমস্ত দমননীতি-মূলক আইন প্রত্যাহার ; (৩) মুক্তি সাপেক্ষে আমাদের স্বদেশের জেলে ফিরিয়ে নেওয়া—Repatriation ; (৪) মুক্তি সাপেক্ষে সমস্ত দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীকে একশ্রেণীভুক্ত করা। ২৩শে জুলাই চীফ্ কমিশনার নিজে এসে ভারত সরকারের উত্তর পড়ে শোনালেন। আমরা সমবেতভাবে যে দরখাস্ত করেছি তা করার অধিকার জেল আইনে নেই। দ্বিতীয়ত, বন্দীমুক্তি এবং দমননীতি-মূলক আইন প্রত্যাহারেব দাবি করার কোন অধিকার বন্দীদের দেওয়া যেতে পারে না। ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ থাকলে ব্যক্তিগতভাবে আবেদন পাঠালে বিবেচনা করা হবে। অনশন করে কোন লাভ ত হবেই না, বরং জেল আইন ভঙ্গের অপরাধে দণ্ড হতে পারে। তার চেয়ে লক্ষ্মীছেলের মত বেশি "রেমিশন" পাওয়ার চেষ্টা কর ইত্যাদি। বলা বাহুল্য লক্ষ্মীছেলে হওয়ার অভিপ্রায় আমাদের ছিল না। ২৪শে জুলাই তারিখে প্রায় তিনশ জন একসঙ্গে অনশন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

কে যোগ দেবে, না দেবে স্থির করার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেকের নিজের ওপরে। সমস্ত দলের বন্দীদের মিলিত সভায় সবাইকে ভালভাবে বুঝিয়ে বলা হয়েছিল যে, অনশন কঠোর এবং দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যাঁরা আগে বেশ কয়েকবার অনশন করেছেন, বিশেষত বটুকেশ্বর দত্তের মত বন্দীরা, তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে এর যন্ত্রণাদায়ক দিকটি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেন। যারা যোগ দেবে তারা যেন সম্পূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই তা করে। সব কিছু জেনেশুনেই সকলে যোগদান করে। অনেক রোগী, এমন কি টি. বি. রোগীকেও বিরত করা সম্ভব হয়নি। এই ঐতিহাসিক সংগ্রাম থেকে দূরে সরে থাকতে কেউ রাজী নয়। বহু দল ও মতের মানুষ একত্রে শৃঙ্খলা-বদ্ধভাবে স্বেচ্ছামৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে পা বাড়িয়েছি। মনে হয় সত্যিই যেন যুদ্ধক্ষেত্রে চলেছি। নাই বা থাকল কামানবন্দুক বা এরোপ্লেনের গর্জন আর অশান্ত উন্মাদনা। ২৩শে রাত্রে সবাই সেলে বন্ধ হলাম। ২৪শে সকালে দরজা খোলে না। বিকালে কিছুক্ষণের জন্য কয়েকজনের ব্যাচ করে খোলা হল শুধু স্নানের জন্য। স্নানের ব্যবস্থা ঐ করিডরে। জেল-কর্তৃপক্ষ জানিয়ে গেল যে, শাস্তি হিসাবে আমাদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সেলে একলা বন্ধ। রাতে সেলে আলো নেই। বই পাওয়া যাবে না। বাড়িতে চিঠি লেখা ও পাওয়ার অধিকার হরণ করা হয়েছে। পরে দফায় দফায় আরো শাস্তির ব্যবস্থা হতে পারে। জেলের আইনে ৪৮ ঘণ্টা অতীত হলে তবে অনশন বলে স্বীকার করা হয়। তারপরেও কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করে দেখে যে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় কেউ অনশন ভঙ্গ করে কিনা। এর পরে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ জোর করে খাওয়াবার ব্যবস্থা। ৪৮ ঘণ্টা পরে অনশন-ব্রতীদের তত্ত্বাবধানের ভার পড়ে চিকিৎসা বিভাগের উপরে। ঐ সময়ে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে ছিলেন ক্যাপ্টেন বিজেতা চৌধুরী। তিনি স্বাধীনচেতা মানুষ। জেলের প্রধান চিকিৎসক হিসাবে মাঝে মাঝে পরিদর্শনে আসতেন এবং নিজের দায়িত্বে 'মেডিক্যাল গ্রাউণ্ডে' বন্দীদের যথাসাধ্য সুবিধা দানের চেষ্টা করতেন। আমাদের দায়িত্ব চিকিৎসা বিভাগের হাতে যাওয়ার পর তিনি সুপারিশ করেন যে, অনশনব্রতীদের অন্তত দিনের বেলাটা করিডরে খোলা রাখতে হবে, যাতে তারা পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। নতুবা তিনি এতগুলি মানুষের জীবনের

ঝুঁকি নিতে রাজী নন। তাঁর সুপারিশের ফলে কিছুটা সুবিধা পাওয়া গেল। সমস্ত বন্দী একসঙ্গে মিলিত হতে না পারলেও অন্তত এক করিডরে যারা আছি তারা সারাদিন গল্পগুজবে কাটাতে পারব।

একের পর একটি করে সাতটি দিন অতিক্রান্ত হল। যে সব বন্দী নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে তাদের জোর করে খাওয়াবার জন্য জেল-কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তারা মাত্র জন ৩।৪ ডাক্তার সংগ্রহ করতে পেরেছে। তিনশ বন্দীকে জোর করে খাওয়াবার ব্যবস্থা এই কয়জন ডাক্তারের দ্বারা সম্ভব নয়। আমরা খবর পাই যে, সেনা বিভাগের কিছু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তারকে ভারত থেকে আনা হচ্ছে। দু-তিন দিনের মধ্যেই তাদের নিয়ে জাহাজ এসে পৌঁছাবে। অনশন অবস্থায় আমরা নিজেরা শুধু লবণজল পান করতাম। শরীর ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। সপ্তম দিনে জেলের ডাক্তার একদল বর্মী কয়েদী নিয়ে দরজা খুলে সেলে ঢোকে। ডাক্তারের ইঙ্গিতে বর্মীরা এসে হাতপা চেপে ধরে। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর যখন অবসন্ন হয়ে পড়েছি তখন বিছানায় চিৎ করে ফেলে কেউ চেপে ধরে মাথা, কেউ দুই হাত, কেউ কোমর ও দুই পা। যাতে নড়াচড়ার শক্তি না থাকে। তখন ডাক্তার নাকের মধ্য দিয়ে রবারের নল চালনা করে, আর সেই নলের মধ্য দিয়ে দুধ পাকস্থলীতে যেয়ে পৌঁছায়। এই সময়টাই বিপদের আশঙ্কা থাকে। নল যদি অন্ননালীতে না যেয়ে ফুসফুসে ঢোকে তাহলেই মৃত্যু নিশ্চিত। ১৯৩৩-এর অনশনের সময় যাদের মৃত্যু হয় তা ডাক্তারের অবহেলার দরুন। নল পাকস্থলীতে গিয়েছে না ফুসফুসে প্রবেশ করেছে বোঝা কঠিন নয়। কেন না ফুসফুসের মুখে প্রবেশ করলেই প্রচণ্ড কাশি আসবে। তা সত্ত্বেও যদি দুধ ঢালা হয় তাহলে সেটা ডাক্তারের পক্ষে চূড়ান্ত গাফিলতি।

অনশন এক অদ্ভুত ধরনের সংগ্রাম। কর্তৃপক্ষ খাওয়ানোর জন্য বলপ্রয়োগ করবে আর আমরা যথাসাধ্য বাধা দেব। লড়াইয়ের প্রত্যক্ষ রূপ এইটাই। কিন্তু লড়াই বেশির ভাগ চলে নিজের শরীরের সঙ্গে মনের। শরীর খাদ্যের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। ক্ষুধার সময় পাকস্থলীতে যে জারক রস নিঃসরণ হয় খাদ্যের অভাবে সেই রস অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ক্রমে ক্রমে পাকস্থলীতে যন্ত্রণা শুরু হয়। দিনের পর দিন এইভাবে চলতে থাকলে নানা রকম ব্যাধি, পাকস্থলীতে ক্ষত ইত্যাদির উৎপত্তি হয়। শরীর চায় তার ধর্ম

অনুযায়ী কাজ করতে। অবচেতন মনও তার সঙ্গে সায় দিয়ে খাদ্যের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু সচেতন মন এবং ইচ্ছাশক্তি সেই উন্মুখতাকে কঠোর শাসনে নিবৃত্ত করে রাখে। অনেকের বেলায় সচেতন মনেও অবচেতনের প্রভাব কিছু পরিমাণে হলেও আত্মপ্রকাশ করে। তাই দেখা যায় যে, তারা গল্পগুজবের সময়, অতীতে কবে ভূরিভোজন করেছে, সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। ভোজ্যবস্তুর তালিকা ও বর্ণনা বেশ রসালোভাবে বিবৃত করে। যারা তা করে না তাদের অবচেতন মন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে রাতের বেলায় ঘুমের মধ্যে।

আমিও বেশ কয়েকদিন ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছি যে, অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে নানারকম সুস্বাদু আহার্য উপভোগ করছি। কিন্তু সতর্ক প্রহরী মন ঐ স্বপ্নের মধ্যেই অবচেতনের রাশ টেনে ধরে, অনশনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। খাওয়া থেকে হাত গুটিয়ে নিই। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়। দেখি কোথায় স্বপ্ন আর কোথায় আমি। সেই অন্ধকার কারাকক্ষেই শুয়ে রয়েছি। জোর করে খাওয়ানো শুরু হওয়ার পর ক্ষুধার উদগ্রতা কিছুক্ষণের জন্য কমে আসে বটে তবে তাতে ত তৃপ্তি হয় না। চব্বিশ ঘণ্টায় একবার খানিকটা দুধ ঢেলে দিয়ে যায়। কয়েক ঘণ্টা পর থেকেই আবার শুরু হয় নিজের ভিতরে শরীর এবং মনের টানাপোড়েন। শরীরের কোষগুলি দিনের পর দিন শুকিয়ে সঙ্কুচিত হয়। জীবনীশক্তি হয়ে আসে স্তিমিত, নিষ্প্রভ। দৃঢ় সঙ্কল্পের শক্তিতে সচেতন ভাবে মৃত্যুর দিকে তিল তিল করে এগিয়ে চলেছি। হয়ত জীবনমৃত্যুর সীমানায় পৌঁছে তবেই অর্জিত হবে বিজয়ের গৌরব। ক্রমে সবাই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ছি। নানা উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। মাথা ঘোরা, রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত। যারা রোগী হওয়া সত্ত্বেও লড়াইতে নেমেছে তাদের অবস্থা আশঙ্কা-জনক হয়ে উঠছে। তবু কারুর ভিতর দুর্বলতার চিহ্নমাত্র নেই। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।

ক্রমে সাগরপারের ব্যবধান লঙ্ঘন করে খবর এসে পৌঁছায় যে, আমাদের সমর্থনে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিরাট আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। দেশ থেকে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ডাক্তারদের যে দলটি এসে পৌঁছায় তাদের মুখেই প্রথম খবর পাই যে, কলকাতার রাজপথে রোজই বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হচ্ছে। তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর তারবার্তা আসে "দেশবাসী তোমাদের দাবি আদায়ের দায়িত্ব নিয়েছে। অতএব অনশন ভঙ্গ

করো।" অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী (তখন মুখ্যমন্ত্রী কথাটি প্রচলিত হয় নি) ফজলুল হক এবং পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী সিকান্দার হায়াত খানও অনশন ভঙ্গের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ্য দলের চীফ হুইপ সত্যমূর্তি তারবার্তায় জানালেন যে, Repatriation (দেশে ফেরৎ পাঠানোর)-এর দাবি গভর্নমেন্ট মেনে নিয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলে বিপ্লবী দলগুলির যেসব নেতা স্টেট প্রিজনার রূপে আটক ছিলেন তাঁরাও তারবার্তা পাঠিয়েছেন। আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল যে, Repatriation এবং সবাইকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে গণ্য করা—এই দুটি হল নিম্নতম দাবি। পরেরটি সম্বন্ধে এখনও কোন প্রতিশ্রুতি বা আভাস আসে নি। সুতরাং লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। অবশেষে বোধ হয় ৩৬ কিংবা ৩৭ দিনের দিন চীফ কমিশনার নিজে এলেন রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজীর তারবার্তা নিয়ে। সেই সঙ্গে এসেছে মুজফফর আহমেদ ও বঙ্কিমবাবুর টেলিগ্রাফ। শেষোক্তদের বার্তায় বোঝা গেল যে, আমাদের সবাইকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা সম্বন্ধে বাঙ্গালার মন্ত্রিসভা আশ্বাস দিয়েছে। গান্ধীজী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাঁর উপরে সব দায়িত্ব ছেড়ে দিলে তিনি আমাদের দাবি পূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

আমরা সবাই চীফ কমিশনারকে জানালাম যে, গান্ধীজীর অনুরোধ বিবেচনার জন্য আমাদের একত্র হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। কয়েক ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলে। মতভেদ দেখা দেয় একটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। গান্ধীজীর টেলিগ্রামে একটি কথা ছিল, "আমি তোমাদের full relief দেওয়ার চেষ্টা করব—Full relief অর্থে বন্দীমুক্তি বোঝায় কিনা? গুরুমুখ সিং বলেন: "এই কথাটির স্পষ্ট ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলে অনশন ভঙ্গ করা ঠিক হবে না। সুতরাং ব্যাখ্যা চেয়ে গান্ধীজীকে তার পাঠানো হোক এবং জবাব না আসা পর্যন্ত সংগ্রাম চলতে থাকুক।" বন্ধুদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মনে করে যে, আর অনশন চালিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। সর্দারজীর উপর শ্রদ্ধাবশত ভোটাভুটির সময় আমি তাঁর পক্ষে মত দিই। কিন্তু দেখা গেল যে তিনি অনশন চালিয়ে যেতে কৃতসংকল্প। তিনি অবশ্য অন্যদের বলেন তোমরা যদি উচিত মনে কর তাহলে অনশন ভঙ্গ কর। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সংগ্রাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর মাত্র কয়েকজন চালিয়ে যাওয়াটা রাজনৈতিক দিক থেকে ভুল হবে বলে আমি মনে করি। সে কথা সর্দারজীকে জানিয়ে দিই।

অন্য সকলে অনশনভঙ্গ করার পরে সর্দারজী এবং আরো ৭।৮ জন বন্ধু সপ্তাহখানেক চালিয়ে যান। তারপর আসে গান্ধীজীর দ্বিতীয় তারবার্তা। আমার বন্ধু নলিনী দাশ তাঁর বইতে লিখেছেন দ্বিতীয় বার্তাটিতে ছিল "Full relief means release।" আমার ধারণা অত সুস্পষ্টভাবে কিছু ছিল না। যে যাহোক, গান্ধীজীর এই বার্তার পর গুরুমুখ সিং এবং অন্যেরা অনশন ভঙ্গ করেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠদের যুক্তি ছিল আমরা আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছি। বন্দী-মুক্তির দাবিতে প্রতিশ্রুতি না পেলেও প্রশ্নটিকে দেশবাসীর সামনে তীক্ষ্ণভাবে তুলে ধরেছি। জনমত উত্তাল হয়ে উঠেছে আমাদের সমর্থনে।

এই পরিস্থিতিতে দেশবরেণ্য নেতার অনুরোধে আমরা অনশন প্রত্যাহার করলে তা করা হবে বিজয়ীর মর্যাদা নিয়ে। অতএব গান্ধীজীকে জানিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় যে, তাঁর অনুরোধে আমরা অনশন স্থগিত রাখছি। এই সুযোগে তাঁর মারফতে দেশবাসীর সামনে সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে আমাদের মতামত জানিয়ে দেওয়া হয়। আমরা মনে করি ব্যাপক গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জিত হবে। সুতরাং মুক্তির পরে আমরা গণ-আন্দোলন সংগঠিত করার কাজেই আত্মনিয়োগ করব।

গান্ধীজীর টেলিগ্রামে একটা কথা ছিল : "তোমরা হিংসার পথ বর্জন করেছ বলে ঘোষণা করলে আমার হাত শক্তিশালী হবে।" গান্ধীজীর তারবার্তা আসার অনেকদিন আগে থেকেই সেলুলার জেলের বন্দীদের মধ্যে একটা আলোচনা উঠেছিল যে, সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব দেশবাসীকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। নিছক সন্ত্রাসবাদে আমরা কেউই কোনদিন বিশ্বাসী ছিলাম না। তবু এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বহু সন্ত্রাসবাদী কাজ সংঘটিত হয়েছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সেইগুলিকে ধরে দেশবাসীর সামনে আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন বিপ্লবীদলের পক্ষ থেকে যে সব বই পত্রিকা প্রচারিত হত সেগুলির বেশির ভাগ ছিল ভাবাবেগে পূর্ণ। আত্মদান, আত্মবিসর্জন প্রভৃতির রোমাণ্টিক মহিমা বর্ণনার উপরেই জোর পড়ত।

বিপ্লববাদ বলতে যতটুকু আমরা বুঝেছিলাম তার কথাও দেশের মানুষের সামনে সুষ্ঠুভাবে পরিবেশনের চেষ্টা খুব বেশি হয় নি। তাই জাতীয়

আন্দোলন যখন এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করতে চলেছে আর আমরাও নতুন পথের হদিস পেয়েছি তখন সে কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা উচিত। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন দলের বন্দীরা একমত হতে পেরেছিলেন। কিন্তু দুটি প্রশ্ন উঠেছিল। প্রথমত, ঘোষণা করা যাবে কিভাবে? সরকারের মারফত করা হলে দেশের মানুষ সেটাকে আমাদের দুর্বলতার লক্ষণ বলে মনে করতে পারে। হয়ত তারা ভাববে যে আমরা দীর্ঘদিন কারাভোগের পর ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছি। তাছাড়া গভর্নমেন্ট ত আমাদের বিবৃতিকে কখনই যথাযথভাবে প্রকাশ করবে না, বিকৃত আকারে প্রকাশ করবে। যদি সুড়ঙ্গপথে কোন বিবৃতি বাইরে পাঠানো হয় সেক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি তা প্রকাশের ঝুঁকি নেবে কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয়ত, সন্ত্রাসবাদের পথ ব্যর্থ হয়েছে এ কথা বলায় কারুর কারুর বেশ প্রবল আপত্তি ছিল, বিশেষত, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বন্দীদের দিক থেকে। তাঁরা বড় রকমের "অ্যাকশন" করে বিপ্লব আন্দোলনে নতুন নজির স্থাপন করে এসেছেন। সুতরাং অতীতের পন্থার ব্যর্থতা স্বীকার করতে তাঁরা রাজী নন। আমরা যারা কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছি তাদের এ বিষয়ে কোন সংশয় অথবা দ্বিধা ছিল না। অতীতের পন্থার সাফল্য বা অসাফল্যের বিচারে ত কয়েকটি অ্যাকশনের সাফল্য প্রধান মাপকাঠি হতে পারে না। ঐসব অ্যাকশনের অল্পবিস্তর ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল নিশ্চয়ই। তা দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পন্থা হিসাবে তা ব্যর্থ হয়েছে বৈকি! ব্যক্তিগত সন্ত্রাসই হোক অথবা বড় রকমের অ্যাকশনই হোক, গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্রবহীন সশস্ত্র কার্যকলাপ যে মূল লক্ষ্যের বিচারে বন্ধ্যা সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত প্রত্যয় হয়েছিলাম।

তবে মহাত্মা গান্ধীর তারবার্তার জবাবেও বিস্তৃতভাবে মতামত জানাবার অবকাশ ছিল না। উপরন্তু তিনি তুলেছেন হিংসা বনাম অহিংসার মৌলিক প্রশ্ন। সুতরাং তখনকার মত সিদ্ধান্ত হল যে, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যটাই সংক্ষেপে জানিয়ে দেওয়া হোক। পরে দেশের জেলে ফিরে বিস্তৃত আলোচনার পর চূড়ান্ত মতামত স্থির করা যাবে। বাইরে পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করে তার নির্দেশ পাওয়ার চেষ্টাও করা হবে।

অনশন ভঙ্গ হল বিজয় উৎসবের মধ্য দিয়ে। গণ-আন্দোলনের সমর্থনে আমরা ভারত সরকারকে নতিস্বীকার করাতে সমর্থ হয়েছি। স্যার জন

অ্যাণ্ডারসনের উদ্ধত মাথাও নোয়াতে হয়েছে। মাসখানেক কাটে ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সাধনায়। জেল-কর্তৃপক্ষ এবার এক মাসের জন্য অতিরিক্ত পুষ্টিকর আহার্য বরাদ্দ করেছে। দেড়মাসের উপবাসী শরীর খাদ্যকে যেন শুষে নিতে চায়। যাদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে সেই সব বন্ধুরা উপদেশ দিলেন এই সময় নিয়মিতভাবে হালকা ব্যায়াম করা দরকার। নতুবা শরীরে জলের ভাগ বেশি হয়ে পড়বে। এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আসে দেশে ফেরার তথা পরস্পরের কাছে থেকে বিদায় নেওয়ার পালা। প্রথমে বাংলার বাইরের বন্দীদের এবং যারা অসুস্থ তাদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়া হল। প্রথম ব্যাচে গেলেন সর্দার গুরুমুখ সিং, লাহোর ষড়যন্ত্র, দিল্লী ষড়যন্ত্র, গয়া ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা এবং মাদ্রাজের বন্দীরা। বাংলার অসুস্থ বন্দীদের মধ্যে নলিনী দাশ, সুনীল চ্যাটার্জী প্রভৃতি কয়েকজন। কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল যে, অবশিষ্ট বন্দীদের দুই ব্যাচে দেশে পাঠানো হবে। শেষ দল সেলুলার জেল ছেড়ে আসি ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে। আমি ছিলাম শেষের দলে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন, আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র, ডালহাউসী স্কোয়ার বোমার মামলা, মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ হত্যা মামলা, লিবং-এ গভর্নরের হত্যাপ্রচেষ্টার মামলা, হিলি ডাকাতি, চট্টগ্রামের বাথুয়া ডাকাতি প্রভৃতি মামলার বন্দীরা সবাই শেষ দলে ছিলেন।

১৮ই জানুয়ারি দ্বিতীবারের মত 'মহারাজা' জাহাজে উঠে দেশের অভিমুখে রওনা হলাম। একশ জনের উপর একসঙ্গে চলেছি। এবারকার যাত্রা সব দিক থেকে অভিনব। সেলুলার জেল ছেড়ে আসতে যে বিদায়ের ব্যথা অনুভব করি নি তা নয়। শুধু নির্বাসনের জীবনই নয়, অতীতের এক বড় অধ্যায়কে এখানে পিছনে রেখে গেলাম। এখানকার দিনগুলি শুধু অধ্যয়নেই কাটে নি। শেষের দিনগুলি নানা রঙে রঙীন হয়ে উঠেছিল। জেল-কর্তৃপক্ষকে লুকিয়ে 'মে দিবস,' 'লেনিন দিবস' ইত্যাদি পালন করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে নাটক, যাত্রাভিনয়। বন্দী বন্ধুরাই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৩৭ সালের অনশন শুরু হওয়ার ঠিক আগে আমার লেখা একটি পোস্টার নাটিকাও অভিনীত হয়েছে। কতজনের সঙ্গে নতুন করে গড়ে উঠেছে নিবিড় প্রীতির সম্পর্ক। উত্তর জীবনেও তা স্মৃতির ভাণ্ডারের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে রয়েছে।

কতদিনের ছোটবড় কত ঘটনা, হাস্যকৌতুক, গায়ক বন্ধুদের কণ্ঠে শোনা গানের কলি আজও কালের ব্যবধান ভেদ করে জীবন্ত হয়ে ওঠে। আশৈশব পার্বত্য প্রকৃতির কোলে লালিত আমি। এখানে সাগরের সঙ্গে প্রতিদিন নতুন ভাবে পরিচয় হয়েছে। যখন নানা কাজের ফাঁকে একটু অবকাশ পেয়েছি অথবা মন যখন একলা থাকতে চেয়েছে তখন সাগরের ঐ কূলহারা সুনীল জলরাশির দিকে দুচোখ মেলে বসে থেকেছি। তার কাছ থেকেও বিদায় নিতে বিচ্ছেদের বেদনা অনুভব করি।

একটা মাটির টব সংগ্রহ করে রজনীগন্ধার চারা পুঁতেছিলাম। আমার সেলের সামনে করিডরে রেখেছিলাম টবটিকে। সেলুলার জেল ছেড়ে আসার মাত্র দিন কয়েক আগে ফুল ফুটেছে। জেটিতে পৌঁছে একবার উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি। পাঁচ নম্বর ব্লকটির দোতলার করিডরে রজনীগন্ধার গুচ্ছ পরিষ্কার চোখে পড়ে। তার বৃন্তখানিকে রেখে গেলাম আমার স্মৃতিচিহ্ন রূপে। তারপর লঞ্চে করে জাহাজে। আবার সেই লম্বা শিকল, তবে পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি পরানো হয় নি। বয়লারের পাশের সেই খাঁচাগুলি, ফোকর দিয়ে বাইরের পানে চেয়ে থাকা। সকালে বিকালে ডেকে বেড়াতে যাওয়া। দেখতে দেখতে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের শেষ দ্বীপটি দৃষ্টির আড়ালে পড়ে যায়। শীতের বঙ্গোপসাগর শান্ত। চতুর্থ দিন কলকাতায় জাহাজ ঘাটে পৌঁছে দেখি আমাদের সংবর্ধনার বিপুল আয়োজন। শুধু সেপাই-সান্ত্রীর দলই নয়, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লেঃ কর্নেল দাশ নিজে উপস্থিত। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফারেরা ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। দূরে প্রতীক্ষারত জনতা, মাতৃভূমির মুক্তি-সৈনিকদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে।

আবার বাংলার জেল। তবু জেলে বসেই দেশের মাটি আর আলো বাতাসের পরশ অনুভূতিতে নতুন সাড়া জাগায়। আন্দামানে শীত ঋতু বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। এখানে এসে জানুয়ারি মাসের শেষের দিকের কলকাতার শীতের আমেজটুকু সমস্ত শরীর-মন দিয়ে উপভোগ করি। সবাই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হয়েছি। খাওয়ার সময় শীতকালের তরিতরকারি আর মিষ্টি জলের মাছের স্বাদ যেন অমৃতের মত মনে হয়। সেলুলার জেলে ত আলুকুমড়োর মতন তরিতরকারি পর্যন্ত আসত জাহাজে করে। আমরা রয়েছি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। আমাদের আগের ব্যাচে যারা এসেছে তাদের রেখেছে দমদম সেনট্রাল জেলে।

ঐ জেলটি আন্দামান-প্রত্যাগত বন্দীদের জন্যই নতুন করে তৈরি হয়েছে। শেষ ব্যাচে যারা এসেছি তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যককে দমদমে পাঠানো হবে বলে শুনি। আলিপুর জেলে থাকবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা ১৪।১৫ বৎসরের মেয়াদে দণ্ডিত বন্দীরা।

আমরা সবাই অধীর হয়ে রয়েছি কবে বাইরে যেয়ে নতুন উৎসাহে গণ-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ব। সেই সঙ্গে এটাও অনুভব করি যে, বন্দী-মুক্তির দাবি আদায়ের জন্য সম্ভবত আর একবার বড় রকমের সংগ্রামের প্রয়োজন হবে। দিনকয়েক পরে শরৎ বসু এলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কক্ষে আমাদের কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর প্রায় দু ঘণ্টা আলোচনা হয়। ডাঃ নারায়ণ রায়, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত সহ আমিও ছিলাম প্রতিনিধিদলে। পূর্ণানন্দ বাবু টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় দ্বিতীয় দফায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। তবে আপীলের নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই আমাদের Repatriation-এর সিদ্ধান্ত হওয়াতে তাঁর আন্দামান যাওয়া হয় নি। এখানে মিলিত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে।

শরৎবাবুর সঙ্গে কথাবার্তার সময় কোন আই-বি বা জেল-কর্মচারী উপস্থিত ছিল না। তাই অবাধে আলাপ-আলোচনা চলে। তাঁর কাছে শুনি অ্যাণ্ডারসন সাহেব Repatriation-এর প্রশ্নে প্রকাশ্যে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে "I bow to public opinion"। কিন্তু বন্দী-মুক্তির প্রশ্নে তাঁর জিদ এখনও বজায় রয়েছে। বিনাবিচারে আটক বন্দীদের সবাইকে মুক্তি দিতে অতটা আপত্তি নেই, তবে দণ্ডিত বন্দীদের সম্বন্ধে মনোভাব অনড়। হিংসাত্মক অপরাধে দণ্ডিতদের এভাবে মুক্তি দিলে ব্রিটিশ শাসনের মর্যাদা নাকি ক্ষুণ্ণ হবে। ফজলুল হক মন্ত্রিসভা বন্দীমুক্তির বিরোধী নয় বটে, ফজলুল হক সাহেব নিজে রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে খুবই সহানুভূতিসম্পন্ন। তবে তাঁর মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব নির্ভর করে অ্যাসেম্বলীতে ইউরোপীয় সদস্যদের ভোটের উপরে।

ইউরোপীয়দের ধনুর্ভঙ্গ পণ "সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি উদারতা দেখানো চলবে না"। শরৎবাবু আরো জানালেন যে, গান্ধীজী শিগগিরই বাংলায় আসছেন গভর্নর এবং লীগ মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলোচনার জন্য। তিনি আমাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন। সুতরাং হিংসার প্রশ্ন সম্বন্ধে তাঁকে কি বলব সে সম্বন্ধে আমাদের মতামত যেন আগেই স্থির করে রাখি।

বাইরে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমাদের গোপন যোগাযোগের নিয়মিত ব্যবস্থা হয়েছে। সেই সূত্রে জানতে পারি 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক'-এর সপ্তম কংগ্রেসের কথা। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংযুক্ত ফ্রন্ট গঠনে উদ্যোগী হতে। দত্ত-ব্র্যাডলি থিসিসের সারমর্মও সুড়ঙ্গ পথে আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়! আরো জানতে পারি কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গে গান্ধীজীর আলোচনা হয়েছে। কমিউনিস্ট নেতারা জানিয়েছেন অহিংস গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার লক্ষ্যের দিকে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে তাঁরা মনে করেন। সেই হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের creed (সংকল্প) মেনে নিয়ে তাতে যোগদান করছেন। যদি ভবিষ্যতে এরূপ পরিস্থিতি দেখা দেয় যে, অহিংস আন্দোলনের পথ ছেড়ে হিংসাত্মক পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন হয়েছে তাহলে তার আগে তাঁরা সেকথা গান্ধীজীকে জানিয়ে দেবেন। রজনী পাম দত্তের লিখিত একটি প্রবন্ধও আমরা সুড়ঙ্গপথে পেয়েছিলাম। হিংসার প্রশ্নে কমিউনিস্টদের মনোভাব কি সেই বিষয়টিকে তিনি ঐ প্রবন্ধে ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। এইভাবে তত্ত্ব ও কৌশল, উভয় দিক থেকেই আমাদের সামনে বিষয়টি পরিষ্কার হতে সাহায্য করে। কমিউনিস্ট কনসোলিডেশানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর আলোচনা শুরু হল অন্যান্য দলের বন্দীদের সঙ্গে। দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল সর্বসম্মতিক্রমে—গান্ধীজীকে আমরা জানাব "জাতীয় কংগ্রেস যেভাবে অহিংসাকে গ্রহণ করেছে আমরাও সেইভাবে গ্রহণ করে কংগ্রেসে যোগদান করব"। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। মহাত্মার কাছে অহিংসা যেমন শর্তহীন (Absolute) নীতি ছিল জাতীয় কংগ্রেস কখনই সেভাবে গ্রহণ করে নি। সংগঠন হিসাবে জাতীয় কংগ্রেস অহিংস নীতিকে স্বীকার করেছিল লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমরূপে।

গান্ধীজীর সঙ্গে বহু আকাঙ্ক্ষিত সাক্ষাতের দিনটি এসে গেল। সাক্ষাতের সময় আমরা সবাই উপস্থিত ছিলাম। সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কক্ষে ফরাস বিছিয়ে বসার ব্যবস্থা হয়েছে। জেলার সাহেব গান্ধীজীকে আমাদের কাছে সসম্মানে পৌঁছে দিয়ে সরে গেল। আলোচনার সময় কোন সরকারী কর্মচারী উপস্থিত থাকবে না। মহাত্মার সঙ্গে ছিলেন মহাদেব দেশাই। আলোচনা সম্ভবত দু'দিন

হয়েছিল। গান্ধীজী প্রথমেই একটা কথা বলে নিলেন। হিংসা-অহিংসা সম্বন্ধে আমরা তাঁকে যে মতামত জানাব সে শুধু তাঁর নিজের সন্তুষ্টির জন্য। সে সব কথা তৃতীয় কোন পক্ষের গোচরীভূত হবে না বা আমাদের মুক্তির শর্তও হবে না। তিনি চেষ্টা করবেন নিঃশর্ত মুক্তির জন্য। আমরা বাইরে যেয়ে আবার হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করব না এইটুকু সম্বন্ধে নিশ্চিত হলে তিনি জোর পাবেন। আমাদের মতামত তাঁকে জানাই পরের দিন। আমরা যতটুকু সিদ্ধান্ত করেছিলাম সেটুকু জানাতেই গান্ধীজী খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন বোঝা গেল। তিনি একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলেন যে, তাঁকে পূর্বাহ্নে না জানিয়ে আমরা আবার অনশন শুরু করব না।

দু'দিনই আমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে বহু প্রশ্ন করা হয়। বেশির ভাগ প্রশ্ন ছিল অহিংসানীতির প্রয়োগ সম্পর্কে। আমরা জিজ্ঞাসা করি। তিনি স্মিত-হাস্যে জবাব দিয়ে যান। কখনও বা তাঁর সেই বিশ্ববিখ্যাত মানুষের মন জয় করা শিশুর মত উজ্জ্বল হাসির ঝরণা স্বচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করে। এই বিরাট ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এলে কেন যে সবাই প্রভাবিত হয়ে পড়ে সেই চৌম্বক আকর্ষণী শক্তি খানিকটা উপলব্ধি করি। অত্যন্ত সহজভাবে উত্তর দিয়ে চলেছেন। যেন আমাদের সঙ্গে কতদিনের চেনা-জানা। এতটুকু অহমিকা নেই, নেই কৃত্রিমতার লেশ। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষটিকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। অন্যদিকে তিনি যে বিচক্ষণ রাজনীতি-বিদ্ তার পরিচয়ও পাই ঐ সামান্য সময়ের আলাপে। আমাদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করি, "কতদিনে মুক্তিলাভ করব? কতদিন জেলে থাকতে হবে?" তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন: "Not more than many months" অর্থাৎ অনেক মাসের বেশি নয়। তাঁর উত্তরের এই অতিসূক্ষ্ম কূটনৈতিক অস্পষ্টতা আমাদের নজর এড়ায় নি।

গান্ধীজী কেন যে অস্পষ্ট উত্তর দিয়েছিলেন তা খানিকটা আঁচ করতে পেরেছিলাম তখনই। অ্যাণ্ডারসন সাহেবের সঙ্গে তাঁর আলোচনার সংক্ষিপ্ত মর্ম তিনি আমাদের শুনিয়েছিলেন। অ্যাণ্ডারসনের বক্তব্য ছিল: "বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তিদানের অধিকার মন্ত্রিসভার আছে। তারা ইচ্ছা করলে মুক্তির আদেশ দিতে পারে। কিন্তু দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তির বিষয়টি হল clemency অর্থাৎ দয়া প্রদর্শনের প্রশ্ন। সে অধিকার আছে একমাত্র

গভর্নরের। গভর্নর সমস্ত বিষয়টি পরীক্ষা করে তবেই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে"। কয়েক মাস পরে ঠিক এই প্রশ্নেই গভর্নরের সঙ্গে মতভেদ হওয়াতে যুক্তপ্রদেশে এবং বিহারে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। শেষ পর্যন্ত দু'টি প্রদেশের গভর্নর মন্ত্রিসভার অধিকার মেনে নেওয়াতে মীমাংসা হয়। ফলে বিহার এবং যুক্তপ্রদেশের জেলে আটক আন্দামান-প্রত্যাগত বন্দীরা সহ অন্যান্য দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দী মুক্তিলাভ করে। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা ছিল যুক্তপ্রদেশের মানুষ হিসাবে সেখানকার জেলে আটক। তারা সবাই এবং কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডিতেরা বাইরে আসার সুযোগ পায়। পাঞ্জাবের সিকন্দর হায়াত মন্ত্রিসভাও তখন সর্দার গুরুমুখ সিং, হাজরা সিং, খুশিরাম মেহটা প্রভৃতিকে মুক্তি দেয়। ঐ সব প্রদেশে বন্দী-মুক্তির এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ ও বিহারের জেলগুলিতে রাজনৈতিক বন্দীদের পুনরায় অনশন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল।

বাংলায় ফজলুলহক-মুসলিমলীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গেই প্রধানত মহাত্মা গান্ধীর আলোচনা হয়। তার সারমর্মও তিনি আমাদের বলেছিলেন। প্রথম পর্যায়ের আলোচনার ফলশ্রুতি হিসাবে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে: (১) বিনা বিচারে আটক সমস্ত বন্দীকে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসের আগেই ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে এক সঙ্গে নয়, বিভিন্ন ব্যাচে; (২) দণ্ডিতদের মধ্যে মেয়েদের এবং যাদের বয়স অল্প তাদের মুক্তি দেওয়া হবে অবিলম্বে; (৩) তারপর ছাড়া হবে যে-সব বিচারে আটক বন্দীর দণ্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে মাত্র কয়েক মাস বাকী আছে তাদের; (৪) অবশিষ্টদের কথা এর পরে বিবেচিত হবে।

গান্ধীজী বাংলার মন্ত্রিসভার সঙ্গে অসমাপ্ত আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ভার দিয়ে গেলেন তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র এবং শরৎ বসুর উপরে। বিধান সভায় বিরোধী দলের নেতা হিসাবে শরৎবাবুই প্রধানত আলোচনা চালিয়ে যাবেন। আমাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখবেন তিনিই।

গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের দিনকয়েক পরেই আমরা প্রায় পঞ্চাশ জন দমদম সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হয়ে আসি। রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য দশটি নতুন সেলুলার ব্লক তৈরী হয়েছে, যে সব বন্দী এতদিন বাংলার বিভিন্ন জেলে ছড়িয়ে ছিল তাদের সবাইকে এখানে এনে জড়ো করা হয়েছে। এতদিন তাদের দিন

কেটেছে নানা নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে। তারা যাতে পড়াশুনা এবং মার্কসবাদ সম্বন্ধে জানার সুযোগ পায় সেজন্য কমিউনিস্ট কনসোলিডেশান নতুনভাবে রাজনৈতিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করে। আন্দামানে যারা মার্কসবাদের ক্লাস নিতেন তাঁদের মধ্যে ডাঃ নারায়ণ রায়, নলিনী দাশ, বঙ্গেশ্বর রায়, সুনীল চাটার্জী প্রভৃতি এই জেলেই আছেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিই।

নিয়মিত ক্লাস ছাড়া সাপ্তাহিক আলোচনা চক্র, হাতেলেখা পত্রিকা, বিশেষ বিশেষ দিনে সভা ইত্যাদির অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। প্রথম মাস দুই সমস্ত ব্লকের বন্দীরা সারা দিন একত্রে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিলাম। তারপর কারাবিভাগের উধ্ব'তন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সেটা বন্ধ হয়। তবু নানাভাবে বিভিন্ন ব্লকের মধ্যে যোগাযোগ অক্ষুন্ন থাকে। বিশেষ বিশেষ দিন, যথা জেলের ছুটির দিনে, জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি পাওয়া যায় দিনের বেলাটা সকলে একসঙ্গে কাটাবার জন্য। অতীতের দিনগুলির তুলনায় বন্দী-জীবনের কড়াকড়ি অনেক শিথিল। পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহাওয়াতে জেল-কর্তৃপক্ষ আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বড় একটা হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করছে।

দেশের পরিমণ্ডলে যে একটা নতুন রাজনৈতিক সচেতনতার হাওয়া এসেছে সেটা বিশেষ ভাবে বোঝা যায় হিন্দুস্থানী সান্ত্রীদের ব্যবহারে। আগের দিনে এদের সঙ্গে আমাদের নানা ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি লেগে থাকত। অনেক সময় সংঘর্ষ বেধেছে এদেরই রূঢ় আচরণে। যে অল্পসংখ্যক কয়েকজন আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল সেটা ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগতভাবে, মানবিকতা বোধের দৌলতে। এবার দেখি যে, যুক্ত প্রদেশ ও বিহারে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠা এদের মনেও দোলা দিয়েছে। বাইরে যেয়ে শ্রমিক আন্দোলন করতে হলে হিন্দী উর্দু জানা চাই বুঝে আমরা অনেকে তখন থেকেই ঐ দুটি ভাষার অনুশীলনে ব্রতী হয়েছিলাম। সান্ত্রী, জমাদার, সুবেদারদের মধ্যে যারা একটু শিক্ষিত তারা এই ব্যাপারে আমাদের সহায়তা করেছে। মোটের উপর, মুক্তির প্রতীক্ষায় দিনগুলি যাতে বৃথা না যায় সেজন্য আমরা সংগঠিত উপায়ে সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছি।

বাংলার মন্ত্রিসভা পূর্বঘোষিত নীতি অনুসারে ডেটিনিউদের মুক্তি দিতে শুরু করেছে। দণ্ডিতদের মধ্যে যাদের মেয়াদ শেষ হতে মাত্র কয়েকমাস

বাকী তারা শীগগিরই অর্থাৎ পূজার আগে ছাড়া পাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু মূল প্রশ্নে এখনও নীরব। আমরা বুঝি যে, এটা কালক্ষেপণের কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। তখনও আমরা দৈনিক সংবাদপত্র পাঠের অনুমতি পাই নি। সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী আর রবিবারের স্টেটসম্যান বাইরের দুনিয়া সম্বন্ধে খবর পাওয়ার প্রধান সম্বল। বে-আইনীভাবে মাঝে মাঝে কিছু পত্র-পত্রিকা হাতে আসে। সেইসব পর্যালোচনা করে আমরা বুঝি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হতে শুরু করেছে। হয়ত সেদিকে দৃষ্টি রেখেই গভর্নমেণ্ট আমাদের মুক্তির প্রশ্নকে ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত কৌশল নিয়েছে। মহাত্মাজীর কাছে তার পাঠাই। তিনি জানান, "শরৎবাবুর উপদেশ অনুসারে কাজ করো"। আমরা শরৎবাবু এবং কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সুভাষবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি। বোধ হয় সেপ্টেম্বর মাসে সুভাষবাবু দেখা করতে আসেন। তিনি ত ঘরের লোক, তাঁর সঙ্গে আমরা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করি। বন্দী-মুক্তির বিষয়টিকে বাংলার মন্ত্রিসভা তথা গভর্নমেণ্ট যে রকম টুকরো টুকরো ভাবে বিচারের নীতি নিয়েছে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাই। আমাদের দাবি রাজনৈতিক। গভর্নমেণ্ট তাকে পরিণত করেছে দয়া প্রদর্শনের প্রশ্নে। সকলকে একসঙ্গে মুক্তি না দিয়ে বিভিন্ন ব্যাচে ছাড়ার পলিসি। আসলে সরকারের সেই কৌশলেরই অঙ্গ। মহাত্মাজী কেন সরকারী নীতি মেনে নিয়েছেন সেজন্য আমরা বিক্ষুব্ধ। সুভাষবাবু বুঝিয়ে বলেন যে, কতকগুলি বাস্তব অসুবিধার জন্যই জাতীয় কংগ্রেসকে বাধ্য হয়ে এই নীতি মেনে নিতে হয়েছে। তিনি আবেগপ্রবণ মানুষ। আবেগের বশে বলেন: "আমরা চেষ্টা করছি ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আপনাদের সবারই মুক্তি আদায় করতে। যদি ঐ সময়ের মধ্যে আপনাদের বাইরে নিয়ে যেতে না পারি তাহলে আমরা ভিতরে আসব।" এ কথা শুনে আমরা খুব উৎসাহিত হই। সুভাষবাবু পরমুহূর্তেই বলেন: "কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে অবশ্য আমি প্রকাশ্যে এ কথা ঘোষণা করতে পারি না। আপনাদের যা বলেছি তা একান্ত ঘরোয়াভাবে।" এরপর দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা বহু প্রশ্ন করি। তিনি সহিষ্ণুভাবে উত্তর দিয়ে বলেন: "আপনারা দেখছি নিজেদের ব্যাপারের চেয়ে বাইরের পরিস্থিতি জানার জন্য বেশি উৎসুক।" আমরা জবাব দিই "বাইরে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছি। সে ত আপনাদের সংগ্রামের সাথী হব বলে।"

পূজার আগে দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে বেশ কিছুসংখ্যক বন্দী ছাড়া পায়। তারপর কয়েকমাস কেটে যায়। গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আর কোন উদ্যোগ নেই। ডিসেম্বর মাসে দমদম এবং আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আমরা তিনদিন অনশনের দ্বারা গভর্নমেণ্টকে সতর্ক করে দিই যে, সংগ্রাম স্থগিত করা হয়েছে, বর্জন করা হয় নি। এদিকে খবর পাই জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরে দক্ষিণ ও বাম পন্থার সংঘাত তীব্র হয়ে উঠছে। বন্দী-মুক্তি প্রচেষ্টার উপরে তার কি প্রতিক্রিয়া হবে ভেবে আমরা উদ্বিগ্ন না হয়ে পারি না। ১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে হক-নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা বন্দী-মুক্তি সম্বন্ধে পরামর্শদানের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে। একজন অবসরপ্রাপ্ত জজ কমিটির সভাপতি এবং অ্যাসেম্বলীর বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা সভ্য। সরকারপক্ষ ও ইউরোপীদের প্রতিনিধিরা মিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের সঙ্গে আছে স্বরাষ্ট্র সচিব। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শুধু দু-জন, শরৎ বসু এবং আর একজন। কমিটি বন্দীদের ব্যক্তিগত রিপোর্ট পরীক্ষার পর প্রত্যেকের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ভাবে সুপারিশ করবে। সে সুপারিশও যে সমস্ত ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা গ্রহণ করবেই এমন কোন কথা নেই। এর ফলে কাকে ছাড়া হবে. না হবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গভর্নমেন্টের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হল। শরৎবাবুরা ভেবেছিলেন কমিটির সাহায্যে যতজনকে সম্ভব বাইরে নিয়ে আসা যাক। তারপর আন্দোলনের পথ ত খোলা আছেই। আমরা এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট হই নি। কিন্তু শরৎবাবুর উপদেশে এবং পার্টির নির্দেশে সাময়িকভাবে ব্যবস্থাটা মেনে নিই। বুঝতে পারি যে, গণ-আন্দোলনের শক্তি সম্বন্ধে আমাদের হিসাবটা বাইরের বন্ধুদের হিসাবের সঙ্গে ঠিক মিলছে না!

কমিটির সুপারিশে আরো কিছুসংখ্যক বন্দী মুক্তিলাভ করে। তার পরেই অচল অবস্থা সৃষ্টির লক্ষণ দেখা দেয়। আমরা খবর পাই পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে কমিটি কিছুসংখ্যক বন্দীকে শর্তাধীনে মুক্তিদানের সুপারিশ করেছে। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে সংখ্যাধিক্যের ভোটে, শরৎবাবুদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। আমরা চাই নিঃশর্ত মুক্তি। শর্তাধীনে মুক্তির প্রস্তাব মেনে নেব না। তখন দুই জেল মিলে বোধহয় ৮০।৮৫ জন অবশিষ্ট আছি। গোপনসূত্রে মত-বিনিময়ের পর সিদ্ধান্ত করি অনশন সংগ্রাম ছাড়া গত্যন্তর নেই। এতদিন গান্ধীজী এবং অন্য বন্ধুদের উপদেশে অপেক্ষা

করেছি। এদিকে ইউরোপে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। আমাদের দেশে জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরে দক্ষিণ ও বাম পন্থার সংঘাত চরমে উঠেছে। সুভাষ বাবু ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়া সত্বেও কিছুদিনের মধ্যে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এ হেন পরিস্থিতিতে আর কালবিলম্ব করলে মুক্তির প্রশ্ন অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধামাচাপা পড়বে। মহাত্মাজীকে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিই। গভর্নমেন্টকে চব্বিশ ঘণ্টার চরম পত্র পাঠিয়ে অনশন শুরু হয় জুলাই মাসের শেষে। এতে মন্ত্রিসভা খানিকটা বিব্রত হয়ে পড়ে। পরে শরৎবাবুর মুখে শুনেছি ফজলুল হক সাহেব স্থির করেছিলেন যে, নিজে এসে আমাদের কাছে অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানাবেন। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। শেষে মন্ত্রিসভা আমাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য জাতীয় নেতাদের জেলের ভিতরে এসে দেখা করার অনুমতি দেয়। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় কোন সরকারী কর্মচারী উপস্থিত থাকত না। বিভিন্ন দিনে আসেন যথাক্রমে ডাঃ বিধান রায়, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, মহাদেব দেশাই, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, সুভাষ বসু ও শরৎ বসু। পরে একদিন একসঙ্গে আসেন মুজফফর আহমেদ, সোমনাথ লাহিড়ী, রবি সেন ও সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ। সকলের কথা থেকে আমরা দু'টি জিনিস বুঝতে পারি। গভর্নমেন্টের মনোভাব অনমনীয়। বাধাটা প্রধানত ইউরোপীয় এবং গভর্নরের পক্ষ থেকে এলেও হক-নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা তার দায়িত্ব নিজেদের উপরে নিয়েছে। দ্বিতীয়ত, গভর্নমেন্টকে নতি-স্বীকার করাতে হলে যে রকম আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন তার সম্ভাবনা উজ্জ্বল নয়।

কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব ঠিক এই মুহূর্তে কোন প্রত্যক্ষ আন্দোলনে জড়িত হতে অনিচ্ছুক। অন্যদিকে সুভাষবাবু প্রমুখ বামপন্থী নেতারা শুধু নিজেদের শক্তিতে বড় রকমের আন্দোলন গড়ে তোলার মত ভরসা পাচ্ছেন না। মহাদেব দেশাই এসেছিলেন গান্ধীজীর অনুরোধ নিয়ে যেন আমরা অনশন প্রত্যাহার করি। তিনি নিজেও অনেক অনুনয় উপরোধ করেন। আমরা তাঁকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে পাঠাই: "অনশন প্রত্যাহৃত হলে গান্ধীজী আমাদের মুক্তির জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করবেন?" কয়েকদিনের মধ্যেই মহাত্মার তারবার্তা আসে। তিনি পুনরায় অনশন প্রত্যাহার করার আবেদন জানিয়েছেন।

শুধু তাই নয়। বেশ বোঝা যায় যে, তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বন্দীরা অনশন করে মুক্তি দাবি করবে এই পদ্ধতির তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। কারণটা আমরা অনুমান করি। সেই সময়ে বিহারে এবং উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার আমলে কৃষক আন্দোলনে অনেক বামপন্থী নেতা ও কর্মী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। সুতরাং অনশনের মারফত বন্দী-মুক্তির কোন নজির স্থাপিত হোক, এটা কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মনঃপূত নয়। ১৯৩৭ সাল আর ১৯৩৯ সালে তফাৎ এইখানে।

গান্ধীজী তারবার্তার একটি নকল শরৎবাবুর কাছে পাঠিয়েছেন। সেটি সঙ্গে নিয়ে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন সুভাষবাবু। সুভাষবাবুকে বেশ খানিকটা বিচলিত বোধ হল। তিনি বলেন: "আমি আপনাদের অনশন ভঙ্গ করতে বলব না। আপনারা যতদিন অনশন চালাবেন আমি আন্দোলন চালিয়ে যাব। তবে বাস্তব অবস্থাটা আপনাদের জানিয়ে রাখা ভাল। মহাত্মার প্রকাশ্য বিবৃতির পর গভর্নমেন্টের মনোভাব আরো অনমনীয় হবে। আন্দোলনকে তেমন শক্তিশালী ভাবে গড়ে তুলতে কিছুটা সময় লাগবে। সুতরাং আপনারা সবদিক বিবেচেনা করে সিদ্ধান্ত নিন।"

বাইরে থেকে কমিউনিস্ট পার্টিও অনুরূপ অভিমত পাঠায়। আলিপুর ও দমদম সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে গোপন সূত্রে মত-বিনিময়ের পর আমরা অনশন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিলাম। পরের দিন সুভাষবাবু এলে তাঁকে এবং তাঁর মারফত গভর্নমেন্টকে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হল।

কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আমরা ধরে নিলাম যে, জেলের তালা বেশ কয়েক বৎসরের জন্য আরো মজবুত ভাবে বন্ধ হল। অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হল বন্দী-মুক্তি সম্বন্ধে শেষ সরকারী বিজ্ঞপ্তি। আমাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেককে শর্তাধীনে মুক্তি দিতে রাজী আছে। অবশিষ্টদের সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট কোন রকম দয়া প্রদর্শন করতে প্রস্তুত নয়। যাবজ্জীবন এবং অনুরূপ দীর্ঘ মেয়াদে দণ্ডিত সবাই পড়েছে শেষোক্ত দলে। যাদের দণ্ডের মেয়াদ শেষ হতে দুই তিন বৎসর বাকী আছে এমন দুই একজনের সঙ্গে আমার নামও রয়েছে শেষের তালিকায়। যাদের জন্য শর্তাধীনে মুক্তির আদেশ এসেছিল তারা সবাই তা প্রত্যাখান করে। বাইরের দুনিয়া এখনও 'দূর অস্ত্' অর্থাৎ বহুদূরে।

তারপরও ছয়টি বৎসর জেলে থাকতে হয়েছে। মুক্তির সম্ভাবনা হাতের নাগালের মধ্যে এসেও দূরে চলে গেল। এজন্য যে আশাভঙ্গ ও বিষাদের বেদনা অনুভব করি নি তা নয়। তবে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার ত চরম পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। তাই ধীরস্থিরচিত্তে সবাই মনোনিবেশ করি সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের কাজে। সংঘাতের অবসান হয় নি, কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বে জয়ী হয়েছি। পথের সন্ধান পেয়েছি। সুনিশ্চিতভাবে পথ বেছে নিয়েছি। আর আঁধারে হাতড়ানো নয়। সুস্পষ্ট পরিপ্রেক্ষিত সামনে রেখে সময়ের সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া। সেটাই এখন সবচেয়ে কঠিন কাজ। অবস্থার অনেক বদল হয়েছে। গভর্নমেণ্ট বা জেল-কর্তৃপক্ষ কেউই এখন আমাদের অনাবশ্যক উত্যক্ত করে না। কিন্তু বন্দীর জীবনে যা মূল দ্বন্দ্ব তা অক্ষুণ্ণ রয়ে গিয়েছে। সংকীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ পরাধীন পরিবেশের সঙ্গে সজীব মন আর দুরন্ত কর্মপ্রেরণার সংঘাত।

বিরামহীন একঘেয়েমির বোঝা এক এক সময় দুঃসহ মনে হয়। কোথাও এতটুকু বৈচিত্র্য নেই। একটি ইয়ার্ডে আমরা চল্লিশজন—এই আমাদের দুনিয়া। দৃষ্টিও বন্দী। সেলুলার ব্লকগুলি তৈরী হয়েছে একটির সামনে আর একটি। সোজা সামনের দিকে ১০।১৫ হাতের বেশি নজর এগোতে পারে না। বারান্দাগুলি আবার লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। যারা বহুদিন ধরে একসঙ্গে রয়েছি তাদের জীবনের সমস্ত গল্প, মায় ছোটখাটো ঘটনা পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকেরই বহুবার শোনা হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকের চালচলন, কথা বলার ভঙ্গি, হাসি-ঠাট্টার বিষয়বস্তু—সবই সকলের কাছে অত্যন্ত পরিচিত। দিনের পর দিন সেই একই কথা, একই রুটিন যান্ত্রিক নিয়মে চলে। তবু একঘেয়েমির সামনে আমরা আত্মসমর্পণ করি না। যেদিনই বাইরে যাব, কর্মস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আর এখানকার দিনগুলিকে কাটাতে হবে তারই প্রস্তুতির কাজে। সবাই মিলে নতুন নতুন কাজ সৃষ্টি করি যাতে একটি দিনও অপচয় না হয়। তাতেও কি কম বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে?

একটা নিজস্ব গ্রন্থাগার রয়েছে আমাদের হাতে। ডেটিনিউ বন্ধুরা মুক্তি-লাভের আগে অনেকে আমাদের জন্য বই দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলার উপযোগী নতুন নতুন বই পত্রিকার অভাব। কারুরই এমন সম্বল নেই যে, চাহিদা মতন বই কেনা চলে। যে দুই-একখানা কেনার মত অর্থ সংগ্রহ হয় সেখানেও বই পাওয়াটা আই. বি. কর্তৃপক্ষের মর্জির উপর

নির্ভর করে। যুদ্ধ বেধেছে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে। আর আমরা দৈনিক সংবাদপত্রপাঠের অনুমতি পেয়েছি ১৯৪০ সালের জুন মাসে অনেক আবেদনের পরে। তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন জেল পরিদর্শনে গেলে আমরা আজাদ এবং স্টেটসম্যান পত্রিকার জন্য অনুরোধ জানাই। আজাদ পত্রিকার নাম করায় নাজিমুদ্দিন সাহেব খুশি হয়ে আবেদন মঞ্জুর করেন।

যাদের দণ্ডের মেয়াদ অল্পই বাকী ছিল তাদের দুই একজন ১৯৪০ সালের গোড়ার দিকে ছাড়া পেয়ে বাইরে গেল। কিন্তু তারপরই দেখি কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য দলের কিছু কিছু কর্মী ভারতরক্ষা আইনে দণ্ডিত হয়ে জেলে আসতে শুরু করেছে। বোধ হয় '৪০ সালের মাঝামাঝি সময়ে বিভিন্ন বামপন্থীদলের বহুসংখ্যক নেতা ও কর্মী ভারতরক্ষা আইনে বিনা বিচারে আটক হলেন। তখনই প্রায় নিশ্চিত হয়েছিলোম যে, দণ্ডকাল শেষ হলেও বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। হলও তাই। ১৯৪১ সালের ৭ই জুন ছিল জেলের হিসাবমত আমার মুক্তির দিন। ঠিক আগের তারিখে জেল অফিসে ডেকে সরকারী আদেশ শুনিয়ে দিল যে, দণ্ড শেষ হওয়ার পরমুহূর্ত থেকে ভারতরক্ষা আইনে আটক হয়ে থাকতে হবে। আমি একলাই নই। যুদ্ধ চলাকালে যাদের দণ্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের সবাইকে এইভাবে বিনা বিচারে আটক হয়ে থাকতে হয়েছে।

আমার বন্দী-জীবন শুরু হয়েছিল ডেটিনিউ হিসাবে। শেষ হল সেইভাবেই। শেষের কয়েকটি বৎসরও জেল-পরিক্রমা করতে হয়েছে। হিজলীর বন্দিশিবির, সেখান থেকে বছরখানেক পরে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল। তারপর মুক্তি-লাভের আগের কয়েক মাস আবার দমদম সেন্ট্রাল জেল। ডেটিনিউ জীবনে দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিক থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক বেশি সুবিধা পেয়েছি। পড়াশুনার সুযোগও বেড়েছে। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রপাঠের অধিকার লাভ করেছি। ১৯৪০ সালে এবং পরে ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় যে বহুসংখ্যক নেতা ও কর্মী ভারতরক্ষা আইনে আটক হয়ে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা আলাপ-আলোচনার মারফত বাইরের দুনিয়ার সম্বন্ধে অনেক নতুন খবর জেনেছি। এঁদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক ছিলেন পুরানো দিনের সহকর্মী। আবার অনেকেই ছিলেন অপরিচিত। আমরা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করায় পুরাতন সহকর্মীদের অনেকে দুঃখিত

হয়েছেন। যাঁরা 'আগস্ট আন্দোলনে' ধরা পড়ে এসেছেন তাঁদের অনেকে আমাদের ভুল বুঝেছেন। অন্যদিকে নতুন বন্দীদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন উদার দৃষ্টিসম্পন্ন সহিষ্ণু মতের মানুষ, তাঁদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন নেতা ভারতরক্ষা আইনে বন্দী হয়ে ছিলেন—ডাঃ রণেন সেন, নৃপেন চক্রবর্তী, আবদুল হালিম, গোপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী, নিরঞ্জন সেন, আবদুল মোমিন, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রভৃতি। তাঁদের সঙ্গে বছরখানেক একই কমিউনিস্ট কনসোলিডেশানের সভ্যরূপে একত্রে সংগঠিত জীবনযাপনের সুযোগ পেয়েছি। সমবেতভাবে আলোচনা করে বাইরের রাজনৈতিক পটভূমি এবং শক্তিসমাবেশের একটা রূপরেখা আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। দেশের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এক দশক পিছিয়ে ছিল। বন্দিশিবিরে এসে সেই ব্যবধানটাকে অন্তত তত্ত্বগতভাবে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছি। যারা সদ্য সদ্য বাইরে থেকে এসেছে তাদের কথায় বার্তায়, গল্পেগুজবে, আচারে-আচরণে অনেক নতুন খোরাক পেয়েছি।

কিন্তু ঐটুকুতে কি মন ভরে? চার দেয়ালের ভিতরেও ত সময়ের গতি একেবারে থেমে থাকে না। দিনের পর দিন কাটে, ঋতুর পর ঋতু পার হয়ে যায়। বসন্তে জেলের প্রাঙ্গণের গাছপালাগুলিও সেজে ওঠে নবপল্লবের শ্যাম সমারোহে। দারুণ গ্রীষ্মের শেষে আসে বর্ষার ঘন কালো মেঘে ঢাকা থমথমে আকাশ, যার সমাপ্তি অশ্রান্ত বর্ষণে। তারপর আকাশে ধরে শরতের মনভুলানো রঙ। সূর্যের আলোর প্রখরতা কমে গিয়ে আসে উদাস-করা দীপ্তি। শরতের শেষে শীতের বিষণ্ণ দিন। প্রকৃতির রূপ-পরিবর্তন অন্তরকে বাইরের জগতের জন্য উতলা করে তোলে। ইতিহাস আমাদের পিছনে ফেলে দুরন্ত বেগে এগিয়ে চলেছে। বিশ্বরঙ্গমঞ্চে ঘটে চলেছে কত যুগান্তকারী ঘটনা। পৃথিবীর ইতিহাস এক নতুন মোড় নিয়েছে ১৯৪১ সালের ২২শে জুন। ফ্যাসিবাদের বিশ্বজয়ের পরিকল্পনার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে জয়যুক্ত সমাজতন্ত্রের পীঠভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ। ফ্যাসিবিরোধী গণমুক্তি সংগ্রামের প্রতিটি রণাঙ্গণে কত নাম-না-জানা মানুষ বীরত্ব এবং আত্মদানের অমর মহাকাব্য রচনা করছে। আমাদের দেশের জীবনেও অতিক্রান্ত হয়েছে কত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ঘটেছে কত বিরাট পরিবর্তন, মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা—

ইভ্যাকুয়েশান, জাপানী বোমা, আগস্ট আন্দোলন, মন্বন্তর। স্বাধীনতার জন্য দেশবাসীর মৃত্যুপণ সঙ্কল্প 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' মন্ত্রের বজ্রনির্ঘোষ কারার প্রাচীর ভেদ করে কানে এসেছে। আমাদের দেশেও রচিত হয়েছে জনগণের প্রতিরোধের কত মৃত্যুহীন কাহিনী। আবার মহানগরীর রাজপথে, গ্রামবাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে দুর্ভিক্ষপীড়িত অগণিত মানুষের অসহায় মৃত্যুযন্ত্রণার বিবরণ শুনে আকুল হয়ে উঠেছি। অধীর হয়ে ভেবেছি যে, আরো কতদিন এই পরিবর্তনহীন ছোট্ট দুনিয়াটুকুর ভিতরে কূপমণ্ডুকের মত আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে? মনে পড়ে লেনিনের সেই বিখ্যাত উক্তি: "ইতিহাস অধ্যয়নের চাইতে ইতিহাস রচনার কাজ অনেক বেশি মহিমময়"। সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে রইব কতদিন?

অগ্নিপরীক্ষায় ঢালাই বয়ে যতই ইস্পাতকঠিন হয়ে উঠিনা কেন, আমরা ত রক্তমাংসের মানুষই রয়ে গিয়েছি। ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ, আত্মীয়-পরিজনের সম্পর্ক কিছুই ত একেবারে ভুলতে পারি নি। আমাদের জীবনেও কামনা-বাসনার আলোড়ন জাগে, আশানিরাশার দোলায় মন আন্দোলিত হয়। নিজের কথা দিয়েই অন্যের মনের ভিতরটায় কেমন হচ্ছে বুঝতে পারি। একে অপরকে মনের কথা খুলেও বলি। হৃদয়ের সমস্ত দোটানার সঙ্গে লড়াই ত শেষ হয়ে যায় নি। নানা কারণে ক্ষতবিক্ষত হয় অন্তর। বাড়ি থেকে চিঠি পাই, কোলের ছেলে ঘরে ফিরবে—আশায় আশায় পথ চেয়ে থেকে মা পঙ্গু, বাকশক্তিহীন, অর্ধ-অচেতন অবস্থায় মৃত্যুশয্যায়। মাকে যাতে পুলিসপ্রহরায় হলেও দেখে আসতে পারি সেজন্য গভর্নমেন্টের কাছে দরখাস্ত পাঠাই। একবার নয়, বারবার। কিন্তু প্রতিবারই নাকচ হয় দরখাস্ত। ছয় মাস ধরে এই অবস্থা চলে। বাড়ির চিঠি এলে খোলার আগে প্রতীক্ষা করি মায়ের মৃত্যুসংবাদ। অবশেষে একদিন সেই সংবাদও এল। এজন্য প্রস্তুত ছিলাম, তবু একটা বিরাট শূন্যতা অনুভব করি। উপরে প্রশান্ত নিস্তব্ধতা বজায় রাখি। দুর্বলতা প্রকাশ করব না। তবে সাগরের তলদেশ আলোড়িত করে ঢেউ ওঠে।

বাঙ্গালীর হিসাবে যৌবন অতিক্রান্ত। মধ্যবয়সে পা দিতে চলেছি। শরীরের শ্রম ও সহন-ক্ষমতা কমে আসছে। স্বাস্থ্যের উপর যা অত্যাচার হয়েছে তাতে তারই বা দোষ কি! তবু চেষ্টা করি যে ভাবেই হোক শরীর আর মনের কর্মক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। যৌবনের ক্ষুধাও ত নির্বাপিত হয় নি। অবশ্য

এখন দেহের ক্ষুধার চেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে কোন কল্যাণীর স্নেহরসে সিক্ত পরশের জন্য আকাঙ্ক্ষা। কোন দিন বিনিদ্ররাতে বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসে নীরবে আবৃত্তি করি :

"কোথা তুমি, শেষবার যে ছোঁওয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সঙ্গীতে ?"

শ্রান্ত হৃদয় নিজের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে স্বপ্ন দেখে কবে জীবনের শুষ্ক তপ্ত মাটিকে প্রবল বর্ষণে ভিজিয়ে দিতে নেমে আসবে নারীর প্রেমের স্নিগ্ধ বারিধারা। কবিগুরুর ভাষায় বলি :

"মহেন্দ্রের বজ্র হ'তে কালো চোখে বিদ্যুতের আলো
আনো আনো ডাকি—
বর্ষণ কাঙাল মোর মেঘের অন্তরে বহ্নি জ্বালো
হে কালবৈশাখী।"

পরের এই কয় বৎসরের মনের কাহিনী সন তারিখের হিসেবে প্রথম পর্বের মধ্যে পড়ে বটে, তবে আসলে তা আমার বিপ্লব-জিজ্ঞাসার দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্ভুক্ত। কমিউনিস্ট হওয়ার পর ত জিজ্ঞাসার অবসান হয় নি। জেলের মধ্যেও নতুন প্রশ্নের পর প্রশ্ন সামনে এসে হাজির হয়েছে। রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, এমন কি নিজের অন্তর নিয়েও কত সমস্যার সমাধান খুঁজতে হয়েছে। কাজেই সত্যকার অর্থে দ্বিতীয় পর্বের শুরু তখন থেকে। এই পর্বের জিজ্ঞাসা আর তার উত্তরকেই প্রধানত অবলম্বন করে আজও এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে। বয়সের দিক দিয়ে অস্তাচলের ধারে এসে পৌঁছালেও নজর রয়েছে ইতিহাসের উদয় দিগন্তের পানে। সে সব কথা এখন মুলতবী থাকুক। প্রথম পর্বের উপর দাঁড়ি টেনে দিই শেষ ঐ অধ্যায় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে।

আমাদের জীবনে Armistice ত আসে নি। তবু নেই ব্যর্থতাবোধের গ্লানি। মাঝে মাঝে এসেছে অবসাদ, এসেছে শ্রান্তিবোধ। কিন্তু তার ভারে তলিয়ে যাই নি। বাইরে গেলেও ত ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে বৃহত্তর রণক্ষেত্রে। ইতিহাসের ঘটনা-সংঘাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে হবে। ফ্যাসিজমের পরাজয়ের পর দেখা দেবে যে নতুন পৃথিবী, সেখানে ভারত-বর্ষের স্বাধীনতার অরুণোদয়কে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

অবসান হবে বিদেশী শাসনের। সংগ্রামের সেই শেষ অধ্যায়ে আমরা আবার অংশগ্রহণ করব। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, দেশে দেশে চলেছে শোষিত মানুষের যে বিজয় অভিযান আমরা ত তারও সহযোদ্ধা। ইতিহাসের সেই প্রবাহ অমোঘ, অপরাজেয়। তার সঙ্গে গড়ে উঠেছে আমাদের নিবিড় একাত্মতা। হয়ত আরো কিছুকাল আমাদের কাটাতে হবে রুদ্ধকারার অন্তরালে। তবু আজ ত আমরা বিচ্ছিন্ন নই। আমরা যে বিশ্ববিপ্লবের অংশ। তাই আমরা আজও অপরাজিত।

জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি ১৯৪৫ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর এক পক্ষ পরে। মাথা উঁচু রেখেই বাইরের জগতে ফিরে এসেছি।

পরিশিষ্ট

যে সব বই এবং দলিলের সাহায্যে স্মৃতিকে ঝালিয়ে নিয়েছি

১। বাংলায় বিপ্লববাদ—নলিনী কিশোর গুহ
২। জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম—ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী
৩। বিপ্লবের তপস্যা—জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী
৪। বিপ্লবের পথে—পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত
৫। অগ্নিদিনের কথা—সতীশ পাকড়াশী
৬। বন্দীজীবন—সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
৭। In Search of Freedom—Jogesh Chatterjee
৮। Indian Struggle—Subhash Chandra Bose
৯। Students' Fight for Freedom—Amarendra Nath Roy
১০। Printed Judgement of Inter-Provincial Conspiracy Case (1933-1935)

এই লেখকের অন্যান্য বই

বন্দীজীবন—ইণ্টারন্যাশানাল পাবলিশিং হাউস (১৯৪৯) : নিঃশেষিত

কাঞ্চনজঙ্ঘার ঘুম ভাঙছে—ন্যাশানাল বুক এজেন্সি (১৯৫৩) : ঐ

রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার—র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব (১৯৬১)

রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ—বুকল্যাণ্ড (১৯৬৪)

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্যা—রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭০)

Marxism and the Language Problem in India.

—**Peoples Publishing House (১৯৭০)**

New Delhi

ভারতের জাতি-সমস্যা—ন্যাশানাল বুক এজেন্সী (১৯৫২) : নিঃশেষিত

ভাষাতত্ত্বে মার্কসবাদ— ঐ (১৯৫৪) : ঐ

রোমাঁ রোলাঁর গান্ধীজিজ্ঞাসা—সমীক্ষা প্রকাশনী (১৯৬৯)

বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ—রাহুল সাংকৃত্যায়নের হিন্দী ভাষায় লিখিত 'বৈজ্ঞানিক ভৌতিকবাদ'-এর বাংলা রূপান্তর (১৯৪৮) : নিঃশেষিত

মার্কসবাদ—এমিল বার্নস-এর 'What is Marxism-এর বাংলা অনুবাদ—ন্যাশানাল বুক এজেন্সী—প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬, ২য় সংস্করণ ১৯৬৪

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
৩৩	২	নিকটের	নাটকের
৪১	১৪	জনভাণ্ডার	জ্ঞানভাণ্ডার
৭৭	১২	মাত্র	ক্ষাত্র
৯৫	৬	মতন	মাতন
১০৫	১৫	'ছোট' আর 'হয়েছে' মধ্যে বসাতে হবে "ভাই"	
১১৩	২৫	তাকিয়ে	তাকে
১৫৭	৬	মানুষের	রহস্যের
১৬৯	শেষ লাইন বসাতে হবে : 'পাদপ্রদীপের' আগে "রাজসাহীতে ছিলাম"		
২২১	২২	ব্রেশ	বেশ
২৮০	১৪	প্রাণবন্ত	প্রাণবন্ত
২৮৮	৪র্থ (তলা থেকে) বসাতে হবে "স্বরাষ্ট্র" 'তদানীন্তন' আর 'সচিব' এর মাঝখানে		